দুই টাকা

৭ম বর্ষ

১৯৬৯

আশ্চর্য!

বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা

Bengali Download

eBook Releaser Group Presents

Next Generation eBooks with No Watermark

We always encourage to buy original books

সম্পাদক ঃ ডঃ অসীম বর্ধন
৭ম বর্ষ ১৯৬৯, বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা

আশ্চর্য !

সূচীপত্র

এবার নতুন "আশ্চর্য ! উদ্যোগ (সম্পাদকীয়) ...
অ্যাল্‌ফা-বিটার বার্ষিক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রতিযোগিতা ....
স্বপ্নশেষ (সম্পূর্ণ উপন্যাস) ঃ রেণুকা দেবী ... ১
সম্ভবামি (কবিতা) ঃ জিতেশচন্দ্র গুপ্ত ১৯৪
পৃথিবীবাসী তোমরা শোনো (বিজ্ঞানসুবাসিত গল্প) ঃ
ভর্তৃহরি মিত্র ... ১৯৬
কবিতা এবং আমি (কবিতা) ঃ পংকজ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০
ভিখারী (কবিতা) ঃ অবনী রঞ্জন ঘোষ ... ২০১

আগামী সংখ্যায় থাকবে ঃ

টুকরো কথা (কাহিনী) ঃ শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য
আকাশের পাখি (সম্পূর্ণ উপন্যাস) ঃ তপন নাগ
শিকার (কবিতা) ঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুন্সী
মেশিন থামলো (বিজ্ঞানসুবাসিত উপন্যাস)
[আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানসুবাসিত চলচ্চিত্র
প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান অধিকারী]
ঃ প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়
আ র ও অ নে ক কি ছু

৭ম বর্ষ ১৯৬৯ বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা

আশ্চর্য!

এবার নতুন 'আশ্চর্য!' উদ্যোগ....

গত ছ'বছর যাবৎ বিশেষ ধরনের বিজ্ঞানসুবাসিত গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ, কবিতা নাটক কার্টুন ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচার করে বাংলা সাহিত্যে 'আশ্চর্য!' পত্রিকা সত্যিই এক 'আশ্চর্য যুগ' প্রবর্তন করতে পেরেছে, একথা সকলেই স্বীকার করেন! নতুন ধরনের সাহিত্যের প্রতি সকলের আগ্রহ এবং রুচি সৃষ্টি করার যে দুঃসাহসিক অভিযানে 'আশ্চর্য!' পত্রিকা নেমেছিল, আজ তা ব্যাপক সার্থকতা লাভ করেছে। এই সফল অভিযানের ফলেই আজ দেশের বহু পত্র-পত্রিকায়, এমনকি রেডিওতেও বিজ্ঞানসুবাসিত সাহিত্যের প্রচার হচ্ছে প্রায়ই—নতুন সাহিত্যের দিগন্ত বিস্তারিত করে দিয়েছে এই 'আশ্চর্য!' পত্রিকা!

এই পত্রিকাটির গৌরবময় সপ্তম বর্ষ থেকে আর এক নতুন দুঃসাহসিক উদ্যোগ সুরু হলো—এবার কেবলমাত্র বিজ্ঞানসুবাসিত সাহিত্য নয়, তার সঙ্গে সব রকমের গল্প কবিতা প্রবন্ধ নাটক ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নতুন ধরনের সাহিত্যেরও বিকাশ পথ খুলে দেওয়া হলো! নতুন আঙ্গিকে লেখা গল্প, কবিতা, নিজস্ব চিন্তাধারায় লেখা গবেষণামূলক প্রবন্ধ—যা অন্য কোনো পত্র-পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশ করতে সাহসী হবেন না বৈপ্লবিক বিরূপ সমালোচনার ভয়ে, তা 'আশ্চর্য!' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সাদরে বিবেচিত হবে। স্বাধীন সৃষ্টিমূলক চিন্তাধারার রুদ্ধ দ্বার খুলে দেওয়াই এই নতুন অভিযানের উদ্দেশ্য।

আশ্চর্য!

প্রকাশনার স্থান : ৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট, তেতলা, কলিকাতা-১২। প্রকাশকাল : মাসিক। মুদ্রক, সম্পাদক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী : ডঃ অসীম বর্ধন, ভারতীয়, ৯৭-১ সারপেনটাইন লেন কলিকাতা-১৪।

অ্যাল্‌ফা-বিটার
বার্ষিক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রতিযোগিতা
১৫০০৲ নগদ পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার.....৫০০৲

দ্বিতীয় পুরস্কার.....৩০০৲

তৃতীয় পুরস্কার.....২০০৲

পাঁচটি সম্মানিত উল্লেখ পুরস্কার.....প্রতিটি ১০০৲

সহজ নিয়মাবলী

১। কোনো ফর্ম পূরণ করতে হবে না।

২। বইখানি লেখকের মৌলিক রচনা হওয়া চাই।

৩। বিষয়, আঙ্গিক, ভাষা, কিংবা দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কোনো বাধানিষেধ নেই। সবরকম অপ্রকাশিত রচনাই গ্রহণযোগ্য : উপন্যাস, জীবনী, ধর্মগ্রন্থ, কিশোর সাহিত্য, আত্মকথা, কবিতা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, রম্যরচনা, পাঠ্য পুস্তক, দর্শন, ব্যবসায় বাণিজ্য, অর্থনীতি, খেলাধুলা, কারিগরী ইত্যাদি। অপ্রকাশিত অনুবাদও গ্রহণযোগ্য।

৪। কেবলমাত্র যেসব পাণ্ডুলিপি ২রা জানুয়ারী এবং ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্ থেকে প্রকাশিত বা প্রকাশের জন্য চুক্তিবদ্ধ, সেইগুলিই গ্রহণযোগ্য। একাধিক বইএর লেখক প্রত্যেক বইএর জন্য পুরস্কার পেতে পারেন।

৫। প্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলি গ্রন্থকারের নামে কপিরাইট করানো হবে এবং তিনি প্রত্যেক বইএর প্রথম সংস্করণের খুচরা দামের বিক্রীর ওপর ৪০% হিসাবে রয়্যালটি পাবেন। বিজয়ী প্রতিযোগিরা নগদ পুরস্কার ছাড়াও এইগুলি পাবেন।

৬। যাঁদের বয়স ২১ বছরের বেশি, কেবলমাত্র তাঁদের কাছ থেকেই প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে। ছদ্মনাম ব্যবহার করা চলবে, তবে লেখকের প্রকৃত নাম-পরিচয় অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌সের প্রকাশককে জানাতে হবে।

৭। অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌সের কর্মচারী এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজন প্রতিযোগিতার অধিকারী হবেন না।

৮। অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌সের সম্পাদকমণ্ডলী প্রতিযোগিতার বিচার করবেন এবং ঐ বিচারকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যেসব লেখকের পাণ্ডুলিপি তৈরী এখনও শেষ হয়নি এবং অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌সের সম্পাদকের সঙ্গে সে-বিষয়ে পরামর্শ করতে চান, তাঁরা নির্দ্বিধায় এসে আলোচনা করতে পারেন।

৯। আগামী বছর ১লা মার্চ পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে। গ্রন্থকার ও তাঁদের বই সম্পর্কে প্রচার-সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্র, এবং সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদিতে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হবে। বিজয়ীরা আগামী বছর ১৫ই মার্চ নাগাদ তাঁদের পুরস্কার পেয়ে যাবেন।

আগে যাঁরা বিজয়ী হয়েছেন

* তারকা চিহ্নিত অ্যাল্‌ফা-বিটা গ্রন্থকারগণ এশিয়া পাবলিশিং, রাজকমল প্রকাশন, নিউ বুক এমপোরিয়ম, বরেন্দ্র লাইব্রেরী, এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, রাজপাল এণ্ড সন্স প্রভৃতি প্রকাশকদের সঙ্গেও চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সম্মানলাভ করেছেন।

* ঢেউভাঙ্গা মুক্তা—বাংলা উপন্যাস
আদিত্য কুমার ভট্টাচার্য

* আও খুলী বয়ার—হিন্দী কাব্য
রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, এম্ এ

* দি টু ভিশন্‌স্‌—ইংরেজী উপন্যাস
প্রোঃ ডি সূর্য রাও এম্‌ এ

* জীবনের লুপ্ত রেখাগুলি—বাংলা গল্পগ্রন্থ
নারায়ণ চক্রবর্তী

স্পেশ, টাইম অ্যাণ্ড আই—দর্শন
সেবাসটিয়ান জোস্‌

মাই এক্সপেরিমেণ্ট উইথ্‌ ইমোশন্‌স্‌—ইং কাব্য
সদানন্দ মোহান্তি

* এক সমুদ্র দুটি মন—বাংলা কাব্য
অধ্যাপক শান্তিভূষণ রায়, এম্‌ এ, এল্‌ এল্‌ বি

নতশির ঊর্মি—বাংলা উপন্যাস
গ্রেগরী মুখার্জী

* স্বগতা—হিন্দী কাব্য
প্রোঃ কুমারী মধু, এম্‌ এ

ঋষভ-গান্ধার—বাংলা কাব্য
সত্যব্রত বসু, বি, এ,

দেয়্যার ইজ মোর টু লাফ্‌—ইংরেজী রম্যরচনা
পি কে সেন

* ইরাসিব্‌ল্‌ ইরিডিসেণ্ট ইরিডিয়্যাম্‌—ইংরেজী রম্যরচনা
রাজা আর ভি এম্‌ জি রামারাও

প্র্যাকটিশ অভ সয়েললেশ কালটিভেশন—ইংরেজী কৃষিবিদ্যা
ভি কে চ্যাটার্জী

দীপশিখা দ্যুতিময়—বাংলা কাব্য
অধ্যাপক বিনয় মিশ্র, এম্‌ এ

আচার্য দ্রোণ—ইংরেজী নাটক
অধ্যক্ষ ডি এ সদরযোশী

স্যাডোজ ইন্ দ্য সান্‌সাইন—ইংরেজী উপন্যাস
প্রোঃ জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য, এম্ এ (লণ্ডন)

আপনি কি এ বছরের বিজয়ী তালিকায় থাকবেন ?

কোনো ক্ষেত্রেই সফলতার কথা আগে হতে নিশ্চয় করে বলা যায় না।

তবে একটা জিনিস আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি : যদি আপনার পাণ্ডুলিপি ড্রয়ারে কিংবা শেল্‌ফে লুকিয়ে পড়ে থেকে তার ওপর ধূলো জমতে থাকে, তাহলে আপনার বই সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। কিংবা যদি আপনি খুব ভরসাবোধ না করেন, আপনার প্রথম সাহিত্য প্রচেষ্টাকে বাজারে প্রকাশ করার মতো আত্মবিশ্বাস যদি কম থাকে। কিংবা যদি আপনি অন্যান্য প্রকাশকদের কাছ থেকে অমনোনীত হয়ে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে থাকেন।

আপনার পাণ্ডুলিপি আমাদের দেখতে দিন

মনে রাখবেন : ওপরের তালিকায় উল্লিখিত গ্রন্থকারদের অধিকাংশই অ্যাল্‌ফা-বিটায় আসার আগে অনামী ছিলেন। কে বলতে পারে আপনিও একদিন আপনার সাহিত্যিক সফলতার জন্য আমাদের প্রকাশনা পরিকল্পনার অবদানকে স্বীকৃতি না দিয়ে থাকতে পারবেন ?

সব রকম লেখকের জন্য বিপুল সুযোগ !

এ দেশের বৃহত্তম প্রকাশনা সংস্থাগুলির অন্যতম এই অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্ থেকে বহু নতুন লেখক সাহিত্য জগতে নেমেছেন—এঁদের মধ্যে সামান্য চাষী, ছাত্রছাত্রী থেকে সুরু করে অধ্যাপক, গৃহিনী, মধ্যবিত্ত কেরানী, এমন কি জমিদার রাজাও আছেন ! আমরা আরও বইএর খোঁজ

চালাচ্ছি যে সব বই বেস্টসেলার তালিকায় উঠতে পারে। আমাদের বার্ষিক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নতুন প্রতিভাধর লেখকদের আবিষ্কার করতে চাই। আমরা এমন কথা অবশ্যই বলি না যে, আমাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রতিযোগিতায় যিনি পুরস্কার পাবেন তিনি আপনা হতেই নামযশের গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন! তবে একথা সত্য, আমাদের যে সব গ্রন্থকার অ্যালফা-বিটা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিজয়ী হবেন, তাঁরা প্রত্যেকেই গ্রন্থজগতে দ্রুত স্বীকৃতি লাভ করবেন সর্বত্র।

যেহেতু অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্ উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন বহু লেখককে আকৃষ্ট করে থাকে, সে কারণেই অনেক প্রকাশক অ্যাল্‌ফা-বিটা প্রকাশিত বই এবং পত্রিকার লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, সেই সব লেখকদের সঙ্গে সরাসরি রয়্যালটি ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হতে আগ্রহবোধ করেন।

যে সব লেখক মনে করেন, তাঁদের প্রতিভা আছে কিন্তু প্রকাশিত হতে পারছেন না, তাঁদের জন্য আমরা লক্ষ্য-সফলতায় এগুবার সহজ পথ করে দিই এবং সেই পথে এগিয়ে চলার জন্যে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিই।

ডঃ অসীম বর্ধন
এম্ এড, এম্ এ, ডি-ফিল
প্রকাশক
অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্
৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট, তেতলা, কলকাতা ১২

সম্পূর্ণ উপন্যাস

স্বপ্ন শেষ

রেণুকা দেবী

নারী-পুরুষের অস্ফুট মনের বর্ণাঢ্য ছবি এঁকে অনেকেই অনেক উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু প্রবীণা লেখিকা রেণুকা দেবী এই উপন্যাসটিতে দেখিয়েছেন, অনাবশ্যক বাকচাতুর্য আর কাব্যাবেগের আড়ম্বর না রেখেও কেমন করে স্বচ্ছন্দভাবে নারীমনের ভাষাহীন তরঙ্গকে সাহিত্যশিল্পে ফুটিয়ে তোলা যায়।

আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যে রকমারী চটকদারী এক্সপেরিমেণ্টের জটিলতার ভীড়ে 'স্বপ্নশেষ' উপন্যাসটির সরল সহজ বাস্তবানুগ আঙ্গিকের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। আজকাল সাহিত্যের মধ্যে সমাজ-সত্যের নগ্ন-রূপকে খুলে-মেলে ধরার যে রেওয়াজ হয়েছে এবং হৃদয়-ভাবের সৌন্দর্যরূপকে অবহেলার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তারই মাঝে রেণুকা দেবীর উপন্যাসখানি আবার প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, সত্য ও সৌন্দর্যের সংমিশ্রণে যে-সাহিত্য সৃষ্টি হয় তারই প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। এই উপন্যাসটিতে আনন্দ-বেদনা আছে, কিন্তু উত্তেজনার অবসাদ নেই; আছে নারী-পুরুষের প্রেম-বিরহের চিরন্তন হাসিকান্নার দোল-দোলানো পালা, নেই কিন্তু দেহ-লালসার ক্লান্তি-জাগানো অপরাধমন্যতার বিষাদ-ছায়া।

পড়লে বেশ মনে হবে বানানো গল্প নয়, যেন সত্যি-কারের একটি জীবন-কাহিনীর ডায়েরী। পড়বার পরে একটা নিটোল জীবন-অভিজ্ঞতার আনন্দে মনটা আলোকিত হয়ে উঠবে, জীবন সংগ্রামে শক্তিমান মনে হবে নিজেকে। আর সেইখানেই তো উপন্যাস-সাহিত্যের উপযোগিতা!

বাংলা দেশের সমতল ভূমির লোক আমরা, ধূলো কাদায় পা ডুবিয়ে পথ চলাই অভ্যাস। সহরের পিচঢালা পথ, ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ডের খোয়া পাথর দেওয়া রাস্তাই পদচারণার পক্ষে পরম কাম্য। ছোট ছোট নুড়ী ও কাঁকড় ভরা রাঙ্গা মাটির পথ যে শুধু মনকে রাঙ্গায় তাই নয়, হাঁটবার শক্তিকে যেন দ্বিগুণ করে। হাওয়া বদলানো, বাড়ীর তদারক করা, অথবা শুধুই বেড়াবার জন্যে কোন ছুটি, বিশেষ করে পুজার ছুটির অবকাশে কিছু জনসমাগম হয় এখানে। কেবল অবসর আছে বলেই নয়, কাঁকড় বিছানো রাস্তা, ও দুপাশে হর্তুকী বয়রার গাছ মহুলের গাছ, সব কিছু মিলিয়ে রাস্তায় ঘোরবার একটা আকর্ষণ যেন আছে। তাই দেখা যায়, যাঁরা এখানে অবকাশ বিনোদনে আসেন, সকাল-বিকেল বেড়িয়েই বেড়াচ্ছেন। তাঁদের দেখা যায় রাস্তায় মাঠে শাল-মহুলের বনে, নিকটবর্তী গাঁয়ে অজয় নদের তীরে, আর লাল পাহাড়ের ধারে।

নুড়ী কাঁকড় ভরা রাস্তা, আশেপাশে উঁচু হয়ে ওঠা পাথরের চাপ, স্তূপ! এই তো, কেমন সুন্দর, তার ওপর একটু কষ্ট করে হাঁটলেই কাছাকাছির মধ্যে একটা পাহাড় দেখতে পাওয়া যাবে তাই নয়, একটু চেষ্টা করলেই তাতে ওঠাও যাবে, এ লোভ সামলাতে পারলাম না। অবশ্য যাঁদের দার্জিলিং, সিমলা, মুশৌরি দেখা আছে, বা যাতায়াত আছে তাঁরা হাসবেন, কিন্তু আমার মত গ্রাম আর কলকাতা সহর এবং তার ছোট একটি ঘরে জীবন কাটে তার কাছে এই লাল

পাহাড়ের স্বপ্ন, হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গের চেয়ে তুচ্ছ নয়।

সামান্য কুটুম্বের সম্বন্ধের চেয়ে, বন্ধুত্বটাই বেশী বন্ধন হয়ে উঠে ছিল, মাণিকবাবুদের সঙ্গে। সেই সূত্রেই ওঁদের সঙ্গে, সাঁওতাল পরগণার এই ছোট সহরটিতে এসেছি। একটি সাবডিভিসান সহর। তাই কিছু সরকারি কর্মচারী, কিছু বহুকালের প্রাচীন বাঙ্গালী বাসিন্দা, একটি অতি প্রাচীন উচ্চ ইংরাজী স্কুল, কিছুসংখ্যক উকিল আছেন, বাঙ্গালী বাসিন্দাই বেশী। সাঁওতাল, কাহার বাগ্‌দী, ডোম, ও কিছু কৃশ্চানও এখানে আছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের একটি আশ্রম আছে। সব মিলিয়ে ছোট সহরতলীটা বেশ জমজমাট, দোকান পসারও বেশ কিছু। ওদিকে স্টেশানের ধারে রেলওয়ে কোয়াটার্স, ও কিছু সৌখিন লোকের বাড়ী। চাকর মালীর ভরসায় থাকে, বছরে কদাচিত মনিবরা কেউ অথবা তাঁদের পরিচিতরা আসেন কদিন থাকতে।

এই জামতাড়া সহরটা থেকে লাল পাহাড়ের দূরত্ব মাইল ছ'য়েক মত হবে। আমরা আছি স্কুলবাড়ীর কাছেরই একটা বাড়ীতে।

ভোর চারটে বাজবার আগেই আমরা রওনা দিলাম, লাল পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। ক্রমশঃ পাকাবাড়ী মাথায় টালী ছাওয়া বাংলো বাড়ী সব ছাড়িয়ে নির্জন মাঠের পথ ধরলাম, তখন সূর্য্যদেব সবে আকাশকে একটু গাঢ় রংএ রঙ্গীন করেছেন। রাতের অন্ধকার কাটলেও আবছায়া তখনও সব দিক থেকে সরে যায় নি, পূবদিক টাই একটু আলো আলো কেবল।

সাঁওতাল পরগণার ছোট একটি পাহাড়তলী গাঁ, অজয় নদের কোল ঘেঁসে, লাল পাহাড়ের তলদেশে এই লাল গাঁ। এখানেও কিছু জনবসতি আছে। কিছু সাঁওতাল, কিছু আধাবেহারী, আধাবাঙ্গালী মিশ্রিত ভাষাভাষি লোক। কয়েক ঘর বাঙ্গালী কৃশ্চান সম্প্রদায় বাস করেন। সেই গ্রামের পথ ধরে চলেছি আমরা জন

ছয়েক। আমি, মাণিকবাবু, তাঁর ভায়রাভাই সুশীলবাবু, মাণিকবাবুর ছেলে বারো বছরের রজত, আর মাণিক বৌদি ও তাঁর ছোট বোন।

এলারং মাটি দিয়ে নিকানো, মাটির দেওয়াল, চকচকে করে নিকানো, কোন বাড়ীর দেওয়ালে আবার লাল, কালো রং দিয়ে নক্সা কাটা, খড় ছাওয়া কুঁড়ে ঘর কখনও বা পাশাপাশি, দু তিন সারি ঘর, কখনও বা দূরে দূরে এক সারি ঘর, মাঠের মাঝখানে বা একধারে। ঘুমন্ত গ্রাম, কচিৎ এক-আধজন উঠে, ঘর থেকে বার হয়ে, আঙ্গিনার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে সদ্য ঘুম ভাঙ্গা দিনকে দেখছে যেন। মাইল তিনেক পথ অতিক্রম করবার পরই দূরের পাহাড় আমাদের চোখের নজরের মধ্যে এল। যদিও পাহাড় তখনও অনেক দূরে।

সহর কলকাতার মানুষ আমরা। চলমান যন্ত্রের উপর ভর করে নিশ্চল অবস্থায় থাকতে অভ্যস্থ পদযুগল যেন, আর চলতে চাইছে না। মহিলা দুজন তো মাঠের ওপরে বসে পড়ে, চটি খুলে রেখে, চরণযুগলে হাত বুলিয়ে নিতে লাগলেন। এই সময়ে ঠিক যেন সকাল হয়েছে বলা যায়। আশেপাশে দু এক জন লোক চলাচল আরম্ভ হয়েছে। সকালে মাঠের খোলা হাওয়ায় অল্প বিশ্রামেই আবার সতেজ হওয়া যায়। শরতের শেষ, বাতাসে অদূর হেমন্তের হিমেল পরশ যেন ছুঁয়ে যাচ্ছে। মাঠের মধ্য দিয়ে টানা পথ, এ পথে সাইকেল ও গরুর গাড়ী যায়, এই পথেই আমরা চলতে থাকলাম।

প্রায় রাত থাকতে বার হয়ে, আমরা যখন পাহাড়তলী গাঁয়ে এসে পৌঁছলাম, তখন চারিদিকে রোদ ঝলমল করছে, আলোয় রুপালী আভা ছড়িয়ে পড়েছে। পাহাড় যত কাছে আসে, আমরাও যেন তত ক্লান্ত হয়ে পড়ি। যখন দেখা গেল, সত্যিই পথের শেষ হয়েছে, ঐ তো, পাহাড়ের পদতল পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তখন বৌদি মাটির ওপরে বসে পড়লেন—তোমরা ওঠবার চেষ্টা

করগে, আমরা একটু বিশ্রাম করি। রজত খুব উৎসাহে পাহাড়ের দিকে ছুটে গেল।

মাণিকবাবু প্রস্তাব করলেন চা-টা এখুনি খাওয়া হবে কি না? আমাদের তিনজন, অর্থাৎ পুরুষদের কাঁধে ঝোলান থলির মধ্যে, দু ফ্লাস্ক চা, বিস্কুট, ডিমসেদ্ধ কলা, স্থানীয় মিষ্টি মোণ্ডা ও পক্কান্ন ছিল। মাণিকবাবুর প্রস্তাবে সবাই খুশী হলাম, ঠিক হল তাহলে একেবারে পাহাড়ের কোলে গিয়েই খাওয়া হবে। উঠে আরো একটু এগিয়ে গেলাম। সামনেই এক প্রকাণ্ড অড়হর ক্ষেত। সবে গুটী ধরেছে গাছে। ক্ষেতের সামনেই খানিকটা ঘাস ঘাস জায়গা। সেখানে চা সেবার অয়োজন হল। তিনটে ছোট কলাই করা গেলাস ও ফ্লাস্কের ঢাকা, চায়ের কাপের স্থান নিল। কাগজ ছিঁড়ে খাবার প্লেট হল, বেশ ভালই লাগছিল, বাতাসের ঠাণ্ডা ভাবটা এখন আর নেই।

খাওয়ার শেষে পাহাড়ে ওঠবার কথা। কিন্তু মাণিকবাবু বললেন, তিনি আগে গ্রামটা ঘুরে দেখবেন। পাহাড়ে ওঠবার তেমন বাসনা তাঁর নেই। মহিলা দুজন, মাণিকবাবুকেই অনুসরণ করবেন বুঝতে পারলাম। ছোট বড় সাত-আটটি পাহাড় নিয়ে এই লাল পাহাড় আর ছোট হলেও বেশ খাড়া। আমরা যেদিকটায় ছিলাম, রজত আর সুশীলবাবু, সে দিক থেকে প্রথম পাহাড়টায় উঠবার জন্য যাত্রা করলেন,—আমার কেন জানি না, চতুর্থ, অর্থাৎ যেটাকে আকারে বড় মনে হচ্ছিল, সেইটাতে উঠবার ইচ্ছাই মনে এল—আমি যখন প্রথম পাহাড়কে পেছনে রেখে চলেছি, তখন পাহাড়ের কিছুটা ওপর থেকে, খুশীতে ডগমগ রজত-কাকু বলে ডাক দিল।···

গ্রামের মধ্যে পাহাড় বা পাহাড়ের চারপাশের এক পাশে নদী ও গ্রাম বলে, লাল পাহাড়ের গায়ে, বেশ পথ চলার পায়ের চিহ্ন আছে। মাঝে মাঝে একটা দুটো বুনো গাছও আছে। আমার মনোনীত পাহাড়টির কাছে এসে গেলাম।

চার দিকেই পায়ের চিহ্ন, কিছু কিছু স্থানকে যেন চিহ্নিত করেছে। মানুষের পা, এই পাহাড়ের বুকেও নিজের ছাপ রেখেছে, আমি সেই পদরেখা খুঁজে উঠবার চেষ্টা করলাম। বেশ কিছুটা ওঠবার পরই যেন, হাসির ধ্বনি শুনতে পেলাম। মানুষের হাসি। সেটা যেন ঝরণা ধারার মতই নেমে আসছে। কার হাসি জানি না, তবুও সে হাসির উচ্চ গ্রাম থেকে মিলিয়ে যাওয়া শেষ রেশটুকুও যেন মধুর। ঠিক সেই "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো"। দেহে মনে একটা শিহরণ বয়ে গেল।

একটু দ্রুতপদে উপরে উঠতে লাগলাম।—মনে হল, পাহাড়টি বেশ চালু, একটা পাথরের পরে আর একটা, এমনি করে চলবার ব্যবস্থাই খানিকটা করা আছে। বেশ কিছুটা ওঠবার পর একটু দূরে দুটি মূর্তি দেখতে পেলাম। দুটিই অবশ্য মহিলা মূর্তি, তারা তখন পূর্ব দিকে ফিরে, অর্থাৎ আমার দিকে পেছন ফেরা।

আবার শুনতে পেলাম হাসি, তবে এবার ওপর থেকে নিচে নেমে আসা ঝরণা ধারার মত নয়, কাছাকাছির মধ্যে, জলতরঙ্গের মত। একজনে পিঠে মুখ রেখে একজন হাসছে। আমার মনে হল, সকালের ঝলমলানো এই মিঠে রোদের সঙ্গে, সমতাল রেখে কলকল করে উঠছে একটি মিঠে সুর। আমি যখন একেবারে ওপরে উঠে এলাম, অর্থাৎ সুরসৃষ্টি কারিকর একেবারে সমস্তরে, ব্যবধান অতি অল্পই, তখন আমার উপস্থিতি অনুভব করে, তারা এদিক ফিরলো, আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে পরক্ষণেই, ঠিক একইভাবে সখীর কাঁধে মাথা রেখে, আবার হাসতে আরম্ভ করেছে, সেই হাস্যময়ী।

ঠিক আমার কি করা উচিত বুঝতে না পেরে, নেমে যাব কিনা, ভাবছিলাম। পাহাড়ের ঠিক ওপরে একদিকে, একটু প্রায় সমতল জায়গা, আর অন্য দিকে বেশ সরু হয়ে ওঠা, চুড়া তিন ভাগ হয়ে গিয়ে—যেন, একটা প্রাচীর তৈরী করেছে। সমতল মত স্থানে,

উঁচু, নীচু কয়েকটা ঢিবি, যার দুটোর ওপরে···বসেছিলেন মহিলা দুটি —সেখান থেকে বাঁদিকে পাঁচীলের মত চূড়া। আমার ইতস্ততঃ ভাব দেখে···অন্যজন, হাস্যময়ীকে ধমক দেয়, "এই চুপ করো।" পরে আমার দিকে ফিরে বলেন—"আপনি, ওপরে উঠবেন? তা উঠে আসুন।"

ওপরে উঠে দাঁড়াতে গেলে—ওঁদের বেশ কাছাকাছিই উঠতে হবে, তখনও ভাবছি দেখে—মহিলাটি বেশ সপ্রতিভভাবেই বললেন—"আপনি উঠে আসুন। নমস্কার, নিশ্চয় জামতাড়ায় চেঞ্জেও এসেছেন।"

আমি উঠে আসি, প্রতিনমস্কার করে বলি—আপনারা?

—আমরা, এই গ্রামের বাসিন্দা। ওই যে সাঁওতালদের কুঁড়ে ঘর, তার পেছনে টালী-ছাওয়া বাংলো, ওটাই আমাদের বাড়ী। এতক্ষণে হাসি সামলে, দ্বিতীয়াও এগিয়ে এলেন—আপনি নিশ্চয়ই কলকাতার লোক?

—সেটা তো, আমার এই ভোর বেলাতেই ঘর্মাক্ত কলেবর দেখেই বুঝতে পারছেন, সামান্য কায়িক পরিশ্রম সহ্য করবার ক্ষমতা নেই। রাজধানীতে বাস করে, চমৎকার রাজসিক অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে, রজত ও সুশীলবাবু প্রথম পাহাড়ের প্রায় মাথায় এমনি একটি সমতল জায়গায় উঠেছেন, দূর থেকে আমাকে দেখে হাতছানি দিচ্ছেন ওঁরা। আমিও হাত নাড়িয়ে সাড়া দিলাম। রজত চীৎকার করে প্রতিধ্বনি গুণছে বারে-বারে কাকু-কাকু বলে।

—আপনারা অনেকেই এসেছেন তাহলে? প্রথমা প্রশ্ন করেন।

—হ্যাঁ, আমরা যে কজন, জামতাড়ায় এসেছি, তবে, দাদা আর বৌদি পাহাড়ে ওঠেন নি, ওঁরা এই পাহাড়তলী গ্রাম ঘুরছেন। কি চমৎকার লাগছে, কি সুন্দর আপনাদের গ্রাম। পাহাড়ের ওপর থেকে যতদূর দেখা যায় সবুজ প্রান্তর। ক্ষেতের মধ্যেকার ধানের চারা গুলিকে মনে হচ্ছিল, দুর্বা ঘাসের গুচ্ছ। অড়র ক্ষেতগুলি, একটু

বেশী হয়ে উঠেছে। খড় ছাওয়া ঘরগুলিকে ঠিক আঁকা ছবির মতই লাগছিল।

চারিদিক থেকে, কোঁকোঁর কঁ, করে ডাকা মোরগের স্বর যেন, দূর প্রান্তের পাখীর কাকলীকে ছাপিয়ে উঠছিল।···কোঁকর কঁ করে এই ডাক, নীচ থেকে—ওপরে একটা জাগো জাগো, প্রতিধ্বনি নিয়ে ফিরছিল। চতুর্দিক নিস্তব্ধতার মধ্যে মুক্ত প্রকৃতিও ব্যক্ত করেছিল। পাহাড়ের অপর দিকেই দেখা যাচ্ছে, প্রবাহিত অজয় নদকে। দুই পাড়ে বিস্তীর্ণ লালচে বালির চড়া, তার মধ্যে দিয়ে ক্ষীণ জলধারা। তার মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা চেহারা শীর্ণস্রোত ধারা। আমি বলে উঠি, "এই অজয় নদ ?"

প্রথমা বলেন, হ্যাঁ এখন বোঝবার উপায় নেই, বর্ষাকালে ওর চেহারা বদলে যায়।

—কিন্তু এখন দেখে তো মনে হয়, বালি আর বালি শুধুই···বালির চড়া।

শুধুই বালি ? চকচকে ধার দেওয়া তলোয়ারটা দেখছেন না—কবি গুরুর ঝিলামের মত···দ্বিতীয়ার কণ্ঠস্বরে যেন বেশ কৌতুকের আভাস।

আবার তাকাই অজয় নদের দিকে। সত্যিই বালির মাঝে মাঝে, যে ক্ষীণ জলধারা, ও মাঝে মাঝে বালির চড়াকে ঘিরে কিছু বক্রাকৃতি হয়ে গিয়েছে সেই স্রোতধারা সকাল বেলার রোদে ঝলসে উঠে শাণিত তলোয়ারের রূপই যেন ধারণ করেছে। তবু বালি। হ্যাঁ কিছুটা রোমান্টিক রূপ, তাই নয় কি ?

দ্বিতীয়ার হাসির সঙ্গে বাণী যেন নেচে উঠলো—ঠিক বলেছেন, এক রহস্যময় রূপ নিয়ে, যেন সেই রূপার কাঠি ছোঁয়ান, রূপকথার পুরীর মত, অজয় নদ তার লালচে বালির জাজিম বিছিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। তার সোনার কাঠি হচ্ছে মেঘ গর্জন, আর বৃষ্টির ঝম ঝম রব। ঘুমন্ত পুরুষ সিংহ অজয় নদ তখন, জেগে উঠবে, জল ভারে স্ফীত হয়ে উঠবে, অজয় নদের বক্ষভার। ক্রোধে ফুলে উঠবে, অজয়ে

আসবে বান, মেদিনী সিক্ত করে, দুই কূল প্লাবিত করে দিয়ে অজয় গ্রহণ করবে তার অজেয় রূপ।

এতগুলো কথা একটানা—খানিকটা কোন বিষয়ের রিহার্শেল দেওয়ার মত করে বলে দ্বিতীয়া, প্রথমার মুখে বেশ চাপা ক্রোধের ভাব দেখা গেল।

আমি কথাকে অন্য দিকে নেওয়ার জন্য বলি, আপনারা এখানে বহুদিন আছেন?

—অন্তত আমাদের ছোটবেলা থেকে।

রোদের উত্তাপ বেশ বেড়ে উঠেছে। ওরা দুজনেই যেন নেমে যেতে ব্যস্ত। বলেন—এত দেরী হয়ে গিয়েছে, বড়মা ভাববেন হয়তো। আপনি কি এখনও থাকবেন?···আমি দেখলাম রজতরা ওদিকে নামবার চেষ্টা করছে—আমি বলি আমাকেও নামতে হবে, সঙ্গের লোকদের সঙ্গে এক হওয়া দরকার।—মনে হল, এই পাহাড়-টায়, ওঠা-নামার কেবল অভ্যাস আছে নয়, কতকগুলি চেনা স্থান আছে—সেইখানে পা রেখে নেমে যেতে থাকলেন, মহিলা দুজন। আমিও দেখাদেখি সেই স্থান ধরে নামতে চেষ্টা করলাম।—যত ছোটই হোক তবুও একটা পাহাড়, বিশেষ করে আমার পক্ষে এই প্রথম। উঠবার সময় মনের একটা প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে উঠেছিলাম ঠিক বুঝতে পারি নি। নামবার সময় ভীষণ ভয় করছিল, প্রতি পদেই স্খলনের সম্ভাবনা ছিল। আমি যখন অর্ধপথে নেমেছি, তখনি মহিলাদ্বয় নেমে গিয়েছেন। অবশেষে আমিও নেমে এলাম। আমি তখন একটু ঘুরে রজত ও সুনীল বাবুদের খোঁজ নিতে গেলাম। এগিয়ে যেতে গিয়ে দেখি মহিলা দুটি আমার আগেই এদিকে এসেছেন। রজত ও সুশীলবাবু তখনও নামতে পারেন নি, বসে বসে থেমে আসছেন। মহিলারা হলেন, এই কটা পাহাড়ের মধ্যে, চতুর্থ টাতেই নামা-ওঠা সহজ, আর ওটার মাথারও একদিকে কিছুটা স্থান সমতল মত থাকায় বসবার সুবিধা পাওয়া যায়। রজতরা যেটায় উঠেছিল,

সেটায় কিছুটা কষ্ট করে ধরে ধরে নামার পরেই, এমন ভাবে পাথরের চাপ পাওয়া যায়, যেটা খানিকটা সিঁড়ির কাজ করে।—আনন্দে আত্মহারা হয়ে রজত নেমে এল।

মহিলা দুজনের মধ্যে প্রথমা জন হঠাৎ আমাদের চা খাওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন।—চলুন আমাদের ওখানে একটু চা খেয়ে আমার বাবার সঙ্গে পিসিমার সঙ্গে আলাপ করে আসবেন। এখানে আপনাদের মত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে অথচ বাড়ীতে ডাকি নি জানলে, বাবা খুব ক্ষুণ্ণ হবেন।

সুশীলবাবু বল্লেন, আমাদের আরো তিনজন সঙ্গী আছেন। তারা এই কাছেই আছেন, হয়তো নদীর দিকে বা গ্রামের দিকে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই যাব।

দ্বিতীয়া বললেন, এদিকে গ্রাম,—ওই পর্যন্ত শেষ, তারপর সব ক্ষেত। বাঁ দিকে একটা বড় পল্লী, মানে একটু ঘন বসতি—ওই যে, কুঁড়েগুলোর পেছনে আমাদের বাড়ী। সরকার সাহেবের বাড়ী—এ ছাড়া ওই দূরে দূরে দু একটা ছাড়া-ছাড়া কুঁড়ে।···

আমি বলি, ওই ডান দিকের সারির শেষে তো, আমরা ঠিক হাজির হব।···দেখি কোথায় গেলেন ওঁরা।

মহিলা দুজন খুব খুশী হয়ে চলে গেলেন। রজত ততক্ষণে ছুটে গিয়েছে পাহাড়ের পাশ ঘুরে নদীর দিকে কিছু দূর যেতেই দেখতে তার মা আর মাসীমা, একেবারে নদীর ধারে বসে আছেন,—আর তার বাবা দূরে একখানা বড় পাথরে বসে আছেন।

কাকু এখানে এখানে বলতে বলতে রজত আবার আমাদের দিকে ছুটে এল। আমরা সকলে তখন, নদীর দিকে গেলাম। দু একজন চাষী বৃদ্ধ, কয়েকটি মেয়ে তখন নদীতে চান করবার চেষ্টা, জল সংগ্রহের চেষ্টা করছে। ওপর থেকে যে জলধারা খুব শীর্ণ মনে হচ্ছিল, সেটা ঠিক ততটা শীর্ণ নয়। মাঝখানে কিছু গভীর জল আছে, আবার মাঝে মাঝে, প্রকাণ্ড বালুর চাপ, এমন ভাবে আছে

যেন মনে হয় অনায়াসেই সেখানে হেঁটে যাতায়াত করা যায়। তবে জল যেটুকু আছে খুব পরিষ্কার। সকালের রোদে যেন, নদীর তলার বালুও ঝকঝক করছে। রাত্রে নিশ্চয় চাঁদ তারার পরিষ্কার ছায়া পড়ে। ভারী চমৎকার লাগছিল, এত কিছু করা সত্ত্বেও দেখলাম, বেলা তখন আটটা চল্লিশ মত হয়েছে। আমাদের সঙ্গে আনা দু ফ্লাস্ক চা, এক ফ্লাস্ক জল, সবই শেষ হয়ে গিয়েছে, অল্প কিছু খাবার ছিল, তাই রজতকে দিতে গেলেন, বৌদি অর্থাৎ ওর মা। রজত খুব খুশী হল। মাণিকবাবু বল্লেন, গ্রামে কিছুই খাবার দেখলাম না··· এখন সবে গোয়াল খুলছে—আর কিছুই না, একটু চা পেলেই হত, তিন ফ্লাস্ক চা নিলেই ভাল হত···

বাধা দিয়ে সুশীলবাবু বলেন, কিছু দরকার নেই দাদা, সুবীর ভায়া কাজের ছেলে।···এ হেন জায়গাতেও চায়ের নেমন্তন্ন ম্যানেজ করে ফেলেছে।···

মাণিকবাবু বলেন, তাই নাকি···বাঃ খাসা কাজের ছেলে।

—তা আর বলতে—তার ওপর দুটি মহিলা হচ্ছেন, নিমন্ত্রণ কর্ত্রী।

আমি বলে উঠি, বৌদিই কেবল জানেন না—

—বল কি সুবীর, এমন অঘটন কি করে ঘটালে? বলেন মাণিকদা।

—অঘটন কেন, এইটাই তো স্বাভাবিক, কি বল সুবীর? বলে, আমাকে একটা বাহাদুর বানাবার ভাব দেখান বৌদি।

চিত্রাদি বলে ওঠেন—মহিলা তো অনেক জাতীয়াই আছেন এখানে—কোনটি, কাহার, না সাঁওতাল কুটিরে···চা মিলবে, না ওদের সেই হাঁড়িয়া মিলবে?

—ম্যানেজ খানা, দেখলে তাক লেগে যাবে, দুজন, অতি সুদর্শনা, শিক্ষিতা, মহিলা—মনে হয়, গরম গরম চায়ের সঙ্গে উৎকৃষ্ট টা-এর ব্যবস্থা থাকবে। আপনার বুদ্ধিমান স্বামীটি, আবার তাদের সময় দেবার জন্য আগেই পাঠিয়ে দিয়ে, আপনাদের নিয়ে হাজির হচ্ছেন জানিয়েছেন। আমার ইচ্ছা ছিল, বেশ আপনাদের ফাঁকি দিয়ে

চা জলখাবারের পেট ভরিয়ে, হাসি ঠাট্টায় মন ভরিয়ে আসা,—তা আপনার কর্তাটির কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার পরে কি আর তার উপায় আছে—উনি চান পত্নী সেবায়, পতির পুণ্য।

বৌদি বলেন, তা যা ঘটেছে তা ভালর জন্যেই ঘটেছে। না, হলে ওই সুদর্শনা, সুমার্জিতা মহিলা মহলে, তোমার মত রত্ন গিয়ে উপস্থিত হলে—কি দুর্ঘটনা ঘটতো, কে জানে।

—আচ্ছা দিদি তোমরা কেবল, দুর্ঘটনার কথাই ভাববেন, কোন সুঘটনাও ঘটতে পারতো তো—

—ঠিক এই জন্যেই চিত্রাদিকে আমি এত পছন্দ করি, কোন একটা সুঘটনা ঘটিয়ে দেবার দিকে চেষ্টা নেই—আবার যাতে দৈবচক্রে না ঘটে সেই দিকে খরতর দৃষ্টি। আমি বলি।

এতক্ষণ চুপ করে থাকা মাণিকদা বলেন—আরে বাবা, দৈবচক্রে যা ঘটে, তা কি কেউ খণ্ডাতে পারে, দৈবের চেয়ে বড় সহায় আর কিছু নয়, চুপ করে ভরসা করে থাক।

বৌদি বলেন, অনেক কথা হলো এবার চল, কোথায় চা-টা চমৎকার ব্যবস্থা···

নদীর পাড় ভেঙে ওপরে এসে, লাল পাহাড়কে পেছনে ফেলে, ডান হাতি এগিয়ে গেলাম···মিনিট সাতেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম, বাংলো বাড়ীটার সামনে। কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া সামনেটা, তাহলেও কাঠের একটা ছোট গেট আছে, গেট থেকে কাঁকড় বিছানো পথটা বাড়ীর বারান্দার সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়েছে, সামনে কিছুটা ফুল বাগান, অবশ্য একদিকে কিছু বড় গাছের ফুল গাছও আছে। তবে শরৎ শেষ, তাই কিছু সিজ্‌ন ফ্লাওয়ার-এর চারা সামনে, ঢল ঢলে বাগানের চেহারা নিয়েছে।

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে ছিলেন, কয়েকখানা বেতের চেয়ার সামনে নিয়ে। তিনি গেটে আমাদের দেখেই নেমে এগিয়ে এলেন, আসুন, আসুন বলে। ইতিমধ্যেই দ্বিতীয়া জন এক ঝলক বারান্দায়

দেখা দিয়েই ভেতরে চলে যান, মনে হয় বোধহয় প্রথমাকে ডাকতে।

না, বারান্দায় এলেন একজন প্রৌঢ়া মহিলা।···ততক্ষণে আমরাও বারান্দাতে উঠে এসেছি। বারান্দাটি বেশ চওড়া, মানে লোকজন এলে বেশ বসানো চলে।

চা-এর সঙ্গে টা-এর ব্যবস্থা সত্যিই বেশ ভালই ছিল। এই পাহাড়তলী গাঁয়ে বেড়াতে এসে যে এমন অভ্যর্থনা ভাগ্যে জুটবে, তা ধারণাই করতে পারিনি। গৃহস্বামীর পরিচয় পেলাম প্রায় কুড়ি বছরের ওপর হল ইনি এখানে এসেছেন. এখানেই কিছু জমিজমা কিনে চাষ আবাদ করেই আছেন। সহর থেকে দূরে এই শান্ত পরিবেশে বেশ ভালই আছেন। ওঁর দিদি এখানে আছেন প্রায় ত্রিশ বছর হয়ে গেল। ওরা কৃশ্চান। এখানে একটি মিশন আছে। যাঁকে আমি দ্বিতীয়া জন বলে বলেছি তিনি গৃহকর্তা শশীনাথ রায় মহাশয়ের দিদি সুরবালা দেবীর মেয়ে সুলেখা দত্ত। দ্বিতীয়াজন শশীবাবুর মেয়ে লতিকা রায়চৌধুরি। মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ কিন্তু এখানে নেই, ওরা পাটনাতে থেকে পড়াশোনা করে। শশী-বাবুকে অতি ভদ্র শান্ত স্বভাবের লোক বলে মনে হল।

আমাদের পরিচয় শুনলেন। জামতাড়ায় থাকার মধ্যে আবার আসবার জন্যে তনুরোধ করলেন।

চা লুচি, হালুয়া, শশীবাবুর বাগানের সদ্য তোলা বেগুন ভাজা ইত্যাদি সহযোগে বেশ তৃপ্ত হওয়ার পরে আবার হেঁটে রওনা হবার কথা ভাবতেই, বেশ খারাপ লাগছিল। দেরী না করে রওনা হওয়ার জন্য তাগাদা দিলেন মাণিকদা। রোদের দিকে তাকিয়ে সকলের মনই খারাপ লাগছিল।

শশীবাবুই প্রস্তাব করলেন—তাঁর গরুর গাড়ী করে পৌঁছে দেবার বললেন—আমরা সাধারণত সাইকেলে যাতায়াত করি···তবে আমি, নিজে খুব কমই যাই, আমার চাকর মতিলালই যায়। হাটের দিন, আর মেয়েরা কখনও সহরে বেড়াতে গেলে—ষ্টেশনে গেলে,

গরুর গাড়ীই ভরসা। অবশ্য একজন লোকের গরুর গাড়ী করে যাওয়া, পোষায় না, গিয়েও পোষায় না। মনে হয় এত আস্তে চলার থেকে হাঁটাই ভাল।

শশীবাবু তাঁর চাকর মতিলালকে ডেকে, ক্ষেত থেকে, গাড়ীর জন্য লোক ডাকতে পাঠালেন।·· একটু পরেই ওর গরু গাড়ী চালক বংশী এসে গেল। আমরা ততক্ষণ, ওঁদের বাড়ী আর বাগানটা দেখছিলাম। প্রায় বিঘে আড়াই জুড়ে এই বাড়ী আর সংলগ্ন বাগান। লাল পাহাড় ছড়িয়ে ওদিকে ওঁর ক্ষেতি জমি। সামনের দিকটা নিচু কাঁটা তারে ঘেরা, পিছনটা কিন্তু পাকা পাঁচিল। এদিকে কিছুটা খড়ের ছাওনি। গরু মোষ থাকে। গরুর খাবার, গরুর গাড়ির সবকিছুই থাকে। পেছনের দিক থেকে গাড়ি বার করবার রাস্তা আছে।···আধ ঘণ্টার মধ্যে বংশী গাড়োয়ান ও ছোকরা চাকর একটা গাড়িটাকে এনে বাড়ীর সামনে রাখলো ·· আমরা যা ভেবে ছিলাম ঠিক তা নয়। চমৎকার দরমা দিয়ে তৈরী ছৈ দিয়ে মাথা ঢাকা গাড়ীটা। তার মধ্যে সতরঞ্জি আর সুজুনি বিছিয়ে রাখা। প্রথমে তো ভাবতেই পারছিলাম না কি করে এর মধ্যে ছ'জন যাব। গরু অর্থাৎ বলদ লাগাবার আগেই, আমাদের উঠতে হল।—হাসি আর আনন্দের মধ্যে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা গাড়ীর মধ্যে উঠলাম। একটা মোড়ার ওপর পা দিয়ে আমরা উঠলাম। নধর সুপুষ্ট দুটি বলদ, একধারে নিবিষ্ট মনে ঘাস খাচ্ছিল ; বংশী তাদের ধরে, ঘাড়ে হাত বুলিয়ে গাড়ীর সঙ্গে জুড়ে নিল। গাড়ীর কাছে মেয়েরা আর একবার বিদায়ের পালা সারলেন। সুলেখাদেবীর সঙ্গে চিত্রাদির খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। অন্য মেয়েটি একটু স্থির। অল্প কথার অভ্যাস বলে মনে হল।—লম্বা অনেকখানি পথ থেকে দুটি মেয়েকে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেল। গাড়ী যখন ঘুরে গেল, আর শশীবাবুর বাড়ীও অদৃশ্য হয়ে গেল,—তখন যেন বৌদি নিজের মধ্যে ফিরে এলেন, ছৈ-এর ছাতে হাত দিয়ে বললেন,

—না, সুবীর তুমি সত্যিই কাজের ছেলে।

চিত্রাদি বল্লেন, হেঁটে ফিরতে হলেই হয়েছিল আর কি।

রজত তার মেশোর সঙ্গে গাড়ীর বাইরে দিকে মুখ করে ছিল, ওর খুবই ভাল লাগছিল। গরুর গাড়ীতে চড়া, আমাদের প্রত্যেকেরই এই প্রথম।

হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে একটা রহস্যজনক হাসি হেসে। চিত্রাদি বললেন—গরুর গাড়ীতে চড়া এই প্রথম কথাটা নিয়ে।

—হ্যাঁ ওঠা এই প্রথম, কিন্তু শেষ না হতে পারে। আচ্ছা দিদি,—কার কার পক্ষে এই গরুর গাড়ীতে আবার ওঠবার আশা আছে?

বৌদি বললেন—কেন সকলেরি···আবার একদিন গেলেই···

আমি অবশ্য চিত্রাদির কথার রহস্য বুঝতে পেরেছিলাম।

—দিদির যদি কোন সাধারণ জ্ঞান থাকে···

মাণিকদা তাঁর স্বভাবসুলভ কথা বলবার সুযোগটা ছাড়েন না—বলেন, ভাই, সেটা তোমার দিদিকে ভাল করে বুঝিয়ে দাও তো···

বৌদিও ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—খুব হয়েছে। হচ্ছে সুবীরকে নিয়ে, এর মধ্যে আমি কেন?

আমি বলি, দেখছেন চিত্রাদি···বন্ধনে জড়িত না হওয়ার সুফল।

—সুফল কিসের, সুশীলবাবু বলে ওঠেন।

—সব জায়গায় সম্ভাবনা···বিরাট ক্ষেত্র বুঝলেন, আমি বলি।

—আহা ওরা যে কৃশ্চান, বৌদি বলে ওঠেন।

—না দিদি, তুমি একেবারেই হোপলেশ।

এবার সকলেই হেসে ওঠেন। ও প্রসঙ্গ সেদিন ওখানেই শেষ হল।

এর পর আরম্ভ হল নিত্যদিনের প্রধান প্রসঙ্গ। অর্থাৎ ফিরে

গিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা।

বৌদি বললেন, আমার ভৈরব চন্দ্রকে তো বার বার বলেছিলাম, যে আটটা নাগাত উনুনে আগুন দিয়ে দিবি, আমরা যদি না আসি, ডাল সেদ্ধ নামিয়ে ভাত চাপাবি, আমরা এসে যাব। তখন তো জানিনে এত দেরী হবে।

চিত্রাদি বললেন, ভাত ডালটা যদি করে রাখে যথেষ্ট হবে। মনে হয় আমরা দশটার মধ্যেই পৌঁছে যাব। দশটা বাজতে তখনও মিনিট পঁয়তাল্লিশ দেরী আছে। চা জলখাবার খাওয়ার পরে গরুর গাড়ীর দোলুনীটা বেশ ভালই লাগছিল। গাড়ীর ছৈতে হেলান দিয়ে মাণিকদা এক ঘুমই দিয়ে নিলেন। বৌদি, চিত্রাদিরও চোখে ঘুম ঘুম ভাব। সজাগ ছিল একমাত্র রজত, সে নানা রকম প্রশ্ন করতে করতে চলেছিল। সুশীলবাবু যেন দু চোখ ভরে সাঁওতাল পরগণাকে দেখছিলেন।

আমি! আমি কি কিছু ভাবছিলাম? চিত্রাদির ইঙ্গিতবহুল কথার কোন কিছু নিয়ে? না, সে দিন আমি কিছু ভাবি নি।

দশটা বাজবার প্রায় দশ মিনিট আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম। বংশী গাড়োয়ান গরু দুটো খুলে দিল, ছোকরা সহদেব তার মুখে ঘাস দিল। গরুর গাড়ী এল বলে কিছু কেনাকাটা ছিল, বংশীরা বাজারের দোকানে গেল।

কলকাতা থেকে সঙ্গে আসা চাকর, ভৈরব বাড়ীতে ছিল। সে ডাল-ভাত, একটা তরকারি করেছিল। মাছওলা এলে মাছ রেখেছে, ওখানে আবার মাছওলা বাড়ীতে আসে। তা রাঁধবে কি না বুঝতে না পেরে অপেক্ষা করছিল। মাণিকদা তাকেই হুকুম দিলেন, একটা ঝাল রান্না করে বাকীটা ওবেলার জন্য ভেজে রাখতে। আর রান্না প্রায় করা আছে দেখে মেয়েরাও বেশ খুশী হয়ে গেলেন।

চিত্রাদি বললেন, বেশ কাটল কিন্তু সকালটা। সত্যিই সকাল-বেলার, এই বেশ লাগার রেশ নিয়ে দিনটাই চমৎকার কেটে গেল।

বিকালে বেড়াতে বার হলে এখানে এই সময়ে যে জনসমাগম হয়েছিল, তাঁদের কোন না কোন দলের সঙ্গে দেখা হতই।

এঁদের মধ্যে কোনও দলের সঙ্গে আলাপও হয়েছে, মাণিকদা বা বৌদির, কিন্তু আমি যেন অপাংক্তেয় হয়েই রয়ে গিয়েছি। অচেনা মেয়েরা, মেয়েদের সঙ্গে যত সহজে মেলামেশা করে অপরিচিত ছেলে মানে আমার মত যুবকরা কিন্তু তেমন সহজে মেশে না কিংবা মিশতে পারে না। যাঁরা কর্তা গৃহিনী পর্য্যায়ের, সুবিধা খুব বেশী, তাঁরা হয় তো বাজার দর নিয়েই কথা-বার্তা আরম্ভ করে দিলেন। অপেক্ষা কৃত অল্পবয়স্ক পুরুষ মহিলারা তাঁদের ছেলেপিলে, তাদের দুষ্টুমী কিংবা পড়াশোনা দিয়ে।···তাই এখানে এসে আমারই হয়েছে সব চেয়ে মুস্কিল। চিত্রাদিরা গত রবিবার সকালে এসেছেন, আজ বৃহস্পতিবার। শনিবার দিন ওঁরা চলে যাবেন। ওঁরা নিছক বেড়াতে এসেছেন। মাণিকদা দু মাসের ছুটি নিয়ে চেঞ্জে এসেছেন, ওঁর নিজেরি পেটের গোলমাল চলছে বলে। আমাকে জোর করে ধরে এনেছেন। রজতের স্কুল খুললেই চলে যাবে, দিন কতক মাসীর কাছে থাকবে। ওর স্কুল মাসীর বাড়ী থেকেই বরং কাছে পড়ে। মাণিকদা আগেই এসেছিলেন। কয়েক দিন পরে আমি এসেছি ছুটি নিয়ে। এসে কিন্তু ভালই লাগছে। বলতে গেলে, নিজের দাদা বৌদির চেয়ে, এঁদেরই আমার বেশী আপন মনে হয়। মাণিকদা সত্যিই স্নেহ করেন আমাকে। বৌদি নিজের ভায়ের মতনই দেখেন।

বিকেলে, বৌদি আর বার হয় নি, সুশীলবাবুও নয়। মাণিকদা, চিত্রাদি, রজত আমি। রাস্তায় দেখা দুই দলের সঙ্গে। মাণিকদা ও চিত্রাদি কথা বলার সঙ্গী পেলেন, আমি একা, রাস্তার একদিকে দাঁড়িয়ে থাকলাম। প্রথম দলে, দুটি তরুণী ছিল, দ্বিতীয় দলে, একজন। আজ হঠাৎ মনে হল, এই তরুণীদের এই পঁচিশ দিনে, অন্তত চল্লিশবার দেখেছি, হাটে রাস্তায় স্টেশানে, সাহানার বাঁধের ধারে বা রামকৃষ্ণ মিশন বাড়ীতে, কিন্তু সহজ ভাবে এগিয়ে এসে আলাপ

করে নি কেউ বরং কেমন অসহজ ভাবেই এক পাশ হয়ে গিয়েছে। এঁরা কিন্তু কেউ বাইরে বার হন্ না, পুরুষের সামনে যান্ না, কথা বলেন না, এমন নন। এক জড়তা যেন এদের ঘিরে আছে। আমার মনে আজকের দুটি সহজ, সরল তরুণীর ব্যবহার যেন ছবির মত ভেসে উঠলো। অপরিচিতের সঙ্গে পরিচিত ব্যবহারের উদারতা। কেবল আমি বা আমরা বলে নয়,—যে কোন অপরিচিত জনকে, সরল ভদ্র ব্যবহারে প্রীত করতে তারা যেন অভ্যস্ত। লোকালয়ের বাইরে মানুষ বলেই কি, তারা লোকজনকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছে। মেয়ে দুটির কথা ভাবতে গিয়ে আবার, কখন আপন মনেই বিচার করতে আরম্ভ করেছি, প্রথমার চেয়ে দ্বিতীয়া যেন অতি সহজ মানুষ। কলকাতা সহর সম্বন্ধে এক বিরাট ধারণা, যেমন অনেকটা আমরা বিলাত, অর্থাৎ লণ্ডন সম্বন্ধে করে থাকি। এখনও পর্যন্ত কলকাতা সহর দেখে নি ওরা। সুরবালা দেবী তাঁর এতকালের জীবনে দুবার কলকাতা গিয়েছেন। ছোট বেলায় আসামের চা বাগান, বিয়ে হয়ে ঝরিয়া, পরে জামতাড়াতেই কাটিয়ে ছেন। কলকাতায় যে কদিন থেকেছেন, হাঁফিয়ে উঠেছেন, এত ঘিন্‌জীর মধ্যে। তারও ত্রিশ বছর পরে এখনকার কলকাতায় এলে, উনি কি বলবেন? এর পরেও চিত্রাদি থাকবার মধ্যেও কেবল, ওই পাহাড়তলী গাঁ আর ওঁদের কথা হয়েছে। চিত্রাদি বলেন, ওই সুন্দর হোক, ওই রকম বনবাসে, বাস করা আমার পোষাবে না। লোকজন নেই অমন জায়গা শুধু বেড়াতেই ভাল।

সুশীলবাবু বলেন, তাই তো, সিনেমা নেই, ফেরীওলা নেই, ওসব জায়গায় কি তোমাদের পোষায়।

চিত্রাদি বলেন, সাতদিন জামাইবাবুর সঙ্গে একছাতের তলায় থেকে, খাসা ভাষার উন্নতি হয়েছে তো তোমার।

—শুধু ভাষা কেন ভাই, বুদ্ধিও খুলেছে,—বলি কি আরও সাতদিন থেকে একেবারে পুরো উন্নতিটাই করতে দাও না, মাণিকদা

যুক্তি দেন।

—আমি একটু বোকাসোকা বরই ভালবাসি, বলেন চিত্রাদি।

এর থেকে এসে গেল বর কেমন হওয়া উচিত, পরে বৌ কেমন হওয়া ভাল।

বৌদি বল্লেন, কথার জাল বুনে কার কি লাভ,···তোমাদের কারও এখন বরও হচ্ছে না, বৌও হচ্ছে না, শুধু সুবীর ও নিয়ে মাথা ঘামাক।

মাণিকদা বলেন, ও একা মাথা ঘামিয়ে কি করবে, তিন-তিন, ছটা মাথা তো তাতে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে। ও বরং গরম হয়ে মাথা না ঘামিয়ে, ঠাণ্ডা হয়েই থাক।

বুঝলাম, মাণিকদা আমার দাদা বৌদির কথা বলছেন। আমি মুখে বিবাহ সম্বন্ধে যতই অমত প্রকাশ করি না কেন, মাণিকদার ধারণা, আমার দাদা বৌদিরাই এ ব্যাপারে অরাজী।

এত দিন, আমার ধারণা ছিল অন্য রকম, এর আগে দু একবার কথা হয়েছে, দু এক স্থানে দু চার জন, মেয়ের বাবা-দাদা এসে ফিরে গিয়েছেন, আমিই মত দিই নি, না বলেছি। আজ মাণিকদার কথায় আমার মনে একটা দাগ কাটলো যেন। ত্রিশ বছর মত প্রায় বয়স হয়েছে আমার। আজই যেন, বহুকাল পরে, মায়ের কথা মনে হল, এগারো বছর হল, মা মারা গিয়েছেন। কত কাল ধরে তাঁর স্নেহ পাই নি। এসে দাঁড়ালে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া, কাছে বসে খাওয়ান সব যেন একের পরে একে মনে পড়িয়ে দেয়। বৌদিরা আছেন,···তৈরি খাবার পাই,···আরও কিছু যেন জীবনে দরকার। মায়ের স্পর্শের পরেই কোন্ মহিলার? কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল। মায়ের কথার সঙ্গে অন্য একটি মেয়ের কথা এমন ভাবে জড়িয়ে আসে কেন? আমি কি শিশু? নিজের পাগলামীকে দূরে সরিয়ে দিতে গিয়েও পারলাম না ঠিক মত।

রবিবার দিন আমি আর এক কাণ্ড করলাম, সেও এক পাগলামী।

মাণিকদার বাড়ীওলার কাছ থেকে, তার সাইকেলটা চেয়ে নিয়ে, সাইকেল তিনটে বাজতে না বাজতেই বেরিয়ে পড়লাম, লাল পাহাড়ের পাহাড়তলী গাঁয়ের উদ্দেশ্যে। মাঝে মাঝে এমনি ভাবে সাইকেল চেয়ে নিয়ে ঘুরতাম আমি, তাই জন্যে, কেউ কিছু ভাবেন নি।

আমি হঠাৎ গিয়ে পড়লেও, আমাকে দেখে ওঁরা সবাই খুব খুশী হলেন। সেদিন চলে এলেও, একদিন গিয়ে আহার করবার নিমন্ত্রণ নিয়ে এলাম। সব চেয়ে আশ্চর্য কাজ করলাম, যে একদিন, যাওয়ার কথাটা মাণিকদাদের কাছে একেবারেই চেপে গেলাম। হঠাৎ কোন্ খেয়ালে যে এটা করলাম তা নিজেই স্পষ্ট করে বুঝলাম না।

জামতাড়ার জল মাণিকদার বেশ উপকারেই লেগেছিল। ওখানকার এক বাসিন্দার বাড়ীর ইঁদারা থেকে রান্না খাওয়ার জল আসতো। আর অন্য কাজের জল এই বাড়ীর ইঁদারা থেকেই নেওয়া, এই জলটা একটু অপরিষ্কার মত। তাঁদের সঙ্গে আলাপ বজায় রাখবার জন্যে, সকাল বেলা চা খাওয়ার পরে মাণিকদা যেতেন একবার করে। সেই বাড়ীর কর্তার কাছে, মাণিকবাবু, শশীবাবুর গল্প করেন। এই ভদ্রলোক এখানে স্কুল মাষ্টার, বাবা এখান আবগারী বিভাগে কাজ করবার সময়েই বাড়ী বাগান করেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ লাল পাহাড়ের পাহাড়ের দিকে, দু একঘর, ও সাহানার দিকে দুচার ঘর কৃশ্চান আছে বটে, তা আমরা বেশী খোঁজ খবর রাখিনে। তবে শীতকালে এখানে শশীবাবুর বাগানের কপি আর বেগুনের বেশ নাম হয় হাটে। বেশ যত্ন করে কপির চাষ করান তিনি। আমাদের সঙ্গে ওদের মেলা মেশা নেই। মাণিকদা বুঝলেন, ক' ঘর কৃশ্চানকে তাঁরা আমলই দেন না।

আমি যখন শশীবাবুর বাড়ী নেমন্তন্নর কথাটা বললাম, অবশ্য একটু অন্য ভাবে, যেন বাজারে ওদের বংশীর সঙ্গে দেখা, সে-ই যেতে বলেছিল, দেখা হল, আর বাড়ী আসেনি, তখন বৌদি একটু ক্ষুণ্ণ হলেন,

একা তোমাকে নেমন্তন্ন করেছেন?···অন্তত রজতকে বলা উচিত ছিল।

মাণিকদা একটু আশা করছিলেন, আমি ওঁর মত চাইবো। যাবার জন্যে।

কিন্তু আমি কিছু না বলায়—উনি, তা যেও, ইচ্ছা যদি হয়, বললেন।

দুপুর বেলা, খাওয়ার পরে ভাবলাম যাগগে যাব না। একি, পাগলামী করছি। আমি তো সত্যিই, তাদের ধর্মগোত্রের পর্যন্ত কেউ নয়। হঠাৎ দুটি তরুণী মেয়ে আছে বলেই কি যেতে চাইছি। তারা এ নিয়ে কিছু ভাবতে পারে। যাব না ঠিক করেই, বিছানার ওপরে গড়িয়ে পড়লাম।

তিনটে বাজবার পরে, ভৈরব যখন চা দিয়ে বলল, কাল আমি যাওয়ার আগে এখানকার মিষ্টি কিনবো কিনা,—তাহলে আজই অর্ডার দিতে হবে, তখনি মনে হল, কাল চলে যাব; ছুটি শেষ হয়ে যাবে।

অমনি ভৈরবকে আড়াইসের অমৃত জিলিপির অর্ডার দিতে বলে, পাহাড়তলী গাঁয়ে যাবার জন্য তৈরী হতে গেলাম, ওকে বলে দিলাম, রাত্রে আমি খাব না। বৌদিকে বলে যখন রওনা হচ্ছি, তখন বৌদি বললেন, দেখো, হৃদয় মন নিয়ে ফিরে এস, ঘরের ছেলেকে যেন ঘরে ফিরিয়ে দিতে পারি···

মনে হল, মাণিকদা খুব খুসী হন নি।

আমি যাওয়াতে সকলেই খুব খুসী হলেন। বিশেষ করে শশীবাবু। সত্যিই একথা মনে হচ্ছিল, আমাকে নিয়ে এত খুসী এর আগে যেন আর কেউ হন নি। সুরবালা দেবীর আচরণে সত্যিই মায়ের মত আদর অনুভব করলাম। মেয়েরা কিন্তু, ঠিক, আমার সঙ্গে মিশবার জন্য তেমন করে আসেন নি, ঠিক বাড়ীতে একজন ভদ্রলোক এলে, যতটুকু প্রয়োজন এ ছাড়া, অনর্থক গল্পগুজব করেন নি। শশীবাবুর

মেয়ে, লতিকাদেবী তো, অতি অল্প কথা বলে নিজের ভদ্রতাটুকু রফা করেছেন। ওঁরা কৃশ্চান, আমি হিন্দু এ নিয়েও কোন কথা, ওঁরা তোলেন নি। সুরবালা দেবী কেবল আমার কে কে আছেন, কি করি জানতে চেয়েছেন। মাণিকদা আমার নিজের দাদা নন জেনে বলেন—বড় ভাললোক ওঁরা। রাত্রে খাওয়ার সময়ে, দেখলাম, সাংসারিক কাজে, সুলেখা দেবী তাঁর মাকে সাহায্য করলেন। সকলেই এক সঙ্গে খেতে বসা হল—কিছুটা পরিবেশন করে বসলেন, সুরবালা দেবী। প্রয়োজন মত দেবে চাকর মতিলাল। খাওয়ার শেষে চলে আসার কথা। জ্যোৎস্না রাত্রি বেশ ভালই লাগতো। আলতো শীতের ছোঁয়া, রাতের বন, পাহাড় গাছপালার মধ্যে দিয়ে, এক রোমাণ্টিক মন নিয়ে চলে আসা, বেশ ভালই হত। কিন্তু সে রাত্রে ফেরা হল না। ওঁরা এমনভাবে বললেন যে আমি না বলতে পারলাম না।···

দুধারে বারন্দা দেওয়া সারিতে পরপর তিনটি ঘর, তারই এক ধার থেকে, আর দুটি লম্বা ঘর—শেষটি খাওয়ার ঘর, ভেতরেও বড় উঠান আছে। আমাকে তিনটি ঘরের প্রথমটিতে শুতে দেওয়া হল, এখানে একটি নেয়ারের খাটিয়া আছে। রাত্রে শোবার পরে অনেক-ক্ষণ ঘুম এল না, পাশের জানলা খুলতেই, জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে, লাল পাহাড়ের সারি দেখতে পেলাম। সাদা রং-এর মনে হচ্ছে। কোথায় ছিলাম কলকাতায়, এলাম জামতাড়ায়, আবার এখানে কোথায় শুয়ে আছি। শশীবাবুর বাংলোয়। কেন? শশীবাবু আমার কে? কেউ নন,—কিন্তু, কেউ হওয়া কি অসম্ভব? তাহলে? কোন্‌টি, কোন মেয়েটি, ছি-ছি একি ভাবছি আমি, একজন ভদ্রযুবক আমি দুটি বয়স্থা অবিবাহিতা মেয়েকে নিয়ে এই মনোবিলাস, কি অন্যায়!··· হঠাৎ একটা কথা খুব কৌতুকের মত, মনে হল, কাল যদি আমি, এঁদের কোন একটি মেয়েকে বিবাহ করতে চাই, কি ভাববেন এঁরা। পাগল নিশ্চয়ই। জানা নেই, চেনা নেই, অন্য সমাজ,···অন্য ধর্ম।

ধর্ম কথাটা কেমন বিদ্রূপ মনে হল, আমার কি ধর্ম? ধর্মের আমি কোন্ আচার পালন করি। তবু ঘুরে ফিরে দুটি মেয়ের কথা ভাবতে গিয়ে, শ্যামলা হাস্যময়ী লেখার কথাই মনে আসছিল। দুটি মেয়েতে যেন পরিপূর্ণ প্রভেদ। একে অন্যের বিপরীত। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখনও চারিদিকে আবছা ঘোর, কিন্তু কানের কাছে এত মোরগ ডাক যে ঘুমান সম্ভব নয়। শশী-বাবুর নিজেরই যথেষ্ট মুরগী-মোরগ আছে, তাছাড়া আশেপাশেও। উঠে এলাম। বাগানের একটা দিক ভিতরের উঠানে গিয়ে পড়েছে, সোজাসুজি তাকিয়ে দেখি, সেখানে একটা শিউলী গাছ, চারিদিকে ছড়ান শিউলি ফুলের মধ্যে, সুলেখা দাঁড়িয়ে আছে। আবছা, আবছা আলো-আঁধারি, সাদা শিউলি ফুলের ছড়িয়ে থাকা, তার মধ্যে, শ্যামলা সুলেখাকে যেন, এক অপূর্বময়ী মনে হয়। আমি হাত তুলে নমস্কার করলাম। সুলেখা নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে হাসলো, বলল, আজ ভোরে উঠে, আপনার মুখ দেখলাম,—দিনটা কেমন থাকে, কে জানে।

—সেটা কিন্তু আমার পক্ষেও। তা ছাড়া, আমি আজই রাত্রে চলে যাব।

সহজ সরল ভাবেই লেখা বলে উঠলো,—আমাদের ভুলে যাবেন না যেন। লেখা কিছুটা এগিয়ে এল।

পলকে আমার মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। কেমন আবেগ নিয়েই বলে উঠলাম, ভুলে যাব বলেই কি বারে বারে চলে এসেছি। কিন্তু লেখার মধ্যে এমন সহজ ভাব ছিল যে প্রথমে ঠিক বুঝতেই পারি নি। সহজ ভাবেই আমার দিকে তাকালো। তারপরে চোখ নামালো। আমার চোখে সে কি দেখেছিল জানি না, তবে তার চোখে, আমি যে বাঁধা পড়ে গেলাম, এটা বুঝতে পারলাম। একটু ক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। যেন নীরবে, এই ভালবাসাকে মেনে নেওয়া, সম্মানজ্ঞাপক মৌন সম্মতি। তারপর আমি বললাম, ওই দূরে

লাল পাহাড় আর এই উষার উদয়, আমাদের দুজনকে মিলিত হওয়ার আশীর্বাদ করুক। লেখা শুধু একবার পাহাড়ের দিকে, একবার আমার দিকে তাকালো। দূরে থেকেও বুঝতে পারলাম, ওর সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ খেলে গেল। ধীর পায়ে ও ভিতরের উঠানের দিকে চলে গেল।

আসবার আগে শশীবাবু আবার সুযোগ সুবিধা হলে আসবার কথা বললেন। শশীবাবুর আড়ালে, সুরবালাদেবী বললেন, দেবু মানে, শশীর ছেলেটি, আত্মহত্যা করবার পর থেকে ও যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। তোমাকে দেখে যেন হঠাৎ মনটা ভরে উঠেছে, কত কালের মধ্যে ওর মুখে এত কথা, এমন কথাবার্তা শুনি নি। মাঝে মাঝে ছুটি হলে এস বাবা, বড় খুশী হব। আমরা এদিক থেকে বড়ই দুঃখী, আপনার লোক তেমন কেউ নেই। থাকি এই দূরে নির্জনে। কৃশ্চান বলে, স্থানীয় লোকেরাও তেমন মেলামেশা করেন না। এখন যিনি জামতাড়ায়, এস, ডি, ও আছেন, তিনি সম্বন্ধে আমার আপন কাকার ছেলে। কিন্তু বাবা, কৃশ্চান হবার জন্য আমাদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই। সকলেই ত্যাগ করেছে। কেবল ওঁদের কথায় নয়, আপনা থেকেই জড়িয়ে গেলাম চুম্বক আকর্ষণের মত। তাই জামতাড়া ছেড়ে যাওয়ার সময়, মনকে রেখে যেতে হল নুড়ী ছড়ানো, পাহাড়তলী গাঁয়ে। লালটালী ছাওয়া ঘরের রঙ্গীন মোহে। পাহাড়ী ঝরণার হাসির মত, অন্য এক হাসির ঝরণা, বাঁশী বাজিয়ে, চলে এল, আমার সঙ্গে সঙ্গে।

এখানে এসেও মন স্থির হল না। এত দিন, বাড়ীর যে সব ছোট খাটো অসুবিধা আগে তুচ্ছ করেছি, সেগুলি যেন প্রতি পদে আমাকে মনে করিয়ে দিতে লাগলো আমি একা। রাত্রে বরাবর আমার খাবার ঢাকা দেওয়া থাকে। আমি নিজেই নিয়ে খাই, কিন্তু এখন মনে হতে লাগলো, আমাকে খেতে দেবার জন্য অপেক্ষমান একটি হৃদয়ের কথা। গেঞ্জি, রুমাল ইত্যাদি ঠিক সময় মত দিতে ভুলে

গেলে আর সেদিন চাকর তা কাচে না। পড়েই থাকে। এমনি কত ছোটখাটো ঘটনা। এত দিন পর্যন্ত এই একা থাকাটা, বেশ একটা গর্ব বলেই মনে করতাম। বাংলা দেশের বিবাহের পাত্র হিসাবে নেহাত অযোগ্য ছিলাম না। ভাল ভাবেই এম এস সি পাশ করেছি এবং আই সি আইতে প্রায় চারশো টাকা মাইনেতে চাকরীতে ঢুকেছি, উপস্থিত, তা দ্বিগুণ হয়েছে। প্রথম দিকে কিছুটা চেষ্টার ভাব দাদা বৌদিরা দেখিয়েছিলেন, সত্যি, কিছু কিছু সম্বন্ধ বিনা চেষ্টাতেই এসেছিল। তখন বয়স ছিল অল্প, স্বপ্ন ছিল অনেক। শীঘ্রই এ চাকরী ছেড়ে দিয়ে রিসার্চ করবো, ডক্টরেট হব। দেশের বাইরে, বিলেত কিংবা আমেরিকা ঘুরে আসবো, তার পরে, ওসব বিষয়ে ভাবা যাবে। বছর তিনেক পরে সে সব স্বপ্ন, স্বপ্নের চেয়েও সুদূর হয়ে গেল। আমি হয়ে গেলাম সাধারণ একজন চাকুরে। আমার টাকার ওপর ভরসা করে, আগেকার এই ছোট দুটি ঘর, একটা বড় দালান, এই ধরণের একটা বাড়ীর অংশ ছেড়ে দিয়ে, সাতচল্লিশ সালের, একশো পঁয়তাল্লিশ টাকায় চার খানা ঘরের ফ্ল্যাট বাড়ীতে ওঠা হয়েছিল, যেটা ছেড়ে দিলে এখন খুব কম করে চারশো টাকা ভাড়া হবে। আমাদের কাছে সেটা বাড়তি হারেও, মাত্র পঁচিশ বেড়েছে। বৌদিরা হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন, যে কিছু উপার্জ্জন করে, এমন একজন দেবর, অবিবাহিত থাকাটা খুব খারাপ নয়। তাই তাদের দিকের দায়িত্বটা, আমার অনিচ্ছার ওপর দিয়ে পাশ কাটিয়ে নেওয়াটার খুব বেশী অন্যায় নয়। এটাও ভাবতে পারেন, আজকালকার দিনের তুলনায়, কি এমন বয়স হয়েছে।

আমার দিক থেকে অনিচ্ছা বেড়ে যাওয়ার অন্য একটা বড় কারণ হচ্ছে, আজকাল যে আমরা একসঙ্গে থাকি, বা থাকে যারা মনে হয়, নেহাত নিরুপায়, হয়ে। প্রায় প্রত্যেক খরচ হিসাব করে সমান ভাগে দেওয়া ছাড়াও, মোটা খাওয়া-দাওয়াটা একসঙ্গে ছাড়া, আর কিছুই যেন এক নয়। মনটা তো নয়ই। উপরন্তু প্রত্যেকেই

প্রত্যেকের ত্রুটি বিচ্যুতি, আর্থিক সঙ্গতির ওপর ঈর্ষামূলক ভাব। তারি প্রতিক্রিয়া এসে পড়ে ছেলেমেয়েদের ওপর। আর এদের যদি কারো আর্থিক ক্ষমতা, অপর জনের অনেকখানি পার্থক্য রাখে তবে তার ফল হয়, আরো অন্যরকম।

আমাদের দেশ হালিসহরে, বাবা সেখানে ইস্কুল মাষ্টার ছিলেন। উচ্চ স্কুলের ইংরাজীর শিক্ষক ছিলেন। বড়দা বি-এ পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে চাকরি পান। মেজদা ম্যাথামেটিক্স এম এ পাশ করে, দুবার বি সি এস পরীক্ষা দিয়ে, অকৃতকার্য্য হয়ে প্রায় সরকারের ওপর রাগ করে, বেসরকারি বার্ড কোম্পানীতে চাকরী নেন, ফলে এখন তিনি চার অঙ্কের ঘরের মাইনে পান। কিন্তু নিজেদের চালচলন বজায় রেখে, মেজবৌদির ব্যয় বাহুল্য মান সম্মান, বজায় রেখে, মাসিক তেরোশো টাকা থেকে বছরে তের টাকাও রাখতে পারেন না। ছোড়দা এ জি বেঙ্গলে ক্লার্ক হিসেবে ঢোকে বি এ পাশ করে এস এ এস পাশ করে, এখন একটু পদস্থ হয়েছে। ছোটবৌদি হরিণঘাটা মিল্ক ডিপোয় একটা চাকরি জুটিয়েছেন, কিছু দিন হল। আর পয়সাকড়ি ওরা দুজনেই বোধ হয় জমিয়েছে ভাল। বড়দার দুই ছেলে এক মেয়ে, মেজদার দুই মেয়ে। ছোড়দার এক ছেলে এক মেয়ে। চারখানি শয়নঘরের তিনটি দাদাদের, অপর একখানি বৈঠকখানা, ছেলেদের পড়া ও দুই ভাইপো সহ, আমার শয়ন ঘর। এছাড়া রান্নাঘর, খাবার মত খানিকটা জায়গা। মাঝে মাঝেই, মেজদা অন্যত্র চলে যাবেন স্থির করেন, কিন্তু একটু ভদ্র গোছের ফ্ল্যাটের ভাড়া শুনে আর ভরসা পান না। বাড়ীটার ভাড়া আমি দিই, এ ছাড়া এটা বাড়তি ওটা বাড়তি নিয়ে যখনই কোন গোলমাল হয়, তখন সেটা আমি মিটিয়ে দিই। এ ভিন্ন ভাইপো-ভাইঝিদের কিছু চাহিদা, বৌদিদের মাঝে মাঝে সিনেমা থিয়েটার, এ সব করতে হয়। দেশের বাড়ী রক্ষার খরচটা ইদানীং বাড়ীর একাংশ ভাড়ার থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। আমাকেই এর ফলে অন্যত্র যেতে হত,

বিবাহ করলে। জায়গাও নেই, তাছাড়া এদের অনিচ্ছায় একটি কৃশ্চান মেয়েকে এদের মধ্যে আনবার ইচ্ছা আমার নেই। আলাদা সংসারের সমস্যাই ছিল প্রধান অন্তরায়। কিন্তু এখন সে মন অনেকটা স্থির করে ফেলেছি।

আমি প্রথমে ভেবেছিলাম হয় তো, মাণিকদা বা বৌদির কাছেই আমার বৌদিরা কিছুটা আভাস পাবেন কিন্তু ওঁরা এবিষয়ে কিছুই বলেন নি।

আমি এখানে আসার পর ভাল আছি জানিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলাম সুরবালাদেবীর নামে। তার উত্তরে বড়দিনের ছুটিতে যাবার নিমন্ত্রণ এসেছিল। কিন্তু বড়দিনের ছুটি আজকাল কম। তবু যাওয়ার বাসনা প্রবল হয়ে উঠলো। এটা অবশ্য ঠিক যে আবার যাওয়া মানে, নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েই যেতে হবে। কি ভাবে কথাটা দাদা বৌদিদের কাছে তুলবো। নানান চিন্তার মধ্যে দিয়ে দিনগুলো কাটতে কাটতে ডিসেম্বরের কুড়িটা দিন পর্যন্ত কেটে গেল। বাইশে তারিখে মনস্থির করে ছুটির ব্যবস্থা করলাম। চার কি পাঁচ দিন থাকবার মত। ২৩শে রওনা হলাম। বাড়ীতে বলে গেলাম জামতাড়ায় যাচ্ছি। মাণিকদাকে কিছুই জানালাম না।

বাইশ তারিখেই একটা টেলীগ্রাম করে দিয়েছিলাম। দেখলাম, চাকর মতিলাল, সাইকেল নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে সাইকেলটা দিয়ে, আমার সুটকেশটাও নিতে চাইলো। সুটকেসটা ক্যারিয়ারে নিয়ে আমি রওনা দিলাম। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় চলে এসে, ওখানে গিয়ে উঠতে বাধ বাধ লাগছিল। মনে মনে ভাবলাম, বিকেলে এখানে ডাকবাংলোয় খোঁজ নিয়ে সম্ভব হলে চলে আসবো। ওঁরা কিন্তু ঠিক প্রথম দিনের মতই সহজ সরল ভাবেই আমাকে গ্রহণ করলেন। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না, প্রস্তাবটা এখনই করা উচিত কি না। লেখার সঙ্গে আরো একটু খোলাখুলি আলোচনা না করে একেবারে প্রস্তাব করা সঙ্গত কি না।

আমার কতটুকু পরিচয় ওঁরা জানেন, ওঁদের দিক থেকে কোনও বাধা আছে কি না। শশীবাবু ও সুরবালাদেবীর সঙ্গে প্রথম কথাবার্তা সেরে ঘরে বসবার একটু পরেই এল লতা। ভাল আছেন? জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ খুব ভাল আছি। একটু পরেই এলো লেখা। লেখার মুখের দিকেই তাকিয়েই আমি যেন বুঝতে পারলাম। আমার আর কিছুই জানবার নেই। এমনকি নির্বাচনের পরীক্ষাতেও আমি পাশ হয়ে গিয়েছি।

—আবার এসে পড়লাম। মানে না এসে পারলাম না।

লতা বলল, লেখা, আমি একটু আসছি তোমরা গল্প কর। লতা বার হয়ে গেল। ভেতরের বারান্দা দিয়ে। লেখা একবার উঁকি দিয়ে দেখলো লতা কোনদিকে যায়। তারপর এগিয়ে এসে আমাকে বলল, কাপড় জামা বার করে দিতে, চানের জন্য গরম জল চড়ানো হয়েছে।

চাবীটা তার হাতে দিয়ে বললাম, শুধু সুটকেসের চাবী নয়, এই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের চাবীও দিলাম।

লেখা একবার আমার দিকে তাকালো, তারপর হাসির ভারে ফেটে উঠলো, তবে সরব হাসিটা, কোনমতে সামলে, নিল, আঁচলের মুঠো মুখে চেপে।

আমি তখনি ঠিক করলাম, এখানে মুখে এঁদের কিছু বলবো না, সবকিছু গিয়ে চিঠিতে সুরবালাদেবীকে জানাবো।

সেবার চারদিন থাকবার মধ্যে সুযোগ মত আরো ভাল করে জানালাম, আমার মনের কথা, বিবাহের প্রস্তাব। শান্তধীর মনে, লেখা শুনলো, আমার প্রেমের গুঞ্জন! আসবার আগে আবেগের ভরে, লেখার হাতটা ধরেছিলাম। কতটা চাপ পড়েছিল, খেয়াল ছিল না।

লেখা বলে—ছাড়ুন, ছাড়ুন—তাই বলে, ভেঙ্গে দেবেন না হাতটা।

আমি বলি, তোমায় আপনার করেই নিতে চাই—

এতক্ষণে লেখা কথা বলে—এই ব্যাপারে—কিন্তু, এর জন্যে আপনাদের পরিবারে আপত্তি, অশান্তি···এসব···

—আমি একাই বলতে গেলে, আর অসন্তোষ যেটুকু হবে, সেটা তেমন কিছু নয়, আমার দিক থেকে যেটুকু হারাব, পাব তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী।

লেখা শুধু তার মুখখানা আমার হাতের ওপর নামিয়ে রাখলো একবার।

সকলের সঙ্গেই দেখা হল, শুধু লতাকে পেলাম না দেখতে। ফেরবার সময় আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, কি আশ্চর্য সব যোগা যোগ হয়। আমি এমনভাবে ভালবেসে, পাত্রী নির্বাচন করে বিয়ে করবো একি কোনদিন ভেবেছিলাম?···কোথা থেকে যে কি ঘটে!

শশীবাবুদের বাড়ীর অনেক কথাই বলেছিলেন সুরবালা দেবী। লেখা আসলে শশীবাবুর কেউ হয় না। এমনকি সুরবালা দেবীর মেয়েও নয় সে। উনি সন্তানহীনা। লেখা সুরবালা দেবীর দেবরের মেয়ে। ঝরিয়ায় থাকতেন, দুই ভাই কলিয়ারীতে কাজ করতেন। কলিয়ারীর দুর্ঘটনায় লেখার বাবা মারা যান। ভাই মারা গেলে, আঘাত এবং ভয় দুই কারণে, ও চাকরী ছেড়ে দেন। দুটি মহিলা ও একটি শিশুর ভার তাঁর ওপরে। প্রায় ছেলের মত ছোট ভাই। ঝরিয়া থাকতেই এ অঞ্চলের একজনের সঙ্গে জানা ছিল। কাছেই কৃশ্চান পরিবার সরকার ও তরফদাররা ছিলেন। এখানেই বাড়ী করে বসবাস আরম্ভ, নিজের ও ভায়ের কিছু টাকা ছিল পোষ্টাপিসে রাখেন। বছর তিনেক পরে, সাত বছরের লেখা, তখন ওর মা মারা যান।

শশীবাবু কাজ করতেন, আসামের কোন এক চা বাগানে। লতার জন্মের পরই স্ত্রী বিয়োগ হয়। নবছরের একটি ছেলে, আর শিশু কন্যা—খুবই অসুবিধা, অব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই কাটছিল। বছর তিনেক কাটবার পরে খুব অসুস্থ হন, তিনি তখন সুরবালা দেবীর

অনুরোধে, ছেলে মেয়ে নিয়ে জামতাড়ায় আসেন। তখনি স্থির হয়, তিনিও চলে আসবেন।···ছেলে মেয়েকে আর নিয়ে যান নি, শশীবাবু নিজে গিয়ে, চাকরী মিটিয়ে সব ব্যবস্থা করে এখানে চলে আসেন। আর জমি জায়গা কেনেন ক্রমে ক্রমে। সুরবালা দেবীর স্বামী জামতাড়া সহরে একটা কয়লার ডিপো করেছিলেন—তিনি রোজই সহরে আসতেন। শশীবাবু, নির্জন পাহাড়তলী গাঁয়েই থাকতে ভাল বাসতেন। ছেলেকে দিলেন, জামতাড়া হাইস্কুলে। মেয়েরা ওখানকার কৃশ্চান মিশনারীদের চলিত প্রাইমারী থেকে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত ছিল, তাতেই ভর্তি হল প্রথমে। শালা ভগ্নীপতি, দুজনেই বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছিলেন। বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা পড়তে গেল পাটনায়। ছেলেটিকে ডাক্তারী পড়াচ্ছিলেন। ছেলে পড়া শোনাতেও ভাল ছিল। ফোর্থ ইয়ারে পড়বার সময়ে ছেলেটি আত্মহত্যা করে, প্রেমিকা অন্যত্র বিবাহ করলো বলে। লেখা ম্যাট্রিক পাশ করে আর পড়েনি লতা পড়ছিল কিন্তু ভায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে—এখন বন্ধ রেখেছে। বাড়ীর একমাত্র ছেলেটির মৃত্যুর বছরেই সুরবালা দেবীর স্বামী নিখিলবাবু মারা যান।

জানুয়ারী মাসে আর একবার জামতাড়া গেলাম। আমার জীবনের প্রথম প্রেমে আমি বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম। এমনি উন্মাদনাই কি আসে প্রত্যেকের জীবনে একটি মানুষকে কেন্দ্র করে এত ভাল লাগা। এই প্রেমই কি হেলায় রাজ সিংহাসন বিলিয়ে দেয়। আমাদের মেলা-মেশার মধ্যে লতা তার ইচ্ছা মত অংশ নিত লতা স্বল্পবাক। লতা আত্মকেন্দ্রিক। দুটি ভিন্ন প্রকৃতির মেয়ে এক সঙ্গে নিবিড় সখীত্বের মধ্যে মানুষ হচ্ছে। এখানে এঁদের রুচি ও ভদ্রতা অনুসারে লেখা আমাকে আপনিই বলতো। কিন্তু আমি মনের আবেগে ওকে যবে থেকে তুমি বলেছিলাম তার পরে তুমিই বলেছি। তাতে কেউ আপত্তি করেনি। সেদিন চায়ের শেষে বেলা তখন চারটে হবে আমরা তিনজন একটু পদচারণায় বার হলাম।

অড়র ক্ষেত এখন নেই, ধান ক্ষেত তখনও কিছু আছে। পাতা ঝরে পড়া হর্তুকী বয়রা গাছে শূন্য ভাব যেন। হঠাৎ লেখা বলে—এই যে মাঠ ভরা ঘাস, পাকা ধানের শীষ, আর মোরগজটা আর চন্দ্রমল্লিকার ঝাঁপিয়ে ওঠা ফুলভার এসব কিসের প্রকাশ বলুন তো—

—কিসের প্রকাশ মানে? তুমি কি প্রকৃতির প্রকাশের কথা বলছো? স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে লেখা বলে, বলবো নাকি লতা?

দেখলাম, লতার মুখ থম থম করছে, যেন তার কোনও গোপন কথা লেখা বলে দিতে চাইছে। বলে, কি ছেলেমানুষী হচ্ছে লেখা। আসুন সুবীরবাবু, আমরা ওই বটগাছ তলায় বসি। ওখানে এখনও আলো রয়েছে।

বট গাছটা, কত ঝুরি নামিয়েছে দেখেছেন···বলি আমি।

আহা ওতো ঝুরি নয়, ওতো মাটির বুকে হাজার কান পেতে থাকা। অশান্ত হৃদয় বটগাছ···

দেখলাম লেখার কথায় লতার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। লেখা বলে চলে, কেবল বটগাছ কেন, মাটির বুকে বৃক্ষ লতা, পুষ্প সবই যেন বসুমতীর বাক্যহীন বাণী। পাহাড় পর্বত, নদী ঝরণা সবই তো, সেই বাণীই বহন করে চলেছে।

একটি ছোট ছেলের কোন গোপন কথা বলে দিলে, সে যেমন কিছুটা রাগ, কিছুটা অসহায় বোধ করে, লতাকে দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছিল। আমি বলি, থাক না, লেখা, গোপন কথা গোপন থাকাই ভাল। এই সময়ে দূরে কয়েকটি ছোট ছোট সাঁওতাল ছেলে মেয়ের দল দেখে লতা দৌড়ে ওদের দিকে চলে গেল।

লতা চলে যাবার পরে লেখা বলে—একেবারে ছেলেমানুষ, কি যে সব আবোল-তাবোল ভাবে। ওর একটা খাতা আছে, দেবো আপনাকে পড়ে দেখবেন। আরও কিছুক্ষণ পর লেখা বলল, চলুন আমরা যাই, ও আর এদিকে ফিরবে না।

রাত্রে খাওয়ার শেষে, সত্যিই লেখা আমাকে একটা খাতা দিয়ে

গেল। প্রথম ভেবেছিলাম···যাক গে, কিন্তু ঘুম না আসায় উলটে পালটে দেখতে লাগলাম।···

না, রচনা, না ডায়েরী কেমন ছাড়া। তবুও পড়তে পড়তে ভালই লাগল। আজ বৃষ্টি হচ্ছে, নিস্তব্ধ দুপুরের এই বৃষ্টি আমার মনে হচ্ছে মেঘ যেন দিনকে গান শোনাচ্ছে। সে দিন, মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে দেখি বৃষ্টি হচ্ছে···অলস ঝরণ, রাতের ব্যথায়, মেঘের এ কি কান্না··· আবার অবেলার বৃষ্টির শেষে, বিকেলের মান ভাঙ্গিয়ে পাতায় পাতায় টিপ্ টুপ্ টুপ্ করে বাজান হচ্ছে···

লেখা, লেখা, আমাকে জোর করে জড়িয়ে ধরো আর একটু। আকাশে চাঁদ নেই, আজ কি অমাবস্যা? তারাগুলো যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে।

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র ঠিক বলেছেন···গাছেরা, ফুল, লতাপাতারা সবাই সচেতন। ওরা প্রাণবন্ত। সে দিন সরকার কাকা, সমস্ত গোলাপ ফুল তুলে, হাটে পাঠালেন·· আমি দেখলাম গোলাপ গাছ কেঁদে উঠলো—ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া ফুলগুলোর জন্যে—তার কি যে কান্না, কেউ বুঝলো না, দেখলো না।—

আবার একজায়গায় দেখি—লেখা, লেখা মন খারাপ করো না, আমি তো আছি···লেখা, তুমি আমার ছোট্ট মেয়েটি কেমন?···আমি, তোমার মা।—লেখা, মা কেমন হয়, খুব ভালবাসেন তাঁরা—বড়মার চেয়ে বেশী ভাল কেউ বাসতে পারে না—তাই না—

একজায়গায়—লেখা আছে—হে ঈশ্বর, আমার বাবাকে শান্ত কর, শোক বহন করবার শক্তি দাও—ভুল ধারণা থেকে মুক্ত কর···।

ফুলগুলো ফোটে। কে ওদের ফোটায়,—আমরা কাঁদি, কে আমাদের কাঁদায়—সূর্য্যদেব রোজ অমন লাল হয়ে অস্ত যান কেন?

এমনি সব এলো—অসংলগ্ন—কথা—কিছু বোধ্য, কিছু অবোধ্য। রেখে দিলাম খাতাখানি। মনে হল, মেয়েটি মানসিক সুস্থ তো!—এই প্রথম লতাকে নিয়ে একটু ভাবতে পারলাম।—চেহারায় স্বাস্থ্যে

গঠনে, লতাকে লেখার চেয়ে বড় মনে হত। সুগৌর রং, চমৎকার চোখ মুখের গঠন, খাড়া নাক, এই বাড়ীতে একেবারে বেমানান যেন। শশীবাবুকে দেখে যদিও ভাবা যায় এককালে রংটা ফরসাই ছিল, সুরবালাদেবী কৃষ্ণকায়াই জন্ম থেকে। শান্ত ভাব ছাড়া, আর কিছু উল্লেখ করবার নেই। বয়সে লেখার চেয়ে, বছর দুয়ের ছোটই লতা। কিন্তু আকৃতিতে বড় হলেও, মুখের ভাবে ও স্বভাবে, নিছক একটি বালিকা ছাড়া আর কিছুই নয় লতা। হঠাৎ যেন একটি বিদেশী মেয়ে বলে ভুল হওয়াও আশ্চর্য নয়। যেন প্রতি-পালিতা হচ্ছে এখানে।—সব সত্ত্বেও প্রাণহীন ভাব। বোধহীন ভাব, তার দেহে, মুখে, স্বভাবে, এমন কি মনেও। তাই লতার চাইতে, শ্যামলা লেখার আকর্ষণীয় অনেক বেশী, লেখার জৌলস আছে দীপ্তি আছে। আর তার—অপরূপ হাসি। হাসির কথায় মনে হল—এতবার দেখবার মধ্যে লতাকে কি কোন দিন হাসতে দেখেছি। মনে করতে পারলাম না—ঘুমিয়ে পড়লাম।

এবার এসে একদিন বড়বৌদির কাছে বললাম, আমি বিয়ে করবো, ঠিক করেছি বৌদি।

—খুশী হলাম, পাত্রী দেখবো নাকি।

—না, সে কষ্টটা আর তোমাদের দেব না—ওটা আমি ঠিকই করেছি।

—আমাদের তাহলে কিছুই করবার নেই বলো?

—এর পর তোমরা কিছু করবে, কি করবে না সেটা তোমরা বিবেচনা কর। মেয়েটি ধর্মে কৃশ্চান, তবে জাতে কায়স্থই।

আমিই তো একা সবকিছু করবার মালিক নই। তোমার দাদারা আছেন, বৌদি আছেন আরো দুজন,—আমি সকলের মধ্যে একজন।

কিন্তু আমি বোধ হয়, একেবারেই একা।

ভাববাচ্যে, প্রাথমিক কথা শেষ করলাম। দাদারা কি বলবেন তাই ভাবছিলাম। মেজবৌদি, একটু খোলামেলা লোক। তাঁর

কথা থেকে বুঝলাম। খবরটা মানিকদা মারফত এঁরা জেনেছেন। আবার জামতাড়া যাওয়ার ফলে, সেটা কারও অজানা নেই। তবু আমি নিজে থেকে কিছু না বলা পর্যন্ত, এঁরা যেন কিছু জানেন না, এই ভাবই বজায় রাখছিলেন।

মেজবৌদি বললেন, তোমার ছোড়দা তো রেগেই অস্থির, এ বিয়েতে তিনি কোন যোগ রাখবেন না। এ খুব অন্যায় করছে বাবু।

—মেজদার কি মতবাদ···

—তিনি হ্যাঁ, না কিছুই বললেন না। বড়দা বললেন—এ দোষ বাবুর মোটেই নয়—দোষ যদি হয়ে থাকে, তা আমাদের। তা কবে হচ্ছে বিয়ে? মেয়েটি নিশ্চয়ই সুন্দরী? খুব ফরসা, বড়দির মত রং হবে? বাবা, তুমি ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিলে···

ছোটবৌদি, হ্যাঁ না—কিছুই বললেন না।

মাণিকদার কাছে গেলাম, আগেও বলেছি তাঁকে। প্রথমে মাণিকদা একটু অখুসী হয়েছিলেন আমার ওপরে, পরে বললেন—

এক রকম ভালই হল রে—এ না হলে তোর বিয়েই হত না। বৌদি বললেন—সত্যি বলছি, সুবীর সব ভাল, কেবল যখন কৃশ্চান মনে হচ্ছে তখনি যেন কেমন লাগছে।

কিন্তু চলা-ফেরা আচার আচরণে, আমি তো কোন তফাৎ দেখলাম না।

না, এরা সব সাধারণ বাঙ্গালীর মত···হয়তো খোঁজ নিয়ে দেখবে রবিবারে চার্চে যায়ও না। তাছাড়া, কৃশ্চান বিয়ে করছো বলে যে, অনাগ্রহ দেখতে পাচ্ছ বাড়ীতে, বিলেত গিয়ে যদি মেম্ আনতে বিয়ে করে—তাহলে দেখতে মেম্ সাহেবকে ভ্রাতৃবধূ বলতে সবাই গদ গদ হয়ে উঠতো। বলেন মাণিকদা।

—সব বুঝি মাণিকদা, তবু যেন মনটা একটু খারাপ লাগছে, ভয় ভয়ও করছে। এটা অবশ্য মাণিকদাকে খুসী করতেই বললাম। কেউ

সাহস হারালে মাণিকদা তাকে সাহস দিতে খুবই উৎসাহী।

মাণিকদা বললেন, ভয়টা কিসের। তাছাড়া, এই তো সেদিন চিত্রা ও সুশীল এসেছিল। ওরা বলছিল, নাটকের ভূমিকাতেও আমরা ছিলাম, শেষ অঙ্কেও আমরাই সানাই বাজাবো।

ছোট একটি ছেলে সাত থেকে আট বছর বয়স। তার চোখের সামনে একটা ছবি, একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতেই, তাকে ওভার সিয়ার বাবুর বাড়ীর লোকেরা তাদের বাড়ীতে নিয়ে এল। এত পুলিশ কেন—ওই যে মা, চুপ করে মাটির ওপরে বসে—কেমন যেন —না না আমি যাব না—বাবার কাছে যাব—জানলার সামনে এত লোক কেন—আর কিছুই মনে করতে পারছে না, ছেলেটি। তার পরে, তারা চলে এল জোড়হাট। মা—মামা—বাবা তো, নেই—বাবা, মারা গিয়েছেন? তারপর জোড়হাটেই পড়াশোনা। মামার কাছে। মামা, ডাক্তার। মামা বিয়ে করেন নি। কিছুদিন পরই স্কুল থেকে ফিরে মাকে দেখতে পেল না ছেলেটি। মামার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি, মা কোথায়। শুধু তার মনে এল, মামার বন্ধু মিষ্টার পালের কথা। পরে জেনেছিল, অন্যভাবে। তার মা, আবার বিয়ে করেছেন। কিন্তু মামাকে কোনদিনই জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। সতেরো বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করে যখন মামার সামনে এল, মামা বললেন—গৌহাটিতে পড়তে যেতে হবে। তোমার বাবার ইচ্ছা ছিল, তুমি ডাক্তার হও।

বাবা! সতেরো বছরের ছেলেটির মুখ দিয়ে, এত কালের অনুচ্চারিত কথাটা বার হল, বাবা! হতভাগ্য ছেলেটি, মা, বাবা কোনটাই উচ্চারণ করতে পায়নি এ-ই বয়স পর্যন্ত।

মামার গভীর ভালবাসা পেয়েছে, পেয়েছে পাঠ্যজীবনের সবকিছু। কিন্তু কোনদিন শুনতে পায়নি মায়ের কথা, কি বাবার কথা।

—হ্যাঁ তোমার বাবা আমার সহপাঠি ছিল ইস্কুলে। সে যদি

আজ বেঁচে থাকতো, তাহলে তুমি জানতে পারতে কত বড় মহৎ উদার চরিত্রের মানুষ ছিল সে।···মনীশ, তোমাকে তার মতই হতে হবে।

চকিতে···সেই পুলিশ···সেই দরজা বন্ধ···লোকজন · ছবিটা যেন ভেসে উঠলো···কিন্তু বাবা···কিছুতেই মনে করতে পারল না। হঠাৎ জোর করে জিজ্ঞাসা করে—আমার বাবা কি ডাক্তার ছিলেন ?

—না, রেলওয়েতে চাকরী করতো সে। ডাক্তার হওয়া তার কাছে স্বপ্ন ছিল। তাই তার ইচ্ছা ছিল তুমি ডাক্তার হও। তোমার মা, তোমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা করে আমাকে জানিয়েছে···তুমি কি করতে চাও ?

—আপনি যা বলবেন।

—তবে থাক, আমি চাই, তুমি পড়া শেষ করে নাও। যদি তোমার বাবার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পার, তবেই মার সঙ্গে দেখা করো। নিজের মৃত্যু নিজের হাতে ঘটাবার আগে এই আশা তার ছিল।

মামা আরও কিছু বলবেন আশা করে মনীশ অপেক্ষা করছিল।

মামা বললেন, মনীশ, সময় হলে সব কিছুই তোমাকে বলবো। এখন প্রাণ মন যত্ন নিয়ে তোমার পড়া শেষ কর।

গৌহাটি থেকে আই, এস-সি, পাশ করে, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম, বি, বি এস, পাশ করে বার হল মনীশ সরকার।

যেদিন পাশের খবর জেনে, মামার সামনে দাঁড়ালো, সেদিন আর একটি বিষয় জানবার প্রবল বাসনা মনীশের সমস্ত মন ব্যাপ্ত করেছিল। স্বল্পবাক, গম্ভীর প্রকৃতি মামার কাছে অস্থিরতা প্রকাশ করবার সাহস ও শিক্ষা সে কোনদিন পায়নি। সমস্ত বিষয়ে অত্যন্ত সংযত থাকবে হবে, এইটাই মামার মূল নীতি।···তবু নিজেকে স্থির রাখতে পারেনি মনীশ···সামান্য দু-এক মিনিট অপেক্ষা করে···প্রশ্ন করেছিল —এবার আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারি কি ?

—তা, আর কোনদিনই সম্ভব নয়, তোমার দুর্ভাগিনী মা আর এ

জগতে নেই। সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছে সে।

চুপ করে শুনে স্থিরভাবে মনীশ বলে—কবে এটা ঘটেছে?

—ঠিক এক বছর আগে।

এই প্রথম মামার প্রতি একটা দারুণ অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে মনীশ দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

এই ফিরে আসার পরে পুরো জানুয়ারী মাসটার মধ্যে আর যাওয়ার সুবিধা হয়নি। ফেবরুয়ারী মাসটার মধ্যে আর যাওয়ার সুবিধা হয়নি। ফেবরুয়ারী মাসের একটা দিনে, "এনগেজ্‌মেণ্ট ডে" ঠিক ছিল। এটা ওঁদের প্রথা। ঠিক দিন তারিখে আসতে হবো। একদিন আগেই এলাম। এই প্রথম আমার নিজের লোকেদের মতামত জানালাম—তাঁরা কেউ এই বিয়েতে যোগদান করবেন না। সুরবালা দেবী যেন ব্যাপারটা অনুমান করেছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যা, লতা হঠাৎ এসে বলে, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো—

একটু অবাক হলেও বলি—বলুন···

—নিজের আত্মীয়স্বজন দাদা বৌদি,···সমাজ, ধর্ম, সবকিছু তুচ্ছ করে যাকে গ্রহণ করছেন—তাকে চিরকাল আদরে সম্মানে রাখতে পারবেন তো? এখনও ভাববার সময় আছে সুবীর বাবু।

—পারবো বলেই তো, বিশ্বাস। যদি কোন দিন এ বিশ্বাসে অপরাধী হই, তবে নিজেকেই অমানুষ মনে করবো। স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে যাকে গ্রহণ করবো, তার মর্যাদা না থাকা নিজেরি চরম অপমান।

—কিন্তু অপরাধ বোধ করা, আর ভালবাসা দিয়ে পূর্ণ করে রাখা এক নয়, সেটা যেন একেবারে ফুলের মত, সামান্য অযত্নেই যে বিনষ্ট হয়ে যায়। অনেকে বলেন, প্রেম হচ্ছেন দেবতা, কিন্তু আমার মনে হয়, না-না, দেবতা নয়, একটি ফুলের মত, একে সজীব রাখতে হয়। সেইজন্য আপনাকে খুব কঠিনভাবেই নিজের শক্তির বিচার করতে হবে।

লতার কথায়, মনে মনে বিচার করবার চেয়ে, একটু আহত হয়েছিলাম। রাগও হয়েছিল, লেখার ওপরে। এ প্রশ্ন কার? লেখার নিজের, না, লতার?—বলি, আপনি কিছু মনে না করলে, আলোচনাটা লেখার সঙ্গেই করবো।

—কিন্তু এ প্রশ্ন তো লেখার নয়। লেখা তো কিছুই জানতে চায় না ··সে তো ঝর্ণার মত শঙ্কাহীন মন নিয়েই চলেছে, মহাসাগরের দিকে। সুবীরবাবু, তাকে আপনি ভুল বুঝবেন না···।

লতা চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। লেখা ও সুরবালা দেবী ঘর-সংসারের কাজে ব্যস্ত। কালকে সামান্য কিছু লোকজন আসবেন, ওদের এখানকার।···এ ছাড়া এখানে এসে যতটুকু দেখেছি, লেখাকে ঘরকন্নার কাজে থাকতে দেখেছি।

এই সঙ্গে যেন কিসের ছুটি পড়েছিল, মনে হয় সরস্বতী পূজার। পরের দিন, এনগেজমেণ্ট পাকা হয়ে গেল, পরস্পরকে আংটী দিয়ে। তারপরের দিনটাও থেকে যেতে হল। শশীবাবু বেশী অনুরোধ করতেন, আর ওঁর ছেলের মৃত্যুর কথা মনে করে, আমার কেমন দুর্বলতা হত, তাই এড়াতে পারতাম না। তারও পরের দিনটা ছিল রবিবার, তাই থাকতে হলো। দুপুরে খাওয়ার পরে ঘুম এল না। শীতের শেষ। নিস্তব্ধ দুপুর, রোদের আলো ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। উঠে বারান্দায় এলাম। নির্জনতার একটা মাদকতা আছে। অলস পায়ে নেমে এলাম উঠানে। সামনে দিকের চেয়ে, পেছনেই জায়গা অনেক বেশী। চারদিকেই বাগান গাছপালা, ঠিক খাবার ঘরের সামনে···মরশুমী আর গাঁদা ফুলের সম্ভার। সেটা পেছনে ফেলে, এগিয়ে গেলাম।···এক সারি ফুলের গাছ—তা যেন, বড় হয়ে খানিকটা পাঁচীলের কাজ করছে। করবী, জবা, টগর, ইত্যাদির পরে পাতাবাহারের সারি। সেটা পার হয়ে, কাঁকর বিছানো পথ চলেছে, মাঝখানের দু'পাশে বাঁকা ইঁটের ঘেরা দিয়ে বেশ কিছু বেলা যুঁই মল্লিকার গাছ। এখন তাদের পাতা ডাল ছেঁটে দেওয়া হয়েছে।

···এতদিন এসেছি, এদিকের বাগানটা কোনদিনই দেখিনি।—মনে হল, বেশ তো···মাঝে মাঝে, ঝোপ হয়ে ওঠা লাল বোগনভিলা। আর ঝিরঝিরে পাতাভরা তরুলতা কোন বুনো গাছ, বা বাঁশের খুটি জড়িয়ে উঠেছে।···দূরে পাঁচিলের কোলের দিকে একদিকে কিছু আম, জাম ইত্যাদি গাছ, অন্যদিকে বকুল, বক কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি। মনে হলো কোন এক সময়ে খুব যত্ন করেই গড়ে তোলা হয়েছিল বাগানটি।··· অল্প খানিকটা এগিয়ে যেতেই মনে হল যেন বুনো লতায় ঘেরা একটা কুঁড়ে ঘর। নানা রকমের লতানো গাছ, একেবারে ঢেকে ফেলেছে। বেরিয়ে থাকা বাঁশগুলো পর্যন্ত ঝুলন্ত লতায় আবৃত। এদিকটা ছিল পেছন দিক। পেছন থেকে মনে হচ্ছিল, যেন লতাপাতা ফুলে সাজানো, একটা হাওদা মাটিতে নামিয়ে রাখা হয়েছে। একটু কৌতূহল হল। হয়তো কোন ফুল, যা রোদের তেজ সহ্য করতে পারে না, বা পাখীর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য চারা গাছ ওখানে রাখা হয়।

সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। পাতায় ঘেরা এই কুঞ্জটির ভেতরে একটু উঁচু বাঁশে মাচা পাতা। তার ওপরে ডোরা কাটা কম্বল গায়ে, সমস্ত দেহখানি ঢাকা, লতা ঘুমুচ্ছে। উত্তর পশ্চিমের রোদে এর ভেতরটা ভরা···সামনের দিকে মুখ করেই সে শুয়ে ছিল। জায়গাটা বাগানের ঠিক মাঝামাঝি।···ঘুমন্ত লতার দিকে দেখে আমার মনে হল, সেই ছোট বেলার গল্পে শোনা ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যার কথা। আর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত মনে হল না। এগিয়ে না গিয়ে আবার পিছন ফিরে চলে আসতে আসতে ভাবলাম, আর কয়েক দিন পরেই আমি এদের আপনজন হয়ে যাব। পর-ক্ষণেই মনে হয়, আপনজন হব লেখার, লতার তো কেউ হব না আমি। ফিরে যখন এলাম, তখনও বাড়ীতে বিকেলের সাড়া জাগেনি। চুপচাপ চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে আবার লতার কথাই মনে হল। মায়াবিনীর মত মায়া জাগিয়ে তোলা একখানি মুখ।···

যেন এ বাড়ীর কেউ নয়, এমন কি এ বাড়ীর মেয়ে এই লতারও কেউ নয়,···অন্য এক রূপকথার রাজ্যের রাজকুমারী।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বিকেলের কাজের সাড়া নিয়ে সকলে উঠে গেল। শশীবাবু উঠে এসে, আমার পাশের চেয়ারে বসলেন।

—এবার শীতটা মনে হয়···বেশীদিন থাকবে। এই সময়ে এক পশলা বৃষ্টি হলে ভাল হত···

—এখানে কতদিন শীত থাকে সাধারণত···

—তা মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটু ঠাণ্ডা আবহাওয়া থাকে। মানে বাংলা ধর ফাল্গুন শেষ।

এই সব কথাবার্তার মধ্যেই, সুরবালা দেবী চায়ের আহ্বান জানালেন। এঁদের এখানে চা-জলখাবার ও খাওয়ার জায়গায় খাওয়াই নিয়ম—ভেতরেই বারান্দায় যেতেই দেখলাম, উঠানে যেখানে ফুল বাগান, একটা ফুলে ভরা হলুদ গাঁদার প্রায় গায়ে গা ছুঁইয়ে দাঁড়িয়ে আছে লতা। আমি একটু থামলাম।

শশীবাবু খাবার ঘরে চলে গেলেন।

লতিকা দেবী, আসুন। চা হয়ে গিয়েছে···

আমার ডাকে মুখ ফিরালো লতা, কিন্তু আসবার কোনও লক্ষণ দেখলাম না। আমি হাত নাড়িয়ে ইশারাতে বার দুই ডেকে, চায়ের উদ্দেশ্যে চলে গেলাম।

চা, চিঁড়ে ভাজা, ছোট ছোট আলুর ঘি গোল মরিচ ইত্যাদি পরিপাটি চা···বাড়ীর সকলেই বসেছে, আসেনি কেবল লতা। আমি দেখলাম, সে আসেনি বলে, কেউ খুব ব্যস্ত নয়। বাড়ীর পুরানো চাকর মতিলাল পর্যন্ত এক গেলাস চা নিয়ে, দরজার এক পাশে বসেছে। শশীবাবু তার সঙ্গে আগামী কালের হাটে যে তরকারী যাবে, তার দাম দর ঠিক করছিলেন। চা খাওয়ার শেষে যখন উঠে এলাম, দেখলাম লতা সেখানে নেই।

এখানে এসে আমার সবচেয়ে খারাপ লাগতো, সন্ধ্যাবেলাটা

সূর্যাস্ত যেতে না যেতেই রাত হয়ে গেল। নির্জন জায়গাটা একে বারেই নীরব, মাঝে মাঝে মোরগ ডাকটাক-টাও তখন বন্ধ। সুরবালা দেবী সন্ধ্যা বেলার অনেকক্ষণ সময় উপাসনায় কাটান। লতা কিছু পড়াশোনা করে। শশীবাবু তাঁর ক্ষেত খামারের হিসাবপত্র দেখেন। মাঠ বাগানে ঘুরে সব দেখে সারাদিন বেশ পরিশ্রম হয় তাঁর।

এই সময়টায় লেখা আমার সঙ্গে গল্পসল্প করে কিছু। আমার বাড়ীর লোকজনের কথাই বেশী হয়। এই বিয়েতে দাদা বৌদিরা কেউ যোগ দেবেন না, এটা লেখার ভাল লাগেনি। নিজেকেই যেন দোষী মনে করছিল। তাই আজ সে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমার কাছে আসেনি···কিন্তু অসময়ে এল লতা।

—একা একা খুব খারাপ লাগছে তো—আসুন, একটু লুডো খেলা যাক।

মাঝে মাঝে লুডো খেলতাম আমরা।

—লেখা—এই লেখা, বলে হৈ হৈ করে ডাক দিয়ে, চৌকির ওপরে লুডোর ছক পেতে বসলো লতা। একটু পরেই লেখা এল। খানিকটা খেলার পরেই, লতা বলল—আজ বড় ভাল লাগছে, আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে···

আমি বললাম, তবে খেলা থাক; গানই শোনা যাক। এমন সুখবর এত দিন গোপন রেখেছিলেন কেন?

লেখা বলল, এখন পিয়ানো খুলবি···কতদিন খোলা হয়নি, ঠিক আছে কিনা।

মাঝের ঘরে একটা বড় পিয়ানো ঢাকা দেওয়া অবস্থায় দেখেছি।···

লতা বলল—না থাক, গলাও ঠিক নেই।

আমি ভাবলাম, গান আর গাইবে না, আজ ··

ঠিক এই সময়ে, হাতে ছোট তাল দিয়ে, লতা গাইতে আরম্ভ করলো—

—মধুর তব শেষ যে-না-পাই।

একটি ক্রিশ্চান মেয়ের কাছে পরমপিতার উদ্দেশ্যে রচিত কোন প্রার্থনা গান শুনবো আশা করে এমন একটি প্রাণঢালা রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনবো আশা করিনি। সব কিছুতেই আমাকে আশ্চর্য করে দিচ্ছিল লতা।

গান শেষ হলে, এত মুগ্ধ হয়েছিলাম যে 'চমৎকার' কথাটাও বলতে পারিনি। গানের রেশে, সন্ধ্যাটা যেন থম্‌থমে হয়ে গিয়েছিল।

গান শেষ কয়ে লতা উঠে দাঁড়াতেই লেখাও উঠে পড়লো। কোন কথা না বলেই, তিনজনের সভা ভঙ্গ হল।

কিছুক্ষণ পরেই খাবার ডাক পড়লো। ছোট টেবিল, চারজনের মাপে তৈরী। আমি থাকলেই, একটা ছোটমত টুল নিয়ে, লেখা বসতো লতার পাশে। আমি আর লতা হয়ে যেতাম মুখোমুখি। সে দিনও সকলের চাহিদা মিটিয়ে সুরবালা দেবী লতাকে বললেন আর কি চাই।

লতা বলল—দাঁড়াও যা আছে তাই শেষ করি।

লেখা ওর থালায় উঁকি দিয়ে বলল, এখনও দু'খানা রুটি শেষ করতে পারনি।

আমি দেখলাম, ওর বাটিতে তরকারি প্রায় ভরাই আছে।

প্রত্যেক দিন দেখেছি শশীবাবুর আবার তরকারি লাগে। লতা, প্রায়ই রুটী নেয়, আমাকে সব কিছু বেশীই দেওয়া হয়,—তা সত্ত্বেও অনুরোধে আবার নিই। এই সময়ে, শশীবাবু তাঁর বাগানের কপি, বেগুন, বিট শালগম, কত ভাল হয়, কেন এত ভাল হয় বলবার সুযোগ পান।...

লতাকে আজ খুব কম খেতে দেখে সুরবালা দেবী জিজ্ঞাসা করেন, শরীর ভাল আছে তো?

লতা বলে, কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে, না-না অসুখ করেনি।

আমি বললাম—আপনি এত কম খান কেন?

শশীবাবু বলেন—ও-চিরদিনই এই রকম।

সুরবালা দেবী আবার বলেন, তরকারি ভাল লাগছে না, দুধ বা জেলী দিয়ে খাবি। একটা কাঁচের শিশি হাতে নিলেন।

—জেলী, দেখি গন্ধটা—

লেখা বলে—গন্ধ শুঁকবি, তাহলেই তুই খেয়েছিস। আমাকে একটু দিন বড়মা। জেলী নিয়ে, আঙ্গুলে চেটে চেটে খেতে থাকলো লেখা।

যাই হোক, সকলের খাওয়া শেষ হলে, উঠবার পরে লেখা আবার লতাকে বলল—ও খুকুমণি, কাল তুমি দুধ খেতে ভুলে গিয়েছিলে, আজ খেয়ো মনে করে।

লতা তার খাবারের কিছুটা অংশ নষ্ট করে উঠে পড়লো।

সে রাত্রে শোয়ার পরে যতক্ষণ জেগে ছিলাম, লেখার চেয়ে লতার কথাই মনে এল।···একটি অস্বাভাবিক মেয়ে ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারিনি। বহু সময়ে বুদ্ধিহীন বালিকার মতন, আবার কত সময়ে, বেশ বিজ্ঞজনোচিত ভাব, কথাবার্তা। কোন কিছুতেই ঠিক মত নয় যেন সে। মনে মনে, ভগবানকে স্মরণ করলাম,···এই বাড়ীতে দুটি মেয়ে থাকতে আমার মন সরল স্বাভাবিকটিকেই বেছে নিতে পেয়েছিল প্রথমেই। নিষ্প্রাণ, ভাবলেশহীন মনে হয়েছিল লতাকে। এখন যত দেখছি, ততই বিচিত্র মনে হয়েছে। একটু করুণাও হয়েছে—কেন এমন হল মেয়েটি!

শেষ পর্যন্ত নিজেরা কত উদার, কিংবা, ছোট ভায়ের প্রতি স্নেহ দেখাবার জন্যে, দাদারা বিয়েতে যোগ দিলেন। বড়দা তাঁর নামে, নিমন্ত্রণ পত্র ছাপানো থেকে, মেজদাকে সঙ্গী করে বরযাত্রী পর্যন্ত এসে বিবাহ দিয়ে, প্রাথমিকভাবে, লেখাকে নিয়ে গেলেন। আমার কিছু বন্ধুবান্ধব নিয়ে একটা বৌভাত উৎসব পর্যন্ত হল। আমি পটারী রোডে এণ্টালীতে একটা ছোট ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম। ঠিক করলাম ছ'দিন বাদে লেখাকে জামতাড়াতে রেখে

যাবো, বাড়ীটাতে বাসের ব্যবস্থা করে, ওকে নিয়ে আসবো।

লেখাও তাতে খুব খুসী হল, একবার বাসা বেঁধে ফেললে, আর চট করে যাওয়া হবে না।

লেখাকে রেখে আসবার সময় লতার প্রতি, শ্যালিকাসুলভ ব্যবহার করবার জন্যেই বলি—আমি খুব স্বার্থপর, আপনাকে একা রেখে, আর একটিকে নিয়ে যাচ্ছি।

—তা কেন, হয়তো একদিক দিকে উপকার করলেন।

—ঠিক বুঝলাম না।

—লেখা চলে গেলে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি হষ্টেলে যেতে পারবো, বি, এ, টা পড়তে পারবো ··

প্রশ্ন না করেও-ভাবলাম, লেখাই কি প্রতিবন্ধক ?

লতাই বলে চলল—আমার বাবার একান্ত ইচ্ছা ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হবে। বাবা নিজে বেশী লেখাপড়া লেখেন নি, সেই যুগের হলেও, আমার ঠাকুরমা, বাবার মা ছিলেন, বি, এ, পাশ মহিলা। দাদা যখন ফার্ষ্ট এম বি, বি এস,-এ প্রথম হল, বাবার সে কি আনন্দ! কেঁদেই ফেললেন। আমার মা, ঠাকুমার ছবিতে নিজে ফুল দিয়ে সাজালেন, প্রার্থনা দেওয়া হল, একটা উৎসব হল বাড়ীতে। তারপরে, যে দিন সেই সর্বনাশা খবর এল, সেদিন বাবার চোখে এক ফোঁটা জল ছিল না। একটু চুপ করে থেকে, আবার বলে, আগে থাকতে কত কি আশা করে আমার বাবা ভেবেছিলেন, লেখা হবে তাঁর পুত্রবধূ। লেখার ওপরে তাঁর অগাধ ভালবাসা ছিল। দাদা লেখাকে কোনদিন সে ভাবে দেখেনি, আমরা দু'টি বোন হিসাবেই ছোটবেলা থেকে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি। দাদা লিখেছিল, "সে যাকে ভালবেসে ছিল, সে অন্যকে বিয়ে করেছে, এটা তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হল না।" লেখাও আমারি মত, দাদার মৃত্যু শোক পেয়েছিল। এর পর থেকে বাবার একটা চাপা তিরস্কার যেন প্রখর হয়ে উঠলো লেখার ওপর ; যেন, পারলে না ছেলেটাকে ঘরে ধরে রাখতে, আপন করে নিতে।

তিনি তখন পুত্রশোকে পাগল। তাঁকে বোঝান ও শান্ত করতে যাওয়া ভুল। এ শোক একমাত্র সময়ই সহ্য করতে পারে। বড়মা আমার পড়া বন্ধ করে দিলেন। আমাকে কাছে পেতে পেতে, ও সময়ে বাবা কিছুটা শান্ত হয়ে এলেন। দাদার পড়া আমার পড়াতে বাবার সামান্য পুঁজী প্রায় শেষ। জমি ও বাগান নিয়ে বাবা যা পরিশ্রম করেন, তাতে খাওয়া পরা চলে যায় ভাল ভাবে। এমন দিন আসবে যখন বাবা আর পরিশ্রম করতে পারবে না—তখন, সে সব ভার আমাকেই নিতে হবে। তাই বি, এ, পাশ অন্তত করতেই হবে। ছোট বেলায়, আমার ঠাকুমার নাম সুকুমারি রায় দেখে, আমি লিখতাম লতিকা রায় বি, এ,। বাবা হেসে বলতেন, ওটা এম, এ, করে দে। বাবা ভাবতেন, দাদা হবে এম, ডি, আমাদের কৃশ্চান সমাজের এক রত্ন।—এম, এ, ডিগ্রির প্রতি বাবার অপরিসীম শ্রদ্ধা আছে। বড়মা বলেন, আপনাকে মধ্যে বাবা দাদাকে পেয়েছেন, —হয়তো তাই, আপনার শিক্ষা, ডিগ্রীও তাতে অনেকখানি সাহায্য করেছে।

লতার এ সব কথা শোনবার পরে মনে করা যায় না সে অপরিণত মনের মেয়ে। তবু কি ভেবে যেন বললাম, দেখুন, আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখতে চাই, বুঝতে পারছি, আপনি নিজেই এই সংসারের অনেকখানি দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন—তবু আমাকে মনে রাখবেন,—প্রয়োজন হলে, আমি আপনার বন্ধু, আপনার পাশে এসে দাঁড়াবো।

লতা প্রথমটায় কোন জবাব দিল না। মনে মনে আমার বলা কথার তাৎপর্য বুঝতেই চেষ্টা করলো। তারপর কেমন অসংলগ্নভাবে বলল—তেমন দিন না আসাই ভাল, আমি অনেক দূরেই থাকতে চাই—

আমি ব্যাপারটাকে হালকা করবার জন্যেই বলি—না-না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়,—আমি কিছু বিপদের দিনের কথা মনে

কারো এ কথা বলিনি। বন্ধুজন তো, শুধু বিপদেই দরকার হয় না, সুখের দিনেও দরকার হয়—হয়তো শুভ বিবাহে--

এক অস্বাভাবিক উত্তেজিত গলায় বাধা পেলাম—

—সুধীরবাবু, চুপ, চুপ করুন। যার সম্ভাবনা নেই— যা কোন দিন হবার নয়—সে বিষয়ে কোন কথা না বলাই ভাল। লতা অশান্তভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে নিজেকে সংযত করলো।—লেখা পাশে পড়ায়, সে লতার কাছে গিয়ে, তাকে শান্ত হতে সাহায্য করলো।

আমি একটু বিরক্ত, একটু লজ্জিতভাবে, বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে দিনই, রাতের গাড়ীতে আমি রওনা হয়ে এলাম।

নিজের ঘরে চলে এসেছিল মনীশ। নিজের ঘরে? কোন কিছু নিজের বলে আছে তার? মাতৃহীন, পিতৃহীন, মামার আশ্রিত। কিন্তু এ কথা তো, কোন দিন মনে হয়নি তার। আজ এই প্রচণ্ড দুঃখের বোধ কেন তবে, কেন মামার প্রতি অবরুদ্ধ অভিমান, কেন, তাঁর এত কালের স্নেহকে করুণা মনে করে, অসহ্য ব্যথায় ভেঙ্গে পড়ছে কেন? মার সঙ্গে এ জীবনে দেখা হল না বলে, তাঁর মৃত্যুর সময়েও কি একটা খবর দেওয়া যেত না—এত অকরুণ কেন হলেন তিনি মনীশের প্রতি?—মা—কেমন দেখতে ছিলেন তিনি? কেমন মানুষ ছিলেন তিনি।—মনে করবার শেষ পর্যন্ত গিয়েও একটা আবছা ছায়া···ছোট বাড়ী, বন্ধ দরজা, আর পুলিশ এ ছাড়া আর কিছুই পেল না মনীশ। বাবা নিজের হাতেই নিজের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন, তার জন্য মা দায়ী—তবু, সেই মহিলাটিকে দেখবার দুরন্ত বাসনা—আর কোন দিন সফল হবে না, আর সেটা হল না মামার জন্যে। যথেষ্ট করুণা করেছেন মামা, কিন্তু আর নয়. তাঁর কাছে আর কিছু চায় না মনীশ।

ডাঃ পরমেশ বিশ্বাস। কেমন লোক তিনি? গরীব লোকেরা বলে, পরমেশ্বর। তিরিশ বছরেরও বেশী এখানে প্রাকটিশ করছেন। প্রথমে এসেছিলেন, বড়ুয়া এষ্টেটের ডাক্তার হয়ে। কয়েক বছর পরেই সে চাকরী ছেড়ে দেন। সহরের বাইরে, এখানে ছোট বাড়ীটা করেন, সেই থেকে এখানেই ডাক্তারী করছেন। বাজারের কাছে তাঁর ডিসপেনসারী আছে। সুবোধ হালদার, সেখানকার ম্যানেজার। একদল লোক বলে, ভাল টাকা পয়সা করেছেন বিশ্বাস ডাক্তার। এক দল বলে, সব কিছুই তাঁর দান করতে শেষ হয়ে যায়। এক শ্রেণীর মেয়েদের প্রতি তাঁর বড় দয়া। মেয়েদের প্রতি কি দুর্বলতা আছে ডাক্তারের? কিন্তু তাঁর বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে কোন স্ত্রীলোক নেই। আত্মীয় বলে কোন স্ত্রীলোককে কেউ কোন দিন দেখেনি। ভাগ্নে মনীশকে রেখে, তাঁর বোন মারা গিয়েছে, তাও বহুদিন হলো। দুটি চাকর, সেবুল আর লুটান, ভাগ্নে মনীশ—এই তো ডাক্তারের সংসার। ডাক্তার কৃশ্চান, কিন্তু কোনদিন তাঁকে চার্চে যেতে দেখেনি কেউ। অতি পুরোনো, এক বেবী অসটিন নিয়ে, সারা সহর সহরতলী ঘুরে বেড়ান পরমেশ বিশ্বাস। শক্ত মজবুত দেহ। অল্প কথা, আর গভীর বিশ্বাসে ভরা—এই বিশ্বাস ডাক্তার। একমাত্র রবিবার ছাড়া প্রত্যেকদিন বেলা আটটায় আসতেন, ডিসপেনসারীর চেম্বারে। সেখানে রোগী দেখা হত। সেদিন বিকেলে, মামার সঙ্গে কথা বলার পরে, আর দেখা হয়নি মনীশের। রাত্রে চেষ্টা করলে হত, কারণ রাত একটা পর্যন্ত মামা জেগে থাকেন। ডাক্তারী ম্যাগাজিন পড়েন—আরও কিছু লেখা-পড়া কাজ—মনীশ জানে, কিন্তু তারও সেরকম মানসিক অবস্থা ছিল না।

ঘরে থেকেই শুনতে পেল, সেই ছোটবেলাকার মত, একই নিয়মে মামা, জিজ্ঞাসা করলেন—সেবুল, মণি খেয়েছে? ভাল করে খেয়েছে তো—

অতি পুরানো চাকর সেবুল—জী সাব—বাত—উন্‌কো মতলব

আজ ঠিক নেই—মালুম হ্যায়—

কেন ? খায়নি ভাল করে···

হে জি, বহুত থোড়া···

আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি যাও।

মামার সংসারের সব কিছুর ভার নিয়ে, আছে এই সেবুল সিং নেপালী···কৃশ্চান। খুব ধর্মবিশ্বাসী। প্রতি রবিবারে চার্চে যাবে। অবসর সময়ে বাইবেল পড়বে। কালিংপমের কাছে কোথায় দেশ।

নিজের ভবিষ্যত ঠিক করে ফেলে মনীশ। এখন সবচেয়ে ভাল চাকরী নেওয়া। হাউস সার্জনসিপ থাকবার মধ্যেই সেটা ঠিক করতে হবে। সহপাঠিদের মধ্যে সকলেই জানতো,···তার কোন ভাবনা নেই। মামার প্রাকটিশ থেকেই দাঁড়িয়ে যাবে মনীশ।

সকাল বেলার চা খাওয়াটা বরাবর এক সঙ্গেই হয়, নেহাত মামার সে সময়ে কল না থাকলে। মনীশ ভেবেছিল, মামা হয়তো কিছু জিজ্ঞাসা করবেন, অন্তত কালকের কম খাওয়া নিয়ে···একটু সঙ্কোচ ছিল, এই জন্যে···কি জবাব দেবে।

—কিন্তু না,···ওদিক দিয়ে, কিছুই বললেন না মামা।

—তোমাকে কবে কলকাতা যেতে হবে ?

—একটু আগে যেতে পারলেই ভাল হয়।

—তাহলে, তোমার সুবিধামত রওনা হয়ে যেও।

মামা উঠে গেলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে মনীশের মনে হল, মামা নিষ্ঠুর, খুবই হৃদয়হীন। যত শীঘ্র পারে এখান থেকে চলে যাবার জন্য সে মনস্থির করে ফেললো।

তিন দিন পরে মনীশ কলকাতা রওনা হয়ে গেল। মনীশের মানসিক বিপর্যয়, পরমেশ বিশ্বাস বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর সমস্ত মন দিয়ে, তিনি মনীশকে বুঝতে পারতেন। মনীশ তার সহোদর বোনের সন্তান, জীবনের পরম বন্ধু সুধীশের সন্তান ; আর তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। সাত বছরের ছেলেটিকে নিয়ে কত স্বপ্ন

তো, তিনিও দেখেছেন। তিনি এ জীবনে স্ত্রী চান নি, সন্তান চাননি, সমাজ চাননি, কিন্তু মনীশ কি পারবে এই রূঢ় জীবন সহ্য করতে, এই মনীশকে না পেলে,…বোনের জীবনের চরম দুর্গতি, তাঁর মনকে কঠোর করে না দিলে, তিনিই হয়তো পারতেন না। মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে মানসিক কষ্ট পাওয়া, মনীশের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কোন উপায় ছিল না, যখন তিনি খবর পেয়েছেন, তখন তো সবই শেষ হয়ে গিয়েছে। ঘড়ি দেখে উঠে পড়লেন। কলে যেতে হবে। ফিরে অনেক কাজ আছে। চিঠি লিখতে হবে জামতাড়ায় শশী নাথকে। কেমন আছে সে? ছেলেটির মৃত্যুর পরিণাম…তাকে কোন অবস্থায় নিয়েছে কে জানে। তার মেয়েটিই বা, কেমন আছে? মেয়েটি! তার মানে বিবাহ, সন্তান আর বংশ…চিন্তাতেও সমস্ত মন ঘৃণায় ভরে ওঠে।…তবুও উপায় নেই। মৃত ব্যক্তির শেষ অনুরোধ। সুধীশের অনুরোধ।…

পরমেশ ডাক্তার কলে বার হয়ে গেলেন।

কলকাতায় ফিরে আসবার পরে মামার কাছ থেকে যথা নিয়মে সপ্তাহে একখানা চিঠি এসেছে। প্রথমে মনীশ মনে করেছিল, মামার চিঠির কোন উত্তর দেবে না। মামা নিজের মতে, যে নির্মম ব্যবহার তার সঙ্গে করেছেন, তার নীরব প্রতিবাদ জানানো উচিত তার। দু'এক সপ্তাহ পরে, তার কোন চিঠি না পেয়েও, মামা যখন ঠিক মত তাঁর চিঠি দিয়ে চললেন, তখন মনীশ, নিজেই লজ্জিত হল। তাঁর একটা কঠিন ব্যবহারের বিরুদ্ধে তার নিজের এই ব্যবহার খুবই অনুচিত হয়েছে। এখনও মামার টাকা নিতে হচ্ছে তাকে। মামা কি শুধু করুণা করে এই টাকা দিচ্ছেন? না, এভাবে নয়, তার প্রতিবাদ অন্য ভাবে জানাতে হবে। চারিদিকে চাকরীর চেষ্টা করছে সে। চাকরী নিয়ে সরে গেলে, মামার প্রতি ঠিক অকৃতজ্ঞ হওয়া হবে না। অনাথ ভাগ্নেকে মানুষ করে তিনি যেমন তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন, নিজের পথে চলবার যোগ্যতা অর্জন করে আর তাঁর বোঝা হয়ে থাকেনি

মনীশ এটা নিশ্চয়ই মামা অন্য ভাবে দেখবেন না।

কলেজে ছাত্র হিসেবে মনীশ ভাল হলেও, বন্ধু মহলে তার নাম ছিল না। ছোটবেলা থেকে, একা একা, বন্ধুহীনভাবে মানুষ। কোন স্ত্রীলোকের স্নেহ, ভালবাসা, বা কোনরকম ঘনিষ্ঠতা, ছোটবেলায় পায়নি, এর ফলে, মেয়েদের সম্বন্ধে সঙ্কোচ আর ভয় মিশিয়ে অতিশয়তার সৃষ্টি হয়েছিল তার মনে।

যেখানে ছেলেরা অবাধে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতো, মেয়েদের সম্বন্ধে নানান মতবাদ দিত। সেসব ব্যাপার থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতো মনীশ। একজন ডাক্তার ছাত্রের পক্ষে এমন জড় মনের পরিচয় সুখ্যাতি আনতে পারে না। এর ফলে কোন কোন মহলে নিছক ভাল, কোন কোন মহলে নিছক গবেট, এই ধারণা গড়ে উঠেছিল মনীশ সম্বন্ধে সহপাঠি মহলে এবং হষ্টেলে একসঙ্গে থাকা কোন ছেলের সঙ্গেই সখ্যতা হতে পারেনি। তাই মনের এই সংঘাতের সময়ে কোন বন্ধু বা বান্ধবী মনীশ পায়নি, যার কাছে মনের ভার লাঘব করতে পারবে, কিংবা কোন পরামর্শ নিতে পারতো। সাধারণ ভাবে সকলের সঙ্গে সদ্ভাব থাকলেও, প্রকৃত বন্ধু বলতে কেউ ছিল না তার। কেবল, মায়ের মৃত্যু সংবাদ, বা, তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়াটাই মামার প্রতি মন বিরূপ হওয়ার কারণ নয়। তার মা আবার বিয়ে করেছিলেন, বাবার মৃত্যুর কারণ মা, এটা ত তার জানিত।

তাই বলে মামা জীবনের শেষ সময়ে, ছেলের সঙ্গে মায়ের বা, মায়ের সঙ্গে ছেলের দেখা করতে দেবেন না, এতবড় বিচারক তিনি হলেন কি করে! মামার বিষয়ে ভাল মন্দ অনেক কথা মনীশ শুনেছে, বড় হয়ে যখন গৌহাটিতে পড়তে যায় তখন থেকে।

এক শ্রেণীর মহিলাদের জন্যে অনেক টাকা দান করে বিশ্বাস ডাক্তার। এমনকি বাইরেও, বিশ্বাস ডাক্তারের দানের ঘটা মনিঅর্ডারের মারফতে চলে। সুবোধ হালদার খুব চাপা লোক, আর বিশ্বাস ডাক্তারের অতি বিশ্বস্ত লোক, তার কাছ থেকে প্রকৃত সত্য বার করা

দুরূহ ব্যাপার। পাঁচজনের পাঁচ কথা, ভাল এবং মন্দতে মিশিয়ে
রচনা করতো বিশ্বাস ডাক্তার নিজেও কোনদিন তার প্রতিবাদ কর
নি। কোন নিন্দাবাদ তাঁর ডাক্তারীর সুখ্যাতিকে ম্লান করেনি
চরিত্রের অখ্যাতিকে গ্রাহ্যই করতেন না তিনি। তবু মনীশ আ
মামার সে দুর্নাম, আর দুর্বলতাকে এক করে কিছু পাওয়ার চে
করতে চাইলো। মানুষের প্রকৃতিই বুঝি তাই, একজনের বিরু
মন যখন অন্যমুখী হয়, তখন যে কোন যুক্তি দিয়ে অপরাধ
প্রমাণ করে, নিজেকে আড়াল করতে চায়।

সুনাম, দুর্নাম, দুই আছে ডাক্তার বিশ্বাসের নামে। কেব
দেহ-পশারিনীদের চিকিৎসা করতেন, বা এদের মধ্যে অতিদুঃস্থ
তাদের কিছু কিছু সাহায্য করতেন, এইটাই তাঁর দুর্নামের একম
কারণ নয়। অন্য অন্য স্থান থেকেও রকমারি অভিযোগ আসতো
একবার স্কুল টীচার অনীতা দাস বলে প্রায় তরুণীর সঙ্গে ডাঃ বিশ্বাসে
নাম জড়িয়ে বিশ্রী ব্যাপার হয়েছিল। মেয়েটির চাকরী ছে
দেওয়ার পরেও এই বিশ্বাস ডাক্তারের টাকাতে অনেকদিনই জো
হাটে ছিল। তারপর ডাক্তারের চেষ্টায় অন্যত্র যায়, নাকি ভালভা
চিকিৎসার জন্য। সেই সময়ে ডাক্তারকেও, মাঝে মাঝে জোড়হা
ছেড়ে কোথায় যেতে হত। অনেকদিন পর্যন্ত, অনীতা দাসের না
মনিঅর্ডারে টাকা গিয়েছে···সে খবরও অনেকে রাখতো। সামা
চাকরী করেন শ্রীধর মজুমদার, তাঁর অনেকগুলি মেয়ে। বাড়ী
ডাক্তার পরমেশ বিশ্বাস। মজুমদারের এক মেয়ের বিয়ের প্রায় স
ভারই নাকি পরমেশ বিশ্বাস নিয়েছিলেন। কৃশ্চান হয়েও চার্চে যা
না ডাক্তার···অথচ ডাক্তারের নিজের বাড়ীতে স্ত্রীলোকের প্রবে
নিষিদ্ধ। গরীবের প্রতি দয়ালু, চিকিৎসায় খ্যাতিমান, এই ডাক্তারে
নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হত। কিছুই যেন মানতেন
ডাক্তার নিজে।

মনীশ তাই ভাবতে পারলো স্কুল টীচার অনীতা দাসের কথ

ধনী ঘরের বধূ, রমলা বড়ুয়ার কথা কিংবা মধ্যবিত্ত ঘরের অনিন্দিতা মজুমদারের কথা। অখ্যাত পল্লীর ছায়াটাও বুঝি একবার ঘুরে গেল, রুগ্ন, বৃদ্ধা, ছাড়াও···অন্য অনেকে···যাদের কখনও কখনও বাজারে দোকানে দেখা যেত। এমন কি কৃশ্চান হয়ে চার্চে না যাওয়াটার একটা অন্য অর্থ হয়ে দাঁড়ালো মনীশের কাছে।

মনীশ যখন এইভাবে মামার সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা করে দিন কাটাচ্ছে, জোড়হাট থেকে আসবার পরে ন'মাস পার হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ একদিন সুবোধ হালদারের টেলিগ্রাম এল, মনীশের কাছে —ডাক্তার বিশ্বাস, খুবই অসুস্থ, এখুনি আসা দরকার।

মামা অসুস্থ! আজ পর্যন্ত যাঁকে অসুস্থ দেখেনি, এত দিন বাইরে ছাত্রজীবন কাটাবার মধ্যে, প্রতিটি চিঠিতেই আমি ভাল আছি লিখেছেন যে মানুষ, তিনি হঠাৎ অসুস্থ? দু'দিন আগেই তো চিঠি এসেছে তাঁর। যাই হোক, মনীশ রওনা হওয়ার জন্য তৈরী হল। যাদের সহসা অসুখ করে না, তারা অসুস্থ হলে···একটু ভাবনার থাকে। সুবোধ হালদার টেলিগ্রামে একবিন্দু আভাস পর্যন্ত দেয়নি কি অসুখ। কোন রকম স্ট্রোক?

মনীশ যখন এসে পৌছালো, পরমেশ বিশ্বাস তখন একটু সামলে উঠেছেন। হার্ট অ্যাটাক। তখনও কথা বলা বারণ, হালকা পানীয় খেয়েই আছেন। মনীশ ডাক্তারদের কাছে জানলো, এটা তাঁর দ্বিতীয়বার হল।···মনীশ একটু অবাক হল, প্রথম কবে হয়েছিল, কই সে তো, কিছু জানে না। জানতে চাইলো, সুবোধ হালদারের কাছে—

—হালদারবাবু—এটা দ্বিতীয়বার? প্রথম কবে হয়েছিল?···

—ঠিক আপনার পাশ করে আসবার এক বছর আগে, তাঁর দু'দিন আগে, তাঁর বোনের মৃত্যু সংবাদ আসে।

মনীশ একটু চমকে উঠলো।—কিন্তু আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলেন নি তো।

—হ্যাঁ আমি একবার বলেছিলাম, আপনাকে খবর দেবার কথা, কিন্তু ডাক্তার সাহেব বারণ করলেন।

মনীশ জানে, মামা যা বারণ করেন, সে কাজ সুবোধ হালদার কখনও করবেন না। তাই বলে কিন্তু নিজেও আমাকে কিছু বলেন নি তিনি···তাছাড়া মামার স্বাস্থ্য এমনি তো খুব ভাল। বাঁধা নিয়ম তাঁর খাওয়া-দাওয়াতে।

—আপনি তো, নিজেও ডাক্তার, এসব অসুখ কখন হবে, কেন হবে, তা যদি মানুষ বা ডাক্তার বলতে পারতো···তা হলে, অনেক ভাবনা মিটে যেত।···আমার মনে হয়, ওঁর বোনের মৃত্যুটা ওঁকে বড় বেশী আঘাত দিয়েছিল। উনি খুবই ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

সুবোধ হালদারের কথায় মনীশের মন অপরাধবোধে নত হয়ে পড়ছিল। এ লোক বার বার, ওঁর বোন বলছে কেন, এ কি জানে না, তিনি মনীশের মা।

হালদারের ভাব দেখে বোঝা গেল, ডাক্তার সাহেবের বোন এর বেশী সে আর কিছু জানে না।

দিন দশেক পরে কিছুটা ভাল হয়ে উঠলেন পরমেশ ডাক্তার। আস্তে আস্তে কথা বলছেন, একটু বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে।

ডাকলেন মনীশকে,·· অনেক কথাই বলার আছে—তাঁর। কিন্তু এত শীঘ্র যে বলতে হবে তা ভাবেন নি যেন। বলতে থাকেন—

মনীশ, আমি বিবাহ করিনি,—তার কারণ আমি চাইনি যে, আমার বংশ থাকুক। আমাদের কৃশ্চান সমাজের অভাব ও অশিক্ষার যে ভয়ানক পরিণতি আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি। কৃশ্চান সম্প্রদায়কে সুশিক্ষিত করবার জন্যে, না বৃটিশ রাজশক্তি, না কৃশ্চান মিশন, কিছুই করেনি বলা যায়। একদিকে বিরাট হিন্দু সমাজের অবজ্ঞা, আর লাঞ্ছনা, অন্যদিকে গর্বিত সাহেব—খাঁটি সাহেবদের উচ্চতর মর্যাদার নীচে হীন হয়ে থাকা। তার ওপর দারিদ্র্য আর অশিক্ষা। এমন কি মিশনের নাম-করা ইস্কুল-কলেজগুলিতে হিন্দুরাই

স্থান পেয়েছে। আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে কোন কিছুই জোর করে চাইবার মত মানুষ পর্যন্ত সমাজে পাওয়া মুস্কিল। অতি সামান্য যে কজন শিক্ষিত হয়ে ওঠেন, কিছুটা সমৃদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁরা যেন দূরে পৃথক হয়ে যেতে চান। পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতিহীন। এসব যদিও আমার অন্তরের বোধ।

অশিক্ষার পরিণতি দেখেছি···শুধু তোমার মা, আমার বোনের মধ্যে নয়,···বহু বহু মেয়ে পুরুষের মধ্যে।

মনীশ বলে, মামা, আজ থাক। ··আপনি অসুস্থ।

থাক,···আমার মতামত আমার খাতায় লেখা আছে। যদি তার মধ্যে সত্য খুঁজে পাও,—তবে, ঠিক পথ বেছে নিও।···আমার বিশ্বাসে, আর সত্যে যদি এক হও···তবেই তা সম্ভব হবে।

আজ থাক মামা।

দুদিন পরে, বিকেলে বিশ্রামের জন্যে একটু বসেছেন, বাইরে শোয়া চেয়ারে। চমৎকার হলুদ আলোয় ভরে থাকা এই সময়টা বড় ভাল লাগছিল। শোন, তোমার বাবা, তোমার বিয়ের কথা দিয়ে যায়, তার এক বন্ধুকে তার মেয়ের সঙ্গে। বন্ধুর নাম শশীনাথ রায়।

কিন্তু তখন তো···আমি খুবই ছোট···

হ্যাঁ, মেয়েটিও তখন একবছরের। এই শশীনাথ রায়দের সম্বন্ধে সুধীশের আগ্রহ ছিল অসীম। এই শশীনাথের মাসীমার পালিত পুত্র ছিল তোমার বাবা।···আর বেচারী মিসেস পিটার। তাঁরও জীবনে এক মাত্র আনন্দ ছিল, তোমার বাবা।···প্রথম থেকে শোন—শশীনাথের দাদামশাই ছিলেন হিন্দু সমাজের অতি সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। এদেশে শিক্ষা শেষ করে, তিনি বিলেতে যান, সেখানে এক বিশিষ্ট ইংরাজ গ্রেহাম পরিবারের মেয়ের প্রেমে পড়েন, আর ডরোথি গ্রেহামকে বিবাহ করেন। দেশে ফিরে, তৎকালীন সমাজে স্থান না পেয়ে এবং কিছুটা ক্ষোভবশতঃ কৃশ্চান ধর্মগ্রহণ করেন গ্রেহাম পরিবারের অনেকের সঙ্গে এখানকার চা ব্যবসায়ী ইংরাজদের জানা শোনা ছিল।

সহজেই সেখানে ভাল পোষ্টে কাজ পান ডরোথির স্বামী নারায়ণ চক্রবর্তী। তাঁদের দুটি মেয়ে হয়। দুটি মেয়েকেই উচ্চ শিক্ষা দেন। কিন্তু ফল যা হওয়ার তাই হল। বিয়ে দেওয়ার সময় সমাজে সুশিক্ষিত ছেলে পাওয়া মুস্কিল। তা ছাড়া, ধর্ম ছাড়লেও জাতি বিচার ছাড়িয়ে উঠতে পারছিলেন না। কাজেই কৃশ্চানের মধ্যেও ব্রাহ্মণ খুঁজছিলেন। এই সময়ে বড় মেয়ে সুকুমারীর সঙ্গে কোন এক সংযোগে সুদর্শন রায় বলে একটি ছেলের দেখাশুনা হয়। শুনেছি সুকুমারী চক্রবর্তী দেখতে খুবই সুন্দর ছিলেন, এবং বি, এ, পাশ করেছিলেন। সেই সময়ে, হিন্দু সমাজে আবার এমন শিক্ষিত মার্জিত রুচির মেয়ে পাওয়া সহজ ছিল না।

আবার সেই একই পরিণতি ঘটলো। কায়স্থ সুদর্শন রায়ও কৃশ্চান হয়ে সুকুমারীকে বিয়ে করেন।···নারায়ণ চক্রবর্তীর মত তিনিও অসুখী হন। সমাজ ধর্ম, আপন লোকজন সব ছেড়ে নিজেদের নিয়ে থাকতে পারলেন না। এই বিয়ের অল্প দিন পরেই, নারায়ণ চক্রবর্তী মারা যান। সুদর্শন রায় চলে যান, আসাম ছেড়ে বাংলায়, ঝরিয়া অঞ্চলে। সেখানে গিয়ে আরো বেশী গ্লানি বোধ করেন। এবং যে স্ত্রীর জন্যে সব ত্যাগ করেছিলেন, সেই স্ত্রীর ওপরে দুর্ব্যবহার তীব্র হয়ে উঠলো তাঁর। স্বামীর মৃত্যুর পর ডরোথি চলে গিয়েছিলেন বিলেতে। ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন এখানকার সাহেব গোষ্ঠীতে। এই দুঃখ যন্ত্রণায় সুকুমারীর মন ভেঙ্গে পড়ে অকাল মৃত্যু হয়। বড় মেয়ের মৃত্যুর সংবাদে ডরোথি আবার আসেন। এদিকে, অত্যাচারী মদ্যপ মিস্টার পিটারের মৃত্যু ছোট মেয়ে চারুলতাকে মুক্তি দেয়।

চা বাগানের এক কর্মচারী, সতীশ সরকারের মাতৃহীন চতুর্থ ছেলেটিকে নিয়ে পালন করেন মিসেস পিটার।

বড় মেয়ের ছেলে এই শশীনাথকে নিয়ে ছোট মেয়ের সঙ্গে, তেজপুরেই থাকেন ডরোথি। মেয়েটির বিয়ে, তার বাবা, মা থাকতেই

ঝরিয়ার কয়লা খনির চাকুরে, বাঙ্গালী কৃশ্চান। আমাদের পরিবারে সেই সময়ে আমার বাবাও ছিলেন চা বাগানের চাকুরে। আমার ঠাকুর্দার বাবাও শুনেছি ব্রাহ্মণ ছিলেন, ক্রমশঃ কৃশ্চান সমাজের উঁচু নীচু সব জাতের মধ্যে একাকার হয়ে যেতে হল। কিন্তু এই জাতের একাকার মেনে নেবার মত শিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠেনি কৃশ্চানদের মধ্যে।··তা বলে সকলেই যে অযোগ্য ছিল তা নয়, অযোগ্য ছিল বড়ই কম।

শশীনাথ, সুধীশ আর আমি প্রায় এক বয়সীই ছিলাম। শশীনাথই বড় ছিল কিছু।···বিচার, বিবেচনা, ব্যবহার, শিক্ষা সবদিক থেকে ডরোথি মেম সাহেব ছিলেন অনন্যা। তখনকার দিনে, চা বাগান অঞ্চলে, গরীব কুলী কামিনরা তাঁকে দেবীর মত দেখতো।···খুব ছোট হলেও আমারও মনে আছে তাঁকে। ছোট বেলা থেকে তাঁর কাছেই শিক্ষা পেয়েছিল সুধীশ। একসঙ্গে মানুষ হয়েছে শশী আর সুধীশ দুটি ভায়ের মত। শশীনাথের বিয়ে হল, তার অল্পদিন পরেই মারা গেলেন, মিসেস পিটার। শেষ সন্তানকে হারাবার পর ডরোথি মেম সাহেব আর থাকতে পারলেন না, বয়স হয়েছিল, দেশের মাটি তাঁকে ডাকছিল, তিনি দেশে চলে যান।

শশীনাথ চা বাগানে চাকরী করতো, বিয়ে করেছিল এক স্কুল মাষ্টারের মেয়েকে। সুধীশ সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করে আর পড়তে চায়নি। ডরোথি মেম সাহেব তখন চলে গেলেন—আর উপার্জন করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে তখন সুধীশ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

আমাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগটা, তোমার বাবার পক্ষে ভাল হয়নি।···আমার বাবা ছিলেন এক উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি, তাই চাকরীর উচ্চ পদে উঠবার কোন বাধাই তিনি মানতেন না। নিজেকেও ওই সাহেবদের একগোত্রীয় ভাবতেন। সেই কারণে আমাদের বাড়িতে ছিল খুব অশান্তি। আমার বোনেরা ছিল

সুন্দরী। নিজের চাকরীর সুবিধার জন্যে তাদের সবরকম স্বাধীনত দিয়েছিলেন বাবা। অবাধ হৈ হুল্লার আনন্দে যোগ দিত আমা বোনেরা।

বাবা অনেক বড় পোষ্টে উঠে গেলেন, "ব্লু ষ্টার" কোম্পানীর অফি সুপারিনটেনডেণ্ট, নিখিলেশ বিশ্বাস, আর তার বাড়ীর ছেলেমেয়েদে চাল-চলনই ছিল আলাদা। দুই দিদি। তোমার মা, ছিল বোন বাবার আশা ছিল, বড় সাহেব মিস্‌টার স্যামশানের ছেলে বুঝি তাঁ বড় মেয়ে সরলাকে বিয়ে করবে···না, তা ওরা কোন দিনই করে না দু বছর ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবার পর সাহেব-পুত্র চ গেলেন স্বদেশে বিয়ে করবার জন্যে। একজনকে কিছু টাকা দি দিদির বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন সাহেব। তার ঘর করবা কিছু দিন পর দিদি বিষ খেয়ে নিজেকে মুক্তি দেয়।—স্যামশা সাহেব তখন বাবাকে চীফ অফিসার করে দিয়েছেন। বিলাসে আকর্ষণ, যেন আগুন, মেজদিও মুক্তি পায় নি, তবে সে ছিল খুব শ মনের মেয়ে···ওই ধরণের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক বেছে বি করেছিল। কিন্তু প্রথম বয়সে যারা অবাধে চলাফেরা করে, তা কোন দিনই বাঁধাধরার মধ্যে থাকতে পারে না। তাই কোন দিন সু শান্তি পায় নি; পরে দেহের মধ্যে ক্ষয় রোগের বাসা নিয়ে বাবার কাছেই ফিরে আসে। সব চেয়ে ছোট তোমার মা ছিল স চেয়ে সুন্দরী। তাকে দেখে মুগ্ধ হয় তোমার বাবা। আমার বাবা বোধ হয় শেষকালে শান্তি চেয়েছিলেন। শশীনাথ একটু আপ করলেও, সুধীশ শোনে নি। বিয়ের আগে আমার বাবাই সাহেবদে বলে রেলওয়েতে সুধীশের চাকরী করে দেন। বড়দির মৃত্যু পরেই মা মারা যান। বাবাও যা রোজগার করতেন—সাহেবী চা থাকতে গিয়ে। মদ ও আনুষঙ্গিক খরচের ফলে কিছুই রাখ পারেন নি। একটা ভাল কাজ করেছিলেন বাবা, সিনিয়র কেম্ব্রি পাশ করবার পরেই আমাকে চাকরীতে ঢুকিয়ে দেন নি। আমাদে

বাড়ীর জীবন আমার কোন দিনই ভাল লাগে নি। তাই বাড়ী ছেড়ে বাইরে গিয়ে, আমি যেন মুক্তি পেলাম। মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে মনে হয়েছিল মা বাঁচলেন। নিজেকে ক্ষয় করে দিতে দিতে মেজদি যেন অক্ষয় জ্ঞান পেয়েছিল—নিজেদের অবস্থা বুঝে ছিল, অল্পশিক্ষিত বাবার অর্থ লোভ আর উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বলি হয়েছিল তার—এটা একলা তাঁর দোষ নয়, সমাজের দোষ, অশিক্ষার দোষ, এসব জ্ঞান তার কাছেই পেয়েছি। বাবাকে তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের শোক পেতে হয় নি। অত্যন্ত মাতাল অবস্থায় পড়ে গিয়ে মাথার শির ফেটে তিনি মারা যান। এদিকে তোমার মার সঙ্গেও গোলমাল শুরু হয়ে যায় তোমার বাবার। সংসার চালাবার মত শিক্ষা দীক্ষা কোন দিন পায়নি চপলা। তার রূপের জন্যে বাইরের প্রলোভন পেতো খুব। তাই তার পতন ঘটলো।—তবু প্রথমবার সুধীশ ক্ষমা করে নিয়েছিল। তোমাকে দু বছরের রেখে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এক বছর পরে আবার তাকে নিয়ে ঘর করলো সুধীশ। একজন মানুষ, একজন কৃশ্চানের মধ্যে যে উদারতা থাকা উচিত সবই তার ছিল। কিন্তু সার্থকনামা মেয়ে ছিল চপলা। আবার সে ঘর ছাড়লো, আবার কিছুদিন পরে ফিরে এল। সুধীশ তাকে শুধু ঘরে থাকতে অনুরোধ করে। অসহায় বালক ছেলেকে নিয়ে সে ঘরে থাক এই যুক্তিতে নিজের জীবনকে নিজেই শেষ করে। মিসেস পিটারের দরুন, কিছু চায়ের শেয়ার ছিল, পাঁচ হাজার টাকার লাইফ-ইনসিওর তোমার মার নামে দিয়েছিল। আমি নিয়ে এলাম, তোমার মাকে, তোমাকে। কিন্তু আমিও তাকে ধরে রাখতে পারি নি। অসংযত সমাজের মধ্যে মানুষ হওয়ার দাম যা দিতে হয়, তার সব কিছুই তাকে দিতে হয়েছে।

থেমে থেমে বলছিলেন বিশ্বাস ডাক্তার। শেষ তাকে দেখি, তুমি যে বার ম্যাট্রিক পাশ কর। আমি চিনতেই পারি নি। অন্য স্ত্রীলোক ভেবে, সুবোধ তাকে ডিসপেনসারীর বারান্দায় বসিয়ে

রেখেছিল। নানা কুৎসিৎ ব্যাধিতে আক্রান্ত। দিমাপুরের ওই শ্রেণীর এক বস্তিতেই থাকতো, আমার কাছেই এসেছিল কিন্তু আমার আর তখন তাকে রাখবার উপায় নেই। তোমার জন্যেই সেদিন তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তবে নিয়মিত টাকা পাঠিয়েছি। মনীশ, শেষ সময়ে তাকে দেখতে পাই নি বলে, আমি খুবই দুঃখিত হয়েছিলাম কিন্তু তাকে সেই অবস্থায় তুমি দেখ নি, এতে আমি খুশীই হয়েছি। হয় তো, সময় পেলে, আমি তোমাকে বাধা দিতে পারতাম না। মা বলে মনে যে স্মৃতিটা আছে সেইটাই ভাল। তিন বোনের চরম দুর্দশা ভাবতে গিয়ে ভেবেছি ··আমাদের সমাজের মূল কথা।

তোমার বাবার মত ছিল অন্য রকম। সে চেয়েছিল, তার সন্তান সুখী হবে, সামাজিক হবে। তাই মৃত্যুর আগে আমাকে, শশীনাথকে চিঠি লিখেছিল। তার ইচ্ছা ছিল ইংরাজ মেমসাহেবের রক্ত আছে যে মেয়ের দেহে, তাকে যেন তার ছেলে বিবাহ করে। এই বিবাহে তার আত্মা তৃপ্তি পাবে। শান্তি পাবে। আমার নিজস্ব মত আমার। তোমার বাবার একান্ত বাসনা সবই তোমাকে জানালাম। এখন তুমি নিজের বিবেচনায় যা ঠিক করবে তাই হবে।

—কিন্তু সে সব ভাবনা পরে ভাবা যাবে। আমিও তো এখন নিজে কিছুই করি না।

একটা কথা ভাবতে হবে। শশীকে তো জানাতে হবে। তারও একান্ত ইচ্ছা সুধীশের ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে হয় কিন্তু সে কত দিন অপেক্ষা করবে—তার ওপরে সেও তো নিষ্কৃতি পায়নি··· তারও স্বপ্ন ছিল ছেলে ডাক্তার হবে।—ছেলেটি পড়াশোনাতে ভাল ছিল।···সহর থেকে বহুদূরে সমাজ থেকে সরিয়ে দূর গ্রামে গিয়ে বাস করছিল। পাটনায় ডাক্তারী পড়তে পাঠালো ছেলেকে। ছেলে ভাল বাসলো একটি মেয়েকে, মেয়েটি বিয়ে করলো অন্যত্র। আত্মহত্যা

করলো ছেলেটি।

মেয়েটির কি এখনও বিয়ে হয় নি?···

—না, অন্তত তুমি পাশ করে বার হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে বলেছি। শশীনাথের কথা বুঝে দেখ, সে থাকতে থাকতেই মেয়ের বিবাহ দিতে চাওয়াই উচিত হবে তার।

—কিন্তু···আমি···

—থাক মনীশ, এখনি কিছু ঠিক করতে হবে না। তুমি নিজে কিছু না করা পর্যন্ত সময় পাবে।···মনীশ, তোমার নিজের দিক থেকে যদি কোন মনোনীতা থাকে, তা জানাতেও কোন সঙ্কোচ করো না।

মনোনীতা! অবাক হয়ে যায় মনীশ। তার মানে একটি মেয়ে। রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। কেমন ভয় ভয় লাগে। একটু ভীত ভাবেই বলে, না—না—আমার নেই···ওসব আমার দরকার নেই। সামলে নিয়ে বলে—আপনার মতই থাকবো আমি, কোন মেয়ের দরকার নেই আমার।

মামা হাসেন। এতদিন পরে, মনীশের সঙ্গে এমন প্রাণ খুলে কথা বলতে পেরে হালকা হয়েছেন তিনি। বড় ভাল লাগছে কথা বলতে।

বলেন, ওরে, দরকার নেই বললেও চলে না। ওদেরও দরকার আছে জীবনে।

—আপনার তো বেশ কেটে গেল ওদের না পেয়ে—

—কই? কোথায় কাটলো···অনেক পেয়েছি···

মামার কথাতে একটু ভড়কে গেল—তবে, তবে কি? লোকদের রটনার কিছুটা সত্যি?—তবু বলে, আপনি তো বিয়ে করেন নি।

হো-হো করে হেসে ওঠেন বিশ্বাস ডাক্তার। ও ঠিক, ঠিক। বৌ পাইনি। হ্যাঁ সেটাও একটা পাওয়া। স্ত্রী পাওয়াটা একটা বড় পাওয়া,···কিন্তু···ওই যে হতভাগিনীগুলো। আসে আমার কাছে, ওষুধ কিছু দেয় রে—কেউ রোগের জ্বালায়, কেউ পেটের জ্বালায়,

কেউ বা প্রাণের জ্বালায় আসে। তাদের সেই জ্বালার সামান্য শান্তি পাওয়ার সময়ে, মুখের ভাবে, চোখের আলোয় তারা অনেক দিয়ে যায়—ওরাই তো ছিল একদিন আমাদের মা, আমাদের বোন—হয়তো কারও-বা বিবাহিতা স্ত্রী—পুরুষের পাপের বোঝা, সমাজের গ্লানির বোঝা বহন করেও তো কম দিচ্ছে না আমাদের—

মনীশ, তুমিই বরং কিছুই পাওনি—আমি মা পেয়েছি দিদি পেয়েছি বোন পেয়েছি—তাদের পেয়েছি বলেই তো তোমাকে পেয়েছি—ওদের বাদ দিয়েও চলা যায় না। সেই জন্যেই তো সমস্যা এত জটিল। কোন্‌টা ঠিক কে জানে।

—বিবাহ না করা আর ওদের প্রয়োজনহীনতা—দুই অন্য জিনিস।—সেটা মনের বিচার, ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তাই তোমাকে পরিণত হবার সুযোগ দিতে হয়েছে আমাকে।

—ও সব কথা থাক মামা। আজ আপনি অনেক কথা বলেছেন।

—তা বলেছি, ওরে এবার আমি ভাল হয়ে উঠবো।

—চলুন, আপনাকে বিছানায় দিয়ে আসি। মামাকে আর কোন কথা বলতে না দিয়ে, চলে আসে মনীশ।

ক্রমশঃ ভাল হয়ে উঠছেন পরমেশ বিশ্বাস। মন অনেক হালকা যেন। বললেন, আমার মনে হচ্ছে কতদিন যেন বন্দী হয়ে আছি জোড়হাটে, একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

মনীশও খুসী হয়ে বলে, খুব ভাল হবে মামা। কোথায় যেতে চান বলুন। কমপ্লিট রেষ্ট হবে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক দেশের নাম ঠিক করা হল। পাহাড় নয়,—সমুদ্রতীর হলেই ভাল। ওয়ালটেয়ার বা পুরী। নির্জন জায়গা চান ডাক্তার বিশ্বাস। ভীড় তাঁর সহ্য হয় না।

ঠিক হল মনীশ কলকাতা গিয়ে সব ব্যবস্থা করে খবর দিলে, ডাক্তার বিশ্বাস যাবেন।—মনীশ হয়তো পুরো মাসটা থাকতে পারবে না। সেব্যাল্স সিং যাবে। ওকে না হলে ডাক্তারের চলবে না।

মামা যেন এর মধ্যে কিছুতেই কলে না বার হন, সেব্যাল সিং

আর সুবোধ হালদারকে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে চার দিন পরে মনীশ রওনা হয়ে গেল। দিন সাতেকের মধ্যেই, গোপালপুরম-এ সব ব্যবস্থা করে ফেললো।

এই সাতদিনের মধ্যে বিশ্বাস ডাক্তার কলে যাননি। তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁরই কল এসে গিয়েছে! তিনি উইল করলেন। তারপর বেশ প্রফুল্ল মন নিয়ে চেঞ্জে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সদা গম্ভীর, অল্প কথার মানুষটি। যেন একটু চপল হয়ে উঠেছেন। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখলেন। প্রত্যেক দিন, যে দিনলিপি লিখতেন, সেগুলো ড্রয়ারের টানার মধ্যে রাখলেন ঠিকঠাক করে। নিজের জিনিসপত্র নিয়ে তাঁর ভাবনা নেই, সে সব তাঁর চেয়ে সেব্যাল ভাল জানে। টাকা পয়সার ব্যবস্থা করলেন, সুবোধ হালদারের সঙ্গে। বিশ্বাস ডাক্তার চেঞ্জে যাচ্ছেন শুনে, সহরের অনেকেই দেখা করতে এল। বন্ধুস্থানীয় দু একজন বললেন, ভালই করেছ হে—সারা জীবন খাটলে, সবই তো অপাত্রে দিলে। নিজে একটু কিছু ভোগ কর।

ডাক্তার কিছুই বলেন না, সকলের বক্তব্যই শুনে যান চুপ করে। হঠাৎ একজন বলেন—নিজে তো বিয়ে থা করলেই না,—এবার ঘুরে এসে ভাগ্নের বিয়ে থা দাও। তা ভাগ্নেটি তোমার উপযুক্তই হয়েছে।

সকলেই ভেবেছিলেন, হয় ডাক্তার কোন জবাব দেবেন না। না হয় বিবাহবিরোধী কিছু বলবেন।

কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে, ডাক্তার বললেন, পাত্রী নির্বাচন করাই আছে, তবে বিয়ে করা না করা মনীশের ইচ্ছা। সেও যদি তার মামার মত অবিবাহিত থাকতে চায় থাকবে। কারো স্বাধীন মতামতে আমি বাধা দিতে চাই না—তা সে ভাগ্নেই হোক, আর অন্য কেউ হোক।

তা তো বটেই, করে চুপ করে গেল সকলেই। যথা সময়ে মনীশের চিঠি এল, বিশ্রামের জন্য বাইরে যাচ্ছেন ডাঃ বিশ্বাস।

সুবোধ হালদার আছে, ডিসপেনসারি ঠিক চলবে। ডাঃ বিশ্বাসের সঙ্গে কলকাতা পর্যন্ত এলো সুবোধ হালদার। যেন মনীশের কাছে তাঁকে পৌঁছে দেওয়া তাঁর কর্তব্য ছিল। যথাসময়ে ডাঃ বিশ্বাস, মনীশ ও সেব্যাল সিং গোপালপুর রওনা হয়ে গেলেন। কলকাতায় কিছু কাজ ছিল, তা সেরে জোড়হাট ফিরে গেল সুবোধ হালদার।

গোপালপুর এসে প্রথম কদিন ভালই লাগলো, ডাঃ বিশ্বাসের। দশ দিন থেকে মনীশের ফিরে যাবার কথা। সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই ডাঃ বিশ্বাস ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মনীশের আসা হল না, মনে ভাবলো, একা থাকবার ইচ্ছা নেই বলে, উনি চলে যেতে চাইছেন। হোটেলে অন্য দু চারজন লোক ছিলেন, কিন্তু সাধারণভাবে মেলামেশা তিনি করতে পারতেন না। পনের দিন কাটবার পর অস্থির হয়ে উঠলেন, আর ঠিক ষোল দিনের দিন, আবার ফিরে রওনা হলেন ডাঃ বিশ্বাস। কলকাতায় একদিন থেকে আবার জোড়হাট। মনীশ থেকেই গেল, এমনি অনেক দিন কামাই হয়েছে। জোড়হাট ফিরে ক'দিন বেশ ভালই ছিলেন। চিঠি পেলো মনীশ, ভালই আছি। আগামী কাল থেকে অল্প অল্প কলে বার হব ঠিক করেছি।

সুবোধ হালদার বলেছিল—আরও দিন সাতেক থাক। না হয় শুধু ডিসপেনসারিতে বসবেন।

—তোমরাই আমাকে অকেজো করে দেবে দেখছি। আমি নিজে বুঝতে পারছি, বেশ ভাল আছি।

ডাঃ বিশ্বাসের বকুনী খেয়ে ফিরে যায় সুবোধ হালদার। কাল থেকে ডাঃ বিশ্বাস ডিসপেনসারিতে বসবেন। একটা দুটো কলও নিতে বলেছেন। তা হবে, উনি নিজেই বুঝতে পারছেন ভাল আছেন। শরীরটা ভালই আছে মনে হল। কাজের মানুষ, কাজ নিয়ে থাকাই ভাল।

বেলা তিনটে নাগাত, ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে এল ডিসপেন-

সারীতে। ঠিক ডিসপেনসারী বলতে যা বোঝায় তা নয়, একসঙ্গে অসুধের দোকান, ডিসপেনসারী ও রোগী দেখবার ব্যবস্থা করা। তিনখানা ঘরের মাঝের ঘরটাই ডাঃ বিশ্বাসের বসবার—সামনের ঢাকা বারান্দায় রোগীরা অপেক্ষা করে। কম্‌পাউণ্ডার নগেন দাস খুশী হল। ডাক্তারবাবু কাল থেকে রুগী দেখবেন। দোকানের কর্মচারী আছে, একজন চাকর আছে একজন, সকলেই খুশী।

রাত আটটা বাজলেই সুবোধ হালদার উঠে পড়েন। তখনও ক্যাশ মিলিয়ে দেখা হয় নি, তাই রয়ে গিয়েছেন সুবোধ হালদার। লুটোন চাকর ছুটতে ছুটতে হাজির—বাবু ভাল নেই। মিত্তির ডাক্তার এসেছেন, শীগ্‌গীর আসুন।

হতবাক সুবোধ হালদার। তার মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা করে কর্মচারী সুরেশ বেরাকে বলে—মনীশবাবুকে একটা টেলিগ্রাম করে দাও।

সুবোধ হালদার এসে, আর ডাঃ বিশ্বাসকে দেখতে পায় নি। তিনি তখন ও-জগতে চলে গেছেন। মাঝবয়সী ডাক্তার কেশব মিত্র এসেছিলেন, এক জটীল রোগীর বিষয়ে, ডাঃ বিশ্বাসের সঙ্গে আলোচনা করতে। দরকার হলে তাঁকে একদিন দেখাবেন। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই বুকে ব্যথা অনুভব করেন,—সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় বসা মানুষটিকে ধরে শুইয়ে দেন,—কিন্তু করবার আর কিছুই থাকে না।

এই জন্যেই ব্যগ্র হয়ে ফিরে এসেছিলেন। মানুষ কি কিছু বুঝতে পারে? তাই যদি হবে, কাল থেকে কলে যাবেন, ঠিক করবেন কেন? মৃত্যু সত্যিই রহস্যময়।

দিন সাতেকের মধ্যে সংসার পাতবার প্রাথমিক ব্যবস্থা সব ঠিক হয়ে গেল। আগামী শনিবার যাব লেখাকে নিয়ে আসবার জন্যে। লেখার চিঠি আসে ঠিক মত। লতা শীঘ্রই পাটনায় যাবার ব্যবস্থা করছে। লেখা চলে গেলেই ও যাবে। একটা মিশন থেকে কিছু এ্যড্‌ পেতে পারে···সেই চেষ্টাতেই আগে যাওয়া। যথাকালে ঠিক

সময়ে আমি হাজির হলাম।

শনিবারে গিয়ে রবিবারে আসার মানে···খুব দ্রুততার মধ্যে আসা। আয়োজন কিছু আছে, অনেক দিনের বিচ্ছেদ বলে, সকলের সঙ্গে দেখা শোনা করা আছে। রবিবারের সকাল, আমরা সকলেই আছি, লেখা তার সুটকেস থেকে কলকাতায় তোলা আমাদের ফটোর কপি সুরবালা দেবীকে দিল। দেখা আগেই হয়ে গিয়েছিল, কপিটা তখনও দেওয়া হয়নি।

সুরবালা দেবী বললেন—লতা, ওগুলো এলবামে রেখে দাও। ঘরের একদিকে একটা চেষ্ট আর ড্রয়ার ছিল। কোন আয়না দেওয়া নয়, শুধুই বড় বড় ড্রয়ার দেওয়া। এই অতি মধ্যবিত্ত কৃশ্চান পরিবারে এমন কতকগুলি ফার্নিচার আমি দেখেছি, যে সুদূর এই এক পাহাড়তলী গাঁয়ে আমার বেশ আশ্চর্যই লেগেছিল। সে সব জিনিষ যে প্রাচীন কালের অতি উৎকৃষ্ট তাই নয়···অতি মূল্যবান। এইরকম বাড়ীতে, এত বড় পিয়ানো, চেষ্ট অব ড্রয়ার্স, ওয়ার্ডরোব, শশীবাবুর ঘরের একটা ডিভান···সাবেকী মেহগনীর তৈরী। হোয়াট নট পর্যন্ত। লতা ও লেখার ঘরে, একখানা আয়না আছে যেন, একটা দরজা। দাঁড়িয়ে ড্রেস করবার। নিজেই মনে মনে ভেবেছি লেখার বাবা-জেঠামশাই, ঝরিয়া কয়লা খনিতে কাজ করতেন। হয়তো কলিয়ারীর কোন কোন সাহেবরা, দেশে চলে যাবার সময়ে, খুবই কম দামে বিক্রী করে দিয়েছেন···তাই ওঁরা কিনে ছিলেন এ জিনিষ-গুলো,—হয় খুব ধনী বনেদী ঘরের, নয়তো সাহেবদের মনে হয়। ছোট বড় টেবিল ল্যাম্প। এই ঘরে দুটি অপূর্ব চেহারা ক্রোমিয়ামের, দেয়ালে লাগানে ব্রাকেট ল্যাম্প আছে যদিও তা জ্বালানো হয় না রোজ।

সুরবালা দেবীর কথা শুনে, লতা ড্রয়ার খুলে অ্যালবাম বার করলো। প্রথমে কয়েকটি মোটা বড় ধরণের বাইরে রেখে—পরে একটা নিয়ে এগিয়ে এল লেখার হাত থেকে ফটো নেবার জন্যে।

আমি একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলাম, ড্রয়ারের ওপরে রাখা কয়েক খানা অ্যালবামের দিকে তাকালাম। অ্যালবামগুলোও অপূর্ব। একখানার ওপরে ছিল মাদার অব পার্লের কারুকার্য্য করা। আমার এত কৌতূহল হয়েছিল যে নিজেই এগিয়ে গিয়ে ওপরের খানা দেখছিলাম। লেখা আর লতা তখন লতার হাতের অ্যালবামটা নিয়ে পাশের খাটের ওপরে বসে দেখতে আরম্ভ করেছে। ওদের স্কুলের কোন মেয়ে—কোন টীচার—আমি ততক্ষণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম এই পুরানো চমৎকার অ্যালবাম। ঠিক ফটো যেমন কার্ডবোর্ডের মধ্যে দিয়ে রাখে, তেমনি করে পেছন দিক থেকে রাখবার ব্যবস্থা করা। প্রথমে দু একটা বাড়ীর ফটো; বেশ বাগান ঘেরা বড় পুরোনো অট্টালিকা। পরে একটা নদীর ধারের ছবি। তারপর গাছতলা, দুটো কুকুর ও দুটি সাহেবদের ছেলে মেয়ে। এর পরেই বেশ বড় ফটো, এক ইংরাজ সাহেব বোধ হয়। এরপরে এক ইংরাজ পরিবারের ফটো। এইখানেতে সবই ইংরাজ পরিবার ও দৃশ্য শোভার ফটো কয়েকটা। সব শেষ, এক ইংরাজ তরুণীর ফটো। সাজ পোষাক বেশবিন্যাস সব কিছু খাঁটি বিলিতি কায়দার হলেও মুখখানা কেমন চেনা-চেনা মনে হল, কেন তা ঠিক বুঝলাম না,—শুধু যেন একটা চেনা আদল পেলাম।—ওইটা সরিয়ে রেখে আর একটা টেনে নিলাম। এই অ্যালবামটা আবার এম্‌বস্ করা। অতি সুন্দর উঁচু উঁচু ফুলদার নক্সার মধ্যে ছবিগুলি রাখবার ব্যবস্থা। প্রথমটা খুলতেই এক বাঙ্গালী যুবক ও ইংরাজ তরুণী হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে—তরুণীটির পরিধানে একটু প্রাচীন পোষাক। পোষাকের ঝুল নীচু। হাত পুরো লম্বা, তাতে সুদৃশ্য লেশের কাজ। মাথার টুপী উঁচু চূড়ার মত ফোলানো। গাউন শক্ত কোমর-বন্ধনী দিয়ে বাঁধা। হাসিতে ছাপিয়ে গিয়েছে দুজনের মুখ।

এদিকে ফিরে দেখি, লেখা আর লতা কখন যেন উঠে গিয়েছে। লেখার বাক্স জিনিসপত্র গোছানো নিয়ে ওরা ব্যস্ত ছিল সকাল থেকে।

মগ্ন হয়ে ছবি, এই ফটো দেখবার একটা কারণ ছিল। বহু লোকের বহু রকম হবি থাকে, যেমন ডাকটিকিট জমানো, পুরোনো মুদ্রা জমানো, প্রজাপতি মথ জমানো, আমার ঠিক তেমনি অভ্যাস ছিল ছবি জমানো। কোন বিখ্যাত ব্যক্তি, স্থান ঐতিহাসিক কিছুর ছবি আমার আছে—মহাত্মা গান্ধীর দাণ্ডি অভিযান থেকে সুরু করে শেষ ছবিটি পর্যন্ত। নেতাজীর ছোটবেলা থেকে যতগুলি পেয়েছি। ভারতীয় ভাইসরয়দের প্রায় সব ছবি আছে। পঞ্চম জর্জের করো-নেশানের ছবি। এ অভ্যাসটা পাওয়া আমার বড়দার থেকে। তাঁর অভ্যাস যত খেলোয়াড়, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবি রাখা। কত পুরানো দিনের সব খেলোয়াড় আর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবি। আজকাল এদের ছবি পাওয়া কত সহজ। তখন ছিল খুবই শক্ত আর বেশী দাম। আমি, তাই ছবির অ্যালবামগুলো নিয়ে খাটের ওপর এনে বসে বসে ভাল করে দেখবো ঠিক করে বসেছি সবে, সুরবালাদেবী ঘরে এলেন।

আমার দিকে তাকিয়ে একটু বিষাদ হাসি হেসে বললেন—বহু পুরোনো জিনিস—আমাদের পরিবারের সব ফটো—আমাদের পরিবার! আমি প্রায় লাফিয়ে উঠছিলাম। সুরবালাদেবী আমার চমকে ওঠা লক্ষ্য করেছিলেন, তাই বলেন—তা ঠিক আমাদের কেউ নয়, একপুরুষ পার হয়ে গিয়েছে তো। আমার দিকে সরে এসে খোলা অ্যালবামের পাতার দিকে তাকিয়ে বলেন—এই যে, দুজনে দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁরা হচ্ছেন আমার দাদামশাই আর দিদিমা।

আমি তো হতবাক্। বলেন কি, এই কৃষ্ণবর্ণের অতি সাধারণ মহিলা এই ঘরবাড়ীর লোক, এই সুরবালাদেবী, নেটিভ কৃশ্চান। একটু বিস্ময় কাটিয়ে উঠে বলি—এই মহিলা, ইংরাজ নন্—খাঁটী ইংরাজ (Pure English blood)। ওর নাম ছিল মিস ডরোথি গ্রেহাম। চোখ ছল ছল করে উঠলো সুরবালাদেবীর। কি ভাল ছিলেন উনি। দয়ায় মায়ায়, ন্যায়বিচারে, ব্যবহারে, বিদ্যাবুদ্ধিতে,

ওঁর জুড়ি বোধ হয় সব দেশের সব মহিলাদের মধ্যে খুব কমই দেওয়া যায়। আমরা ওঁর শিক্ষার গুণের কতটুকুই বা পেয়েছি। মা দিদিমার কোন গুণই পাই নি আমরা দু ভাই বোন।

—আপনার মামারা কোথায় থাকেন? বিলেতেই?

—আমাদের কোন মামা ছিলেন না। মা'রা দুই বোন ছিলেন। মা বড় ছিলেন, মা তখনকার দিনে লণ্ডন মিশনারী স্কুল থেকে পাশ করে। বেথুন কলেজ থেকে বি, এ পাশ করেন। মাসীমাকে আর বি-এ পড়ান নি দাদামশাই। দাদামশাই ছিলেন, পূর্ববঙ্গের গোঁড়া হিন্দু পরিবারের ছেলে। লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন, স্কলারসিপ পেয়ে বিলেত যান। মেম বিয়ে করে সমাজচ্যুত হন, ফলে কৃশ্চান হন। প্রথমে খুব মুশড়ে পড়েন, কিন্তু দিদিমার স্বভাবে সব কিছু কাটিয়ে সুখী হতে পেরেছিলেন। আমার মা ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী, মেম-সাহেবের মত রং আর কালো চোখ। শুনেছি বাবা তাঁকে দেখে, আলাপ করে, মুগ্ধ হয়ে এই বিয়ে করেন। বাবা ছিলেন ধনী পরিবারের ছেলে। জীবনে জন্মের পর থেকে সব কিছু পেয়ে এসেছেন। কৃশ্চান মেয়ে বিয়ে করবার জন্য তাঁর বাবা-মা, তাঁকে গ্রহণ করলেন না। আগেই বলেছি আমার কাকার ছেলে এখানে এস-ডি-ও। আমার কাকা পাটনায় উকিল ছিলেন। কিন্তু বাবা দাদামশায়ের মত ছিলেন না। তিনি পরে মাকেই তার সব কিছুর কারণ ভাবলেন। আর বাবারও ভাগ্য ছিলো—কষ্ট পাওয়া। দাদামশায় টি-এষ্টেটে খুব বড় চাকরী করতেন, বাবাকে মাকে বিলাত পাঠাবেন, হঠাৎ মারা গেলেন—মা বড় কষ্ট পেয়ে গিয়েছেন। দাদামশায় মারা গেলে—দিদিমাও বিলেতে চলে গিয়েছিলেন। আমার বিয়ের সময়েও আসেন নি। এলেন মা খুব অসুস্থ খবর পেয়ে। বাবা তারপরে আলাদাই ছিলেন। দিদিমা শশীকে নিয়ে জোধপুরে চলে যান। মাসীমার বিয়ে হয়েছিল, ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা এক সাহেব পরিবারে। কিন্তু দিদিমা আসবার বছরখানেক

পরেই, মাসীমার স্বামী মিষ্টার পিটার মারা যান। দিদিমা প্রায় বাইশ বছর ছিলেন। নানা সেবা কাজ নিয়ে দুঃস্থদের জন্যে চা-বাগানে হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি অনেক কিছুতে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল। শশীও ওই টি গার্ডেনে চাকরী পায়। দাদামশায়ের বেশ ভাল টি শেয়ার, অন্য টাকা পয়সা ছিল। বেশি ভাগ টাকাই দিদিমা সেবা কাজে খরচ করতেন। ওঁর লাইফ অ্যানুয়িটি ছিল। কিন্তু ছোট মাসীমাও মারা গেলেন। প্রায় আশী বছর বয়সে এই শোক আর সইতে পারছিলেন না। দেশের মাটিও তাঁকে যেন টানছিল। এক সাহেব পরিবার সঙ্গী পেয়ে চলে গেলেন নিজের ভাই বোনদের কাছে।

—আপনার বাবা তখনও বেঁচে ছিলেন···

—হ্যাঁ। বাবা চা বাগানের চাকরী ছেড়ে চলে আসেন ঝরিয়ায়। এখানে কোল কোম্পানীতে চাকরী পান। সেও সম্ভব হয়েছিল, আমার দিদিমার নামের জোরে।···

কিন্তু এখানে এসে, তার নিজের ভাই বোনদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়·· তার ফলে, তিনি মাকে তাঁর জীবনের অশান্তির মূল ভাবতে থাকেন। মা ছিলেন, বাবা মায়ের প্রথম এবং খুব আদরের। খুব নরম মনের মানুষ ছিলেন। বাবার কোন রকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু বলতেন না। আমিও কলকাতায় বোর্ডিং-এ থাকতাম।

এই সময়ে আমার মা, ঝরিয়ার এই কৃশ্চান পরিবারে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। এই পরিবার ধনী ছিলেন না, কিন্তু অতি ভদ্র পরিবার, আর শান্তির পরিবার ছিল। আমার যিনি শাশুড়ী ছিলেন, তিনি ম্যাট্রিক পাশের পরে ট্রেনিং পাশ করে ওখানকার স্কুলে, শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। মায়ের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব হয়েছিল। এই বিয়ে নিয়ে খুব বেশী গোলমাল হয় বাবার সঙ্গে। আমার বিয়ের পরে আরো বেড়ে চলে। রাগ করে কান্নাকাটি করে মা প্রায় দিনই অনাহারে থাকতেন। তাও আর বেশী দিন নয়—একেবারেই শয্যা-শায়ী হয়ে পড়েন। মার অবস্থা দেখে. ওখানকার এক সাহেব, তিনি

দিদিমাকে খবর দেন, কিন্তু তখনকার দিনে তো এত সহজে যাতায়াত ছিল না। তাই দিদিমা যখন এলেন, মার তখন শেষ অবস্থা।

দিদিমা ছিলেন এমন প্রকৃতির, অন্যায়কে তিনি মেনে নিতেন না। কোমলও যেমন কঠিনও তেমন। বাবাকে তিনি মায়ের মৃত্যুর কারণ মনে করে, তাঁর সঙ্গে সব সম্বন্ধ তুলে জোর করে শশীকে নিয়ে তেজপুরে চলে যান। এবং স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহারের দোষ চাপিয়ে অভিযোগ এনে বাবাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করিয়ে যান।

সাহেবরা চাকরী ছাড়িয়ে দিলে, তখন আর সহজে চাকরী পাওয়া যেত না। বাবা তাঁর নিজের পরিবারে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর মা তখনও বেঁচে ছিলেন। কলকাতার কাছে, শ্রীরামপুরের লোক ছিলেন বাবা। তিনিও আমাদের খবর রাখতেন না—আমরাও জানতে পারতাম না সেই জন্যে। তবে শুনেছি শেষ জীবনটা প্রায় আশ্রিত-ভাবেই কেটে ছিল তাঁর। দিদিমা চলে যাবার পরে, শশী একবার গিয়েছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আনতে, যদি আসেন। শশীর তখন বিয়ে হয়েছে, একটি ছেলে হয়েছে, বাবা আসেন নি—এমন কি শশীর সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করেন নি। বাবা মারা যাবার প্রায় বছরখানেক বাদে আমরা খবর পাই তিনি মারা গিয়েছেন।

সুরবালাদেবী উঠে এসে অ্যালবাম খুলে—সব ছবি দেখাতে লাগলেন। তার একটি ছবির মত ছবি শশীবাবুর ঘরে দেখেছি, তখন ভেবেছিলাম, কোন মিশনারী ইংরাজ মহিলার ছবি। একটা ছবি দেখালেন সুরবালাদেবী—সাড়ী পরা ফটো, ওঁর দিদিমার। হিন্দুস্থানী মেয়েদের মত, সামনে আঁচল দিয়ে পরা আর তখনি আমার মনে হল —এ যেন লতার ছবি। প্রথম থেকে এতক্ষণ যে ইংরাজ মহিলার ছবি, কেমন চেনা-চেনা লাগছিল, তা হচ্ছে এই মুখের সঙ্গে লতার অসম্ভব মিল থাকা।

আমি বলি—আপনার দিদিমার মুখের সঙ্গে, লতিকাদেবীর মুখের খুব মিল আছে।

—হ্যাঁ তাই মনে হয়—যারাই এই ফটো দেখে তারাই বলে, তবে আমার মনে হয়, দিদিমার রং ছিল, আরো ফরসা।

—তা-তো হতেই পারে—তিনি ছিলেন খাঁটি ইংরেজ।

লতার অনেক ভাব ভঙ্গীও তাঁর মত, হাঁটা, চলা, তাকানো, চুপ করে আপন মনে ভাবা। কিন্তু সে রকম তেজস্বিতা নেই। তাঁকে তখনকার চা-বাগানের সব সাহেবরাও মান্য চলে চলতো···এতটুকু অন্যায়েরও তীব্র প্রতিবাদ করতেন।

এদিকে ছিলেন খুব ধর্মপ্রাণা। সব পাদ্রী সাহেবদের স্নেহের আর সম্মানের পাত্রী ছিলেন। আমার মামীমার ছেলেপুলে হয়নি। একটি মাতৃহীন শিশুকে তিনি পালন করেন। দিদিমা দেশে যাওয়ার সময় অস্থাবর সব জিনিস শশীকে ও তাঁকে সমান ভাগ করে দেন। সেসব বেশীর ভাগই শশী আর এখানে আনতে পারেনি—খুবই কম এই সামান্য কিছু এনেছে এখানে। আরো কিছুক্ষণ ছবি-গুলি দেখার পরে সুরবালাদেবী উঠে গেলেন অন্য কাজে।

আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখছিলাম সুরবালাদেবীর দিদিমার ফটো। একটু পরে লেখা ঘরে এল। অ্যালবামগুলি ড্রয়ারে তুলে রাখতে গেল সে।

আমি বললাম,--তোমার বড়মার দিদিমার চেহারার সঙ্গে, লতিকাদেবীর ভয়ানক রকম মিল আছে।

—হ্যাঁ আমরাও দেখেছি—কি আশ্চর্য অথচ বড়মাকে দেখলে মনেই হয় না উনি একজন ইংরাজ মহিলার দৌহিত্রী।

—তা ঠিক—না চেহারায়—না চালচলনে।

—বড়মা কিন্তু খুব ভাল পিয়ানো বাজাতে পারেন, গানও গাইতে পারেন খুব ভাল, প্রেয়ার সং এত ভাল গান···আর দেবীদা পারতেন ভাল গান গাইতে।

—উনি কেমন দেখতে ছিলেন—বোনের মত—

—না উনি ছিলেন বড়মার মত কালো—কিন্তু খুব ইনটেলিজেন্ট

তোলা ছিল—ওঁর অ্যালবামটা খুব সম্ভব মামাবাবুর ঘরে তাঁর ওয়ার্ডরোবে আছে।

আমি বলি, থাক—পরে অন্য সময়ে দেখা যাবে। এমন সময়ে লতা ঘরে এল, একটু অবাক হয়ে লতাকে দেখলাম। ঠিক ওই ফ্যাশানের মেম সাহেবটির মত। যেটুকু অন্যরকম লাগছে। তা মাথার ছোট চুল ও খোঁপার জন্য।

আমি হঠাৎ লতাকে বলি, সময় বেশী নেই, একটা ছোট গান শোনাবেন। সেদিন বড় ভাল লেগেছিল আপনার গান। কোথায় শিখলেন অমন গান?

—বাড়ীতে গান শিখি, বাবা আর বড়মার কাছেই। পরে অন্য গান শিখি দাদার কাছে। দাদা যখন পাটনা কলেজে পড়তো, ওখানে সে রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখে। তার পরেই একটু ছেলেমানুষের মত বলে—সত্যি আপনার ভাল লেগেছিল? টেবিলের ওপরে রাখা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, এগারোটা চল্লিশ, বারোটা বাজলেই মাসীমা খেতে ডাকবেন—আপনার স্নান হয় নি।

—তা হোক, অনেক সময় আছে।

—আজ আপনাদের যাওয়ার দিন। আজ আনন্দের গান গাওয়াই ভাল। তারপর লতা তার হাতে তাল রেখে রেখে গান করলো—আজ তোমার রঙ্গে রং মেশাতে হবে, ওগো আমার প্রিয়। গানটি ভালই হয়েছিল কিন্তু আমার মনে কোন দাগ কাটলো না। প্রথম দিনের গান যেমন সমস্ত মন প্রাণ ভরে দিয়েছিল। বরং মনে হল, এই অসময়ে গান গাইতে বলাটাই ভুল হয়েছে।

আমার মনোভাবটা বাইরে প্রকাশ পেয়েছিল কি না জানি না, লতা নিজেই বলে—একটা গান আমার দাদার বড় প্রিয় ছিল, এখনও যেদিন দাদার জন্য বাবার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে আমাকে বলেন গানটা গাইতে। লতা আবার গায় গানটি—"মনে রবে কি না রবে আমারে সে আমার মনে নাই।"

সায়েন্সের ছাত্র হলেও কাব্যপ্রীতি আমার মধ্যে ছিল। কবি-গুরুর কবিতা অনেক পড়া আছে আমার। তবু গানের বিষয়ে জ্ঞান কম ছিল। এই গানটি প্রায় দুপুর বেলা হলেও মনকে উন্মনা করে দিল। বহু দিন আগেকার এক যুবকের মনের ব্যথা যেন উদ্বেল হয়েছে—"মনে রবে কি-না রবে আমারে।" মনের নিমগ্নতা কাটতেই উঠে দাঁড়ালাম, চোখ পড়লো দরজার এক পাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকা লতার দিকে। এক অকথিত ব্যথার ছায়া গাঢ় হয়েছে সেই মুখে। আমি চমকে উঠলাম। কেন চমকালাম তা জানি না। মনে হল, শুধুই মৃত জনের স্মৃতি ভারের ব্যথা এ নয়, তবে কি লেখার সঙ্গে আসন্ন বিয়োগ-ব্যথার! ওর মুখের ছায়াটা ভাল করে দেখবার জন্যে আবার যখন তাকালাম,—তখন ও মুখ নামিয়ে নিয়েছে। স্পষ্ট দেখলাম, দু এক ফোঁটা জলের ভারে দু চোখের প্রান্ত টলমল করে উঠেছে। নিজেকে সামলে নেবার জন্য লতা সরে ঘরের বাইরে চলে গেল, সেই মুহূর্তে লতার প্রতি মায়ায় আমারও সমস্ত অন্তর এক অন্য ভাবে ভরে উঠলো।

নটা পঞ্চান্নতে ট্রেন হলেও এতখানি পথ গরুর গাড়ীতে যাওয়া। কাজেই বেলা পাঁচটার কিছু পরেই আমরা যাত্রা করলাম। রাতের খাবার সঙ্গে আছে। সুরবালাদেবী ও লতা সঙ্গে এলেন ষ্টেশান পর্যন্ত। লেখার বাক্স বিছানা ছাড়াও ঝুড়ি ভর্তি তরকারি দেওয়া হয়েছিল আমাদের। লতা সেদিন ঠিক বলেছিল, বাবা যে পরিশ্রম করেন খাওয়ার অভাব হয় না আমাদের। লেখা খুব কান্নাকাটি করছিল। আমরা পুরুষ, কিছুই ছেড়ে আসি না, কাউকে ছেড়ে আসি না। বরং পাই, বড় আপন করে. হৃদয় ভরে পাই। এত কালের আপন জন, আপন গৃহকোণ, দেশ, গ্রাম, শিশুকাল থেকে, বিদায় বেলার দিনটি পর্যন্ত অনুতে অনুতে এক হয়ে থাকা, প্রত্যেকটি অনুভব বড় প্রখর হয়ে ওঠে। তাই লেখার কান্না আমার মনকে আন্দোলিত করছিল। বড় ভালও লাগছিল। চোখের জল দিয়ে, তাদের

সকলের কাছে এই বিদায় অনুমতি, এটুকু না নিলেই যেন কৃতজ্ঞতা রাখা হয় না। সুরবালাদেবীও কাঁদছিলেন। তাঁর সন্তান বলাই চলে, মাতৃহীনের প্রতি মায়া আরো বেশী হয়। লতা নীরব ছিল। সে বোধহয় মনে মনে গান করছিল, "ও তার বিদায় বেদনা ভরে দেব।"

জামতাড়া স্টেশানে এসেও অনেকক্ষণ সময় ছিল। ট্রেন এল। আমরা ওঠবার পরে, লতা হঠাৎ আমাকে বলল—লেখা বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই প্রথম থাকবার জন্যে যাচ্ছে, আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে···ওকে দেখবেন, ও যেন কষ্ট না পায়।

আবাল্যের সঙ্গিনীর প্রতি এত ভালবাসা, খুব ভাল লাগলো। মনটা খুসী করেই বললাম, কিন্তু যে যাচ্ছে না, যে একলা পড়ে থাকছে, তার দুঃখটাও কিছু কম নয়, আপনার কথাও আমাদের মনে থাকবে।

না—না—আমার কোন কষ্ট নেই—কষ্ট নেই, বলে উঠলো লতা। তার কথাগুলো যেন অবরুদ্ধ হয়ে এল কান্নায়। প্রথম বাঁশী বাজলো ট্রেন ছাড়বে। লতা, 'লেখা লেখা' বলে হাত বাড়িয়ে দিল, লেখা তখন কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে। আমিই লতার বাড়িয়ে দেওয়া হাত খানা নিজের দু'হাতের মধ্যে নিলাম। কি কোমল, কি শীতল সে হাত। আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলাম। ট্রেন নড়ে উঠলো। একভাবে তাকিয়ে থাকা লতার মুখখানা ক্রমশঃ দূর থেকে দূরে রেখে আমি চলে এলাম।

এখুনি চলে আসুন, ডাঃ বিশ্বাস অত্যন্ত অসুস্থ।—সুরেশ বেরা। টেলিগ্রাম পেয়ে মনীশ হতবাক হয়ে পড়ে। যাই হোক সে প্রথম সুযোগেই রওনা হওয়ার ব্যবস্থা করে। তখন ট্রেন ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অস্থির অধীর মন নিয়ে মনীশ যখন এসে পৌছালো, স্টেশানেই সুবোধ হালদারের কাছে জানতে পারলো, মনীশকে একলা রেখে ডাঃ বিশ্বাস অন্য জগতে চলে গিয়েছেন। মনীশ এসে পৌছাল তখন ডাক্তারের মৃত্যুর তৃতীয় দিন। তবু যেন সমস্ত শহরের লোক ভীড় করে আছে। মনীশকে দেখে, প্রৌঢ় সেব্যাল সিং ডুকরে কেঁদে

উঠলো—ছোটাবাবু···আর কোন কথা উচ্চারণ করতেই পারলো না।

সেব্যাল সিংকে শান্ত করে, মামার মৃতদেহের পাশে এসে দাঁড়ালো মনীশ। কি শান্ত গভীর ঘুমিয়ে আছেন···এখুনি যেন ঘুম ভেঙে বলবেন—একি, এত লোক কেন! সারাদিনই সহরের সব লোকজন যাঁরা এলেন, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হল। কফিন বক্স, ইত্যাদির যা কিছু ব্যবস্থা সব কিছুই করেছেন সুবোধ হালদার।

আগামীকাল তাঁর দেহ কবরস্থ হবে। সকাল থেকেই ফুল ফুল আর ফুল—আসছেই। সকাল থেকেই অনেকে আসছেন, শেষ বারের মত দেখে যেতে—শেষ সম্মান, শেষ প্রণাম, শেষ নমস্কার জানাতে। সকাল তখন নটা—মনীশ একবার বাইরে এল। গণ্যমান্য ভদ্র ব্যক্তিরা ভেতরে যাচ্ছেন, কিন্তু বাড়ীর গেটের এক পাশে পাঁচীলের ধার ঘেঁসে, দাঁড়িয়ে আছে—একদল হতভাগ্য হতভাগিনী। চোখের জল আর মনের দুঃখ ছাড়া তারা কিছুই আনেনি। শেষ যাত্রা দেখবার জন্য তারা দাঁড়িয়ে আছে। মনীশকে দেখে, উথলে উঠলো তারা কান্নায় কান্নায়। বাঙ্গালী, আসামী, খাসিয়া, নানান জাতের এক দল তারা। নিজের নিজের ভাষায় বলে ওঠে আমার বাবা, কেউ আমার বেটা, আমার ভাই। হায় ভগবান, তোমার কি বিচার! কেউ কেউ কিছুই বললো না, শুধু কপালে করাঘাত করে নীরবে কেঁদে চলে গেল। স্বাস্থ্যহীন, নানা ব্যাধিগ্রস্ত অল্পাহারে শীর্ণ ছোট বড় সব বয়সের···এরা এঁদের সবচেয়ে আপন-জনকে হারিয়েছে যেন, আর শেষবারের মত, বড় আপনার মানুষটির চিরবিদায় নেওয়ার পথকে, কান্নায় ধুয়ে দিতে এসেছে।

মনীশ একটু এগিয়ে গেল তাদের কাছে। সামনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ একজনের কাছে গিয়ে বলে—তোমরা দেখবে···ডাক্তার সাহেবকে? —অবাক হয়ে যায় বুড়ো—আবেগে মনীশের হাত জড়িয়ে ধরে। মনীশ বলে—তোমাদেরি আপনজন ছিলেন তিনি। এস, কয়েকজন করে এস। আনন্দে ভরা, ভীরু একমন নিয়ে—এক-এক দল

করে—তারা দরজার কাছে এল। মাথা নত করে শেষ নমস্কার জানালো। তাদের মুখের ভাব আর চোখের জলে, মনীশ পড়ে নিতে পারলো যে এতদিন ধরে মামা কি পেয়েছেন। অনেক দেয় ওরা, দিয়েছিলেন মামা। মৃতদেহের প্রতি ভালবাসা আর শ্রদ্ধার ভার অর্পণ করে শান্তির পরম প্রার্থনা জানিয়ে গেল তারা।

মনীশকে অনেক কিছু বুঝে নিতে হয়েছিল সুবোধ হালদারের কাছ থেকে। মামার উইল সম্বন্ধে, আমার দান সম্বন্ধে। এই বাড়ী আর লাইফ ইনসিওরের পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছেন মনীশকে। ডিসপেনসারী ও দোকান, মনীশ যদি ইচ্ছা করে আগের মত নিয়মেই চালাতে পারে। মাসিক বেতন ছাড়াও বছরে লাভের একটা অংশ বরাবর পেয়েছেন সুবোধ হালদার। যে কৃশ্চান সমাজ সম্বন্ধে উদাসীন মনে হয়েছিল, সেই সমাজের অতি দরিদ্রদের শিক্ষার জন্য বাকী সব টাকাই দান করে গিয়েছেন। পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি নিজেই। স্কুলের বালক-বালিকা আর উচ্চ শিক্ষার জন্য ছাত্রদের মাসিক সাহায্য। চাকর সেব্যাল সিংকে আড়াই হাজার টাকা ও লুটানকে এক হাজার টাকা। সুবোধ হালদারের বলে যাওয়া সব কিছু শুনে মনীশ বলে—আমার এখনও কয়েক মাস বাকী আছে কোর্স শেষ করতে। যেমন সব কিছু চলছিল, চলুক। সেব্যাল সিং থাকুক বাড়ীর চার্জে। লুটান থাকুক—আমি তো কয়েক মাস বাদেই আসছি। একটু থেমে বলে ভেবেছিলাম মামা আছেন। কিছুদিন চাকরী নিয়ে বাইরের জগৎটা ঘুরে দেখবো। ওখানে একটা চাকরী প্রায় ঠিকও করা আছে—দেখি কি করি।

—আপনি এখানে প্র্যাকটিশ করলে, কিছু পেশেণ্ট প্রথমেই পাবেন।

—মামার মত হাত যশ নাও তো হতে পারে…

—আমার মনে হয় আপনারও হবে। আপনি জেনারেল লাইনেই থাকবেন তো?

—কিছু ঠিক করিনি। আমি পরশু দিনই রওনা হব কিন্তু।

একটু থেমে, সুবোধ হালদার বলে—জামতাড়ার শশীনাথ রায়কে একটা খবর দিতে হবে।

মনীশ খুব অবাক হয়ে যায়—বলে, কেন? কি খবর?

অবাক হয়ে যান সুবোধ হালদার। ঠিক বুঝতে পারে না, মনীশবাবু কিছু জানেন কিনা। সেটা বুঝবার জন্যেই বলে, তিনি ছিলেন ডাক্তার সাহেবের বাল্যবন্ধু, এ ছাড়া·· ডাঃ সাহেব কি আপনাকে কিছু বলেন নি?

এতক্ষণে মনীশ মনে করতে পারে···মামার সেইদিনকার কথা-গুলো। কোথায় কোন, এক বছর বয়সের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের কথা। মনীশের যেন ধারণা সেই মেয়েটি এখনও সেই এক বছরেরই রয়ে গিয়েছে।

চটপট উত্তর দেয় মনীশ, হ্যাঁ বলেছিলেন, কিন্তু আমার সে বিষয়ে ভাববার দরকার নেই। আমি মামার মত জীবন কাটাতে চাই। তবে, মামা নেই, তাঁর মৃত্যু সংবাদটা দিতেও পারেন।

—আপনার মতামত জানানোটা সবচেয়ে জরুরী বলেই আমাকে বলেছিলেন ডাঃ সাহেব, আর সেটা যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।

—আপনার কথাটা ভাল বুঝতে পারছি না। মামা তো কিছুই বলে যেতে পারেন নি।

—ডাঃ সাহেবের এই ড্রয়ারের মধ্যে তাঁর রোজকার কথা লেখা খাতা আছে। মাঝে মাঝেই বলতেন, আমার যদি হঠাৎ কিছু হয়, তবে আমার খাতা থেকে সব কিছু জেনে নিও।

এছাড়া যে চেঞ্জে যাবার আগে—দুটি কাগজে আমাকে আপনাকে ওঁর আদেশ ও মতামত লিখে গিয়েছিলেন। তাতেই লেখা আছে মনীশের মতামত জেনে—জামতাড়ার শশীনাথকে জানাবে। সে বহুদিন অপেক্ষা করেছে। তবে আমার বিবেচনায় হয়, এটা আপনার নিজের জানানোই ভাল, যতই হোক আমরা কর্মচারী।

...নাশের কাছে এ পরামর্শটা ভালই মনে হল। তবে তাই হবে, আমিই তাঁদের জানিয়ে দেব।

যতদিন আপনি না আসেন, ততদিন মিত্তির সাহেবকে ডিস-পেনসরীতে বসাবার ব্যবস্থা করেছি।

—ওটার সব কিছুই আপনার ভার। আপনি দেখবেন তো?

—শেষ দিন পর্যন্ত দেখবো বলে অঙ্গীকার করেছিলাম। মনীশবাবু স্মরণ করবে। এখানকার লোক আমরা। বাবা সামান্য চাকরী করে। অনেকগুলো ভাই বোন। পড়াশোনা কিছুই করতাম না—প্রতি ক্লাশেই ফেল করে করে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠতেই কুড়ি বছর বয়স পার হয়ে গেল। বাবা এদিকে কুলাতে না পেরে বসত ভিটেটাও বন্ধক রেখেছিল। তার নালিশ হয়ে সমন জারী হয়ে গিয়েছে—উচ্ছেদ হবে। বাবার অসুখে ডাঃ সাহেব দেখতেন তাঁকে। বাবা হাঁও-মাঁও কেঁদে বলে—ডাক্তারবাবু—আমাকে আর বাঁচবার অসুধ দেবেন না, মরবার অসুধ দিন—এই ভিটেটায় যেন মরতে পাই। আমি তখন দুবার ফেল করে আড্ডা মেরে বেড়াই। একটা পয়সা আনবার চেষ্টা নেই—কি করে চলছে সে খবর রাখিনে। বাবার সেই কান্না শুনে ছোট ছোট ভাই বোনদের দেখে—ডাক্তারবাবু কেমন যেন হয়ে গেলেন।

আমাকে ডাকলেন—বললেন, বড় হয়েছো, সংসারের দায়িত্ব নিতে পার না?—বাবাকে বললেন, কত টাকা ধার আপনার?—সুদে আসলে, কোর্ট খরচ মিলিয়ে ছ' হাজার ছ'শো মত টাকা। শুনে প্রথমটায় চুপ করে থাকলেন। তারপর আমাকে বললেন—এই টাকাটা তোমার বাবাকে দেব আমি, কিন্তু ধারটা শোধ করতে হবে তোমাকে।

—বোকার মত বলি···আমি, এত টাকা—

—হ্যাঁ, তবে শোধটা টাকা দিয়ে করতে হবে না, কেবল বিশ্বস্ত থাকতে হবে। তোমার মত একটা ছেলেই দরকার আমার। খাটতে পারবে তো? চল আমার সঙ্গে।

তাঁর কথায়—কি যে ছিল···বাবা এগিয়ে এসে ডাঃ সাহেবের পা জড়িয়ে ধরলেন—বললেন, ওরে তুই প্রতিজ্ঞা কর—ডাক্তারবাবু, আমায় জীবন দিলেন, আমি যে আত্মঘাতী হব পণ করছিলাম। এক কথায় এতগুলো টাকা দেবেন, আমি অন্যরকম হয়ে গেলাম। তাঁকে কথা দিলাম। তারপরে যতই তাঁর সঙ্গে থেকেছি, ততই অন্য মানুষ হয়ে উঠেছি। সেদিনকার সেই ছোট্ট বিশ্বাস ফার্মেশি আজ কত বড় হয়ে উঠেছে। আটাশ বছর তাঁর কাছে থেকে এই বিশ্বাস ফার্মেশি গড়ে তুলেছি। হয়তো ওঁর লেখার মধ্যেও পাবেন দেখতে. এটাও লেখা আছে।—সুবোধ হালদার বার হয়ে গেলেন।

মনীশ জানে, এই জোড়হাট সহরে, বসতবাড়ী নতুন করে করেছেন সুবোধ হালদার। ভাই বোনদের মানুষ করা, বিয়ে দেওয়া সব কিছুই করেছেন। নিজের তিনটি ছেলেমেয়ে, তাদের লেখাপড়া ভালভাবেই চলে। দোকানে আয় ভালোই হয়। সুবোধ হালদারের কথা যাক। এখান থেকে যাওয়ার আগে জামতাড়ার সেই ভদ্রলোক-কে চিঠিটা দিতে হবে। রাত্রে খাওয়ার পরে মনীশ চিঠিটা লিখে রাখলো।

প্রথমে মামার মৃত্যু সংবাদ। এবং তার ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ হওয়ার পরে জানানো সংবাদের উত্তরে তার মত হচ্ছে সে বিয়ে করবে না। সে মামার মত জীবনই কাটাবে সুতরাং সেই ছোটবেলার দেওয়া কথার উপরে যেন তিনি কোন আশা না রাখেন। সে বিবাহ করবে না।

—চলে আসবার আগে মনীশ ড্রয়ার থেকে, মামা চেঞ্জে যাওয়ার আগে ও ফিরে বসে, নিজের অভিপ্রায় জানিয়ে, যা লিখে রেখে ছিলেন, সেই বড় খামখানা সঙ্গে নিয়ে এল।···কোর্ট, উইল, ইত্যাদির ব্যবস্থা যা করবার সুবোধ হালদার করবেন। আর বর্তমান খরচের টাকাও ডিসপেনসারী থেকেই চলে যাবে। মামার লেখা খামখানা

বলতে মনীশের একটু ভয় ভয় করছিল। মামার শেষ মতামত সম্বন্ধেই তার ধারণা বদলে যাচ্ছিল। সমাজ নিয়ে মাথা সে কোনদিন ঘামায় নি। মেলা-মেশাও তাদের কারো সঙ্গেই ছিল না বলা চলে। তবে কলেজে পড়ার সময় তার ধারণা হয়েছিল, এই কৃশ্চান সমাজকে মামা ঘৃণা করেন। তারপর সেই কথাটা,—"আমি চাইনি, যে আমার বংশ থাকুক"। মৃত্যুর পরে, সেই সমাজের জন্য, সব টাকাই দান করেছেন।

—তা হলে? ডাক্তার মানুষ, কঠিন হৃদয় রোগের আভাস পেয়ে জীবনের আশঙ্কার চিন্তার মধ্যে, সমাজের প্রতি করুণাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। না মতই বদল করেন? তবে কি তিনি, মনীশকে বিবাহ করতেই অনুরোধ করে গিয়েছেন? বিবাহ, এ নিয়ে মনীশ কোন দিন ভাবে নি। তবু আজ সে কথা ভাবতে গিয়ে ভয় পেল। তার বিবাহ যদি তার বাবার মতই ভাগ্য পায়। একজন তিরিশ, একত্রিশ বছর বয়সে, স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করে নেয়। যে বাবাকে জ্ঞান হবার পরে আর মনে করতে পারে নি,—যাঁর বিষয়ে প্রায় কখনও কিছু চিন্তা করে নি···তাঁর আত্মঘাতী হওয়ার বেদনা আজ বড় জটীল হয়ে মনীশের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে তুললো। তার নবীন যুবক মনে··· কেবল বিবাহেঅনাগ্রহী নয়, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে কোন আকর্ষণ থেকে বহু দূরে রেখে ছিল। হঠাৎ মনের চিন্তাকে সরিয়ে মামার লেখা চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করলো।—লোকে আমাকে কৃশ্চান সমাজের বিরোধী বলে ভাবতো। সে সমাজকে আমি ঘৃণা করি বলে জানতো। নিজের সমাজকে, নিজের ধর্মের আপন জনকে শ্রদ্ধা করতে না পারা বড় গ্লানির। আমি তা সারা জীবন দিয়ে বোধ করেছি। ব্যক্তিগত ভাবে কোন ঘৃণা আমার ছিল না বরং জীবনের শেষ প্রান্তে বসে স্বীকার করছি, ভারতবর্ষের অগণিত হিন্দুর মধ্যে একজন না হয়ে, সৌভাগ্য শালী সেই সমাজের একজন না হয়ে, দারিদ্র্যপীড়িত, মুষ্টিমেয় কৃশ্চানের মধ্যে একজন হয়ে ছিলাম। যার জন্য এদের কথা, এমন

করে অনুভব করেছি।—মনীশ, যদি অর্থ ও সম্পত্তির মত, চিন্তা, বোধ শক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে দেওয়ার ক্ষমতা মানুষের থাকতো,—তাহলে আমার এই গ্লানির বোধ তোমাকে দিতাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সমস্ত কিছুর গ্লানি কাটিয়ে ওঠা যায় শিক্ষার প্রভাবে। শিক্ষাই সব মানুষকে নৈতিক চেতনা দেয়। কিন্তু এই কঠিন কাজ একা কোন মানুষের সাধ্য নয়, তাই নিজের যেটুকু ক্ষমতা, তাই করেছি। তুমি তোমার বিচার বুদ্ধি দিয়ে যা বোধ করবে, সেই অনুসারে জীবনের পথে চলো। অন্তরবোধকে অতিক্রম করা যায় না। সব সময়ে নিজের অবস্থায় সুখী থাকতে চেষ্টা করবে। সুখ পাওয়ার ও একটা চেষ্টা থাকা দরকার। ডাক্তারের জীবন সেবা ব্রতের, মানুষকে কান্না থেকে হাসিতে পৌঁছে দেয়, আবার নিষ্ঠুর খেলা নিরুপায় হয়ে দেখতে হয়। জীবনে সত্যের পথ খুঁজে নিও। লোভ ও লালসা থেকে দূরে থেকো। কিন্তু রক্তের সম্বন্ধে—এই বিশাল পৃথিবীতে—তুমিই আমার একমাত্র আত্মীয়। মনীশ, আজ এই অসুস্থ অবস্থায় বুঝতে পারছি, আপন জন কি। রক্তের টানের শক্তি কতখানি। আশীর্বাদ, মনীশ। আমার হৃদয় ভরা, সমস্ত শক্তির আশীর্বাদ তোমার ওপরেই। ইতি মামা।

অভিভূত হয়ে গেল মনীশ। শুধু হৃদয় মন নয়, চোখের পাতাও কোমল হয়ে উঠলো। মা পায়নি সে, বাবা পায়নি কিন্তু মামাকে পেয়েছিল। গাড়ীর জানলা দিয়ে বাইরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে রইল মনীশ। এই বিশাল, বিপুল পৃথিবীতে, সে আজ একা। এই প্রথম, যেন মনে করল,—মামা নেই। জোড়হাটের স্বনামধন্য পরমেশ ডাক্তার, তিনিই নন কেবল, —যিনি মনীশের মামা—তিনিও নেই।

লেখাকে রওনা করিয়ে দিয়ে ফেরবার পথে কিছুই যেন ভাবেনি লতা। গাড়ীর মধ্যে হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে ছিল। ছৈতে হেলান দিয়ে, সুরবালা দেবী মনে মনে, লেখার প্রথম সংসার জীবনের

কল্যাণ প্রার্থনা করছিলেন। ধীরে-ধীরে সমস্ত পথটা পার হয়ে কখন যে বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী দাঁড়িয়েছে, তা দুজনের একজনও টের পাননি।

গাড়ী থেকে ধীরে ধীরে নেমে এলেন দুজনে। শশীবাবু জেগেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে লেখার ঠিকমত ওঠা, জিনিসপত্র তোলা গাড়ীতে জায়গা ছিল কিনা, ইত্যাদি কয়েকটা কথার পর-যে যার ঘরে চলে গেলেন।

আজ সুরবালা দেবী লতাকে ডাকলেন—আয় আমার কাছে শুয়ে থাকবি, একা-একা ভাল লাগবে না।

—না বড়মা, আজ আমি একাই থাকি। লেখা নেই এটা ভাল করে বুঝতে চাই।

একটু ভিন্ন প্রকৃতির ভাইঝিটিকে বড় ভালবাসেন, সুরবালা দেবী। বড় মায়া হয়, ভাগ্যের কৃপায় লেখা সুযোগ্য স্বামী পেল বিনা চেষ্টায়···আর এই মেয়েটা···প্রায় জন্মের সময় থেকে যার স্বামী ঠিক করে রাখা হয়েছিল···তা সবই বেঠিক হয়ে গেল। আবার কোথা থেকে এর যোগাযোগ হবে, কে একে তেমন করে বুঝবে···দূরে চলে যাওয়া মেয়েটির চেয়ে, তাই কাছে থাকা মেয়েটির চিন্তাতেই সুরবালা দেবীর মনটা টনটন করে উঠলো। বিছানায় শুয়ে পড়ার পরে, বুকের ওপর দুহাত রেখে, পরম পিতার কাছে আর একবার প্রার্থনা জানালেন সুরবালা দেবী।

নিজের ঘরে এসে শুতে পারলো না লতা। খুব কম করে রাখা টেবিল ল্যাম্পটা, ঘরের অন্ধকার দূর করতে পারেনি। সেই অল্প আলোর অন্ধকারের মধ্যে লতা চুপ করে বসে রইল। কনুই দুটি টেবিলের ওপরে রেখে, হাত দিয়ে, চোখ চেপে বসে—কত এলো মেলো চিন্তা করতে লাগলো।

লাল পাহাড়ের ওপর দেখা এক স্বাস্থ্যবান যুবক, রূপবান নয়, কিন্তু বুদ্ধিমান। উদ্দীপ্ত স্বাস্থ্যের সঙ্গে প্রদীপ্ত বুদ্ধি প্রখর হয়ে আছে

হাসির প্রসন্নতায়। নির্জন স্থানে থাকলেও, জনবহুল স্থানেও বাস করেছে সে, জীবনে এই প্রথম একজন পুরুষ মানুষ দেখলো, তা ঠিক নয়, তবে যে মুখ প্রথম দর্শন দানেই, মনে রেখাপাত করাতে পারে, তেমনি একজনকে দেখেছিল। সচেতন মনে নিজের বলিষ্ঠ ছাপ রেখে যায়,—সেই মানুষটির কথা ভাবতে গিয়ে, আবার যে চিন্তা কিছুতেই আনবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল—ধ্যান ধারণাহীন, আকৃতি হীন আর একজনের কথা মনে করল।

—লেখার স্বামী।—এই স্বামী কথাটা লতা জানে না বটে, তবে অতি শিশুকাল থেকে জানতো—তার বিয়ে হবে। তার বিয়ে হবে, একজন ডাক্তারের সঙ্গে। সেই ডাক্তার কথাটা। প্রথমে নাম হয়ে, তারপরে ক্রমশঃ একটা মূর্তি হয়ে গড়ে উঠেছিল লতার মনে। বিয়ে জিনিসটা কি, সেটা ভাল করে জানবার আগেই জেনেছিল তার বিয়ে হবে।—প্রথম জেগে ওঠা, কিশোরী মনের রং দিয়ে, সেই ডাক্তার নামের মানুষটিকে রাঙ্গিয়ে, ষোড়শী কাল পর্যন্ত চলে আসার পরেই—সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়েছিল। তবু ঘনিষ্ঠ ভাবে জানা, একখানা মুখের আড়াল থেকে—অজানা, অচেনা একটা ছায়া ভেসে আসছে কেন? সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করে কেন বলে উঠতে চাইছে—ডাক্তার, ডাক্তার ··বিয়ে হবে, আমাদের বিয়ে হবে।

অনেকক্ষণ এইভাবে বসে, এলোমেলো চিন্তা থেকে জোর করে উঠে পড়ে লতা। বিছানায় শুয়ে, লেখার শূন্য স্থানটায় হাত বাড়ালো। তারপর পাশ ফিরে ঘুমুতে গিয়ে—কান্নায় ভেঙে পড়লো। নীরব কান্না। বহু দূরে থাকা—অচেনা একজনের প্রতি অবুঝ অভিমানে কান্নার পরে···চুপ করে থাকতে থাকতে ভাবে, আর একখানি, হাস্যোজ্জ্বল মুখ। মাঝে মাঝে বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে লতার কাছে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতো। এবার মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো সে। কেন কি দরকার ছিল এই ভদ্রতার - এই বন্ধুত্বের সৌজন্য তার—লতা কি কেবল, বন্ধুত্বের পাত্রী হতে পারে—করুণার পাত্রী হতে পারে?

না, সে কিছুই চায় না,···কারো কাছেই কিছু পাওয়ার আশা সে রাখে না। লেখাপড়া শেষ করে অনেক দূরে থাকবে সে, একেবারে একা থাকা। একা একা শুয়ে থাকতে থাকতে—এই কথাই ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

আর কয়েক দিন পরে, লতা পাটনা রওনা হয়ে যায়। সেখানে, তাদের অতি পরিচিত এক পরিবারে কয়েক দিন থাকবে, কলেজ ভর্তি হওয়া হলে, ওখানে একটি মেয়েদের থাকবার প্রতিষ্ঠানে থাকবে। লেখার কাছে—লতার চিঠি আসে মাঝে মাঝে। লেখাকে নিয়ে নতুন সংসার পেতে দিন বেশ কেটে যাচ্ছিল। সংসার পরিচালনায় লেখা বেশ সুপটু। অনর্থক ব্যয়বাহুল্য সে ভালবাসে না,—তাই আমার কথা মত, রাতদিনের জন্য কোন লোক সে রাখেনি, একটি ঠিকা লোক রেখেই নিজের সংসার চালাচ্ছে।—মাঝে মাঝে দাদাদের বাড়ী যাই, মানিকদা চিত্রাদি প্রত্যেকের সঙ্গেই যাতায়াত চালু হয়েছে, ইতিমধ্যে আরও ছমাস চলে গিয়েছে। সেদিন বাড়ী ফিরতেই দেখি, লেখা একটু চিন্তিত। তার মুখ দেখে বলি—কি ব্যাপার—চিন্তার ছায়া কেন মুখে—

লেখা কোন উত্তর না দিয়ে—মুখটা আরো নীচু করে।

কি হল? লেখা—

লেখা তার স্বভাব মত দুহাতে মুখ ঢাকে—বলে জানি না, জানি না।

কয়েক সেকেণ্ড ভেবে বুঝতে পারি, কয়েক দিন আগেই যে সন্দেহ লেখা করেছিল, এখন তাতে নিঃসন্দেহ হয়েছে।

একটু হেসে বলি—বেশ গুরু দায়িত্ব কাঁধে তুলে দিচ্ছ তো?

—বাঃ আমি দিচ্ছি না, তুমি দিচ্ছ—

—বেশ তো—দুজনেই দুজনকে দিচ্ছি—তাহলেই হবে তো। খুশী?

—খুশী···কিন্তু, কেবল খুশী নিয়ে থাকলে চলবে না। যাই, চা

করে আনি। লেখা রান্না ঘরে চলে গেল।

হঠাৎ একরাশ ভাবনা যেন আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেল। ছিলাম একজন, হলাম দুজন—আবার তৃতীয় জন আসবার সম্ভাবনা এই নিয়েই সংসার।···তবু সব মিলিয়ে ভাল লাগলো। অনেক বন্ধুদের ··ছোট ছোট ছেলে মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল।···

চা খাবার নিয়ে এসে লেখা বল্ল—আমি কিন্তু বড়মাকে লিখতে পারবো না···

—ওঃ তাইতো, জানাতে হবে···কিন্তু আমি কি করে জানাবো? এ এক সমস্যা। এরপরে নতুন সম্ভাবনাকে একটু দূরে রেখে··· আমাদের নিত্য দিনের আলাপে প্রলাপে মগ্ন হয়ে গেলাম। পরের দিন, অফিস যাওয়ার আগে লেখা ঘরে এল, বলল—আচ্ছা খবরটা বড়দি জানিয়ে দিতে পারেন না?

—কোন্ খবর?

—আহা···কোন্ খবর···আমার কথাটাই উল্টে বলে লেখা, তবে অন্য সুরে—

--ওঃ তা ভালই বলেছো—সেটাই ভাল হবে। আচ্ছা আসি—বলে অফিস রওনা হই।

অফিসে এসে, মনে হল প্রাথমিক পর্বটা ফোনে সেরে নিলে কেমন হয়? মেজদার দৌলতে আজকাল একটা ফোন আছে বাড়ীতে, অফিস থেকেই দেওয়া। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোনে ডায়াল করি। হ্যালো, ফোন ধরেন বড় বৌদিই—কে, বীরু···কি ব্যাপার?

—কেমন আছ তোমরা···

—ওঃ এই কথা, ভালই, তোমরা কেমন আছ? লেখা?

—সবাই ভাল আছি···তবে একটু চিন্তায় পড়েছি।

—কি চিন্তা—কিসের চিন্তা—

—সাংসারিক খবর পেলাম, জনসংখ্যা নাকি বাড়তির মুখে—

—কি সংখ্যা?—

—আমার সংসারের জনসংখ্যা—

—তাই নাকি, এতো খুবই সুখবর—তা এমন সুখবর ফোনে কেন? এসে বলতে লজ্জা নাকি?

—তা, তোমরা গুরুজন লোক তো—যাব, দু'একদিনের মধ্যেই যাব আমরা।

—হ্যাঁ নিশ্চয় এস। ছাড়ছি—তাহলে।

এর পরে আমি আর লেখা গেলাম একদিন। আর বৌদিকে অনুরোধ করলাম, লেখার বড়মাকে খবরটা জানিয়ে দিতে। এসব কর্তৃত্বের কাজ করতে বড় বৌদি বেশ ভাল বাসেন, সহজেই রাজী হয়ে গেলেন।

যথা সময়ে সুরবালা দেবীর চিঠি এল, খুব খুশী হয়েছেন তিনি এ খবরে। পরে তিনি যা লিখেছেন সে খবরে কিন্তু আমি খুশী হলাম না। লেখাকে কিছু দিনের জন্য নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছেন। প্রথম অবস্থা, এখন দিন কতক জামতাড়ায় থেকে যাক। কারণ সেখানে পরে নিতে উনি সাহস পাবেন না। বড়মার এই প্রস্তাবে লেখা খুব রাজী হল।

ঠিক এই সময়টা, তাঁর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা হওয়াটা স্বাভাবিক। বাড়ী গিয়ে বড় বৌদির মত চাইলাম,—তিনিও ওই মত দিলেন। এক দিনের মধ্যে লেখাকে রেখে আসবার ব্যবস্থা করে ফেললাম।—খুব শীঘ্রই আমাকে দেখতে যেও, আর ঠিক ঠিক চিঠি দিও—এই দুটি কথা বলে লেখা বেশ খুশী খুশী মন নিয়ে গাড়ীতে ওঠে। এবার আর আমাকে যেতে হয় নি, দিনের গাড়িতে ফিমেল কম্পার্টমেণ্টে লেখা নিজেই গেল।

লেখা যাওয়ার আগেই কাজের লোক কমলাকে বলে, ওরই চেনা একটা ছোকরা চাকরকে ঠিক করে গিয়েছিল, এখন দুবেলা আমার রান্না করে দেবে, আর লেখা ফিরে এলে,—দিন রাতের মত থাকবে। প্রথমে কথা হয়েছিল, লেখা মাস দুই থাকবে,···কিন্তু

দু সপ্তাহ যেতে না যেতেই লেখা আমাকে জানালো তার ওখানে মোটেই ভাল লাগছে না, সুতরাং একটা ব্যবস্থা করতে।···অবশ্য এটা ঠিক, সহর কলকাতা যাদু জানে, তার আশ্রয়ে কিছু দিন কাটালে, তার মায়া কাটান মুস্কিল, তবু কেবল সহর নয়, এর মধ্যে সেই সহরের বিশেষ একজনের জন্যে মন উতলা করাটা ভালই লাগলো।—তবু লিখলাম—কি চমৎকার নির্জন পাহাড়তলী গ্রাম, লাল পাহাড়, অজয় নদ,—খোলা হাওয়ায়, দেহ ও মন দুই স্বাস্থ্য লাভ করবে, ব্যস্ত কেন? প্রিয় জনের দেহ-মন ভাল থাকলে আমিও ভাল থাকবো—ইত্যাদি।

প্রিয়া কিন্তু তুষ্ট না হয়ে রুষ্টই হলেন—লিখলেন, আমি তোমার মতন বা লেখার মতন কল্পনাবিলাসী নই। জড় পাহাড় বা স্রোত তনু নদী আমার প্রিয়জন নয়,···আমি বাস্তববাদী। মানুষ নিয়েই থাকতে চাই। এমন ব্যবস্থা কর, যাতে বড় মা কিছু বুঝতে না পারেন, অথচ আমিও যেতে পারি।—এ সময়ে তো, ডাক্তার দেখানোর একটা কথা তুলে উপায় করতে পার।—

স্ত্রীলোককে বুদ্ধিহীন বলেছিল কোন্ পুরুষ? অনেক ব্যাপারে তাদের ক্ষুরধার বুদ্ধি। তৃতীয় সপ্তাহটা বাদ দিলাম, চতুর্থ সপ্তাহের শেষে, জামতাড়াগামী ট্রেনে চাপলাম। যাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক করাই ছিল। লেখা এই থাকার মধ্যে লতা আসতে পারে নি। তবে, বড়মার চিঠিতে লেখার খবর পেয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন উচ্ছ্বাস বা মন্তব্য করেনি সে। আজকাল বড় সংক্ষিপ্ত চিঠি দেয় সে। লেখা বলল, পড়া-শোনা, নিয়ে ব্যস্ত থাকে।—বড়মার বিশ্বাস, যে লেখা না থাকার ফলে ওর আর এখানে কিছু ভাল লাগে না,—তাই দু-এক দিনের জন্য আর ছুটে ছুটে আসতে চায় না। সুযোগ বুঝে বড়মার কাছে কথা তুললাম,—লেখাকে নিয়ে যাওয়া দরকার।

আপত্তি করলেন না তিনি। পর দিনই আমি লেখাকে নিয়ে

আবার রওনা হলাম।—এই অল্প সময়টুকু থাকার মধ্যেও আমি যেন অনুভব করলাম,—লতা এখানে নেই। মরশুমী ফুলে ভরা বাগানের কাছে কিংবা লতায় ঘেরা কুঞ্জ মাঝে, লতা নেই। লেখা এ বাড়ীতে ঘুরতো ফিরতো চঞ্চল ভাবে, কিন্তু চুপচাপ নীরব ভাবে থাকা একটি উদাসী মেয়েও একটি পাশ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো,—অপরিচিতার মত, এই বাড়ীতে আসার পরে, তার কথাও বারে বারে মনে পড়েছে। মায়া জাগানো মন নিয়েই তাকে অনুভব করেছি।—

ভাল ভাবে থাকবার, চলবার ফিরবার বহু উপদেশ, বড়মা লতাকে দিলেন। যদিও এব্যাপারে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা নেই। বার বার ডাক্তারের উপদেশ মত যেন থাকে লেখাকে বলে দিলেন। শশীবাবু, আমাকে দেখে যেমন খুশী হতেন তেমনি হলেন। অনেক তরিতরকারি ঝুড়ি ভর্তি করে দিলেন। আসবার সময় স্টেশান পর্যন্ত এলেন।

লেখা আসন্নপ্রসবা, বন্দোবস্ত যা করবার সবই সুচারু ভাবে করা আছে। লেখা নিজেও ভাল আছে, সব কিছু ঠিক করেও বড়মাকে আনিয়েছি ডাক্তারের ডেট দেওয়ার প্রায় মাসখানেক আগে। পুরানো চাকর, অন্য লোকজন সব পুরানো, শশীবাবুর অসুবিধা হবে না কিছু। বড়মাও খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন আমার প্রস্তাবে।

নির্দিষ্ট দিনের প্রায় দশ দিন আগেই লেখার শরীর খারাপ বোধ হল।—তখুনি হস্‌পিটেলে নেওয়া হল। সেখানে দু দিন থাকার পরে ডাক্তার বললেন, দেরী আছে, ইচ্ছা করলে কদিন বাড়ী যেতে পারেন। লেখাও সুস্থ হয়েছিল একটু। কিন্তু আমি রাজী হলাম না,—যতই হোক, সময় যখন হয়ে এসেছে, এখন এঁদের চোখের সামনে থাকাই ভাল। কেবিনে তেমন কষ্ট হবে না, এই সব বুঝিয়ে তাকে হসপিটেলেই রেখে দিই। সঙ্গে থাকলেন ওর বড়মা। বৌদিরা এ সময় যথেষ্ট করেছিলেন। সর্বদা খবর নেওয়া, খাবার পাঠানো, পালা করে থাকা, যা করা উচিত সবই করে ছিলেন।—

ছ' দিন থাকার পরে লেখার শরীর আবার খারাপ হল—এবং দুদিন ধরে দারুণ কষ্ট পাওয়ার পরে লেখার পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হল,—কিন্তু ওই পর্যন্ত। মাতৃগর্ভ থেকে মুক্তি লাভ করবার পর কয়েক মুহূর্ত মাত্র জীবিত ছিল। লেখার প্রথম সন্তান পৃথিবীর আলোর দিকে তাকায় নি।

জানি না, কোন্ পাপে, একজন জননী তার প্রথম সন্তানকে হারায়। লেখাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা, আমার এবং অন্য কারও ছিল না। কোন কথা না বলে নীরব কান্নায় লেখা ভেঙ্গে পড়েছিল। শূন্য কোলে, বাড়ী ফিরে আসার পরে, দু মাস পার হয়ে গিয়েছে, তবু তার শরীর ও মন ভাল হল না। বড়মার পক্ষে আর থাকা আর সম্ভব নয়। লেখার মত নিয়ে আমি প্রস্তাব করলাম যে, লেখা তাঁর সঙ্গে যাক। বৌদি, দাদারাও সেই মত দিলেন, এই সময় জামতাড়ার জল হাওয়া ভাল,—শরীর ভাল হবে। অল্প অল্প জ্বর ভাবটা, না যাওয়াত বেশ ভাবিত ছিলাম, রাজী হল লেখা। লেখা জামতাড়া চলে গেল। তার কিছু দিন পরে, টেষ্ট পরীক্ষা দিয়ে লতাও এসে গেল। আবার দু'জন একত্র হওয়ার খবরে আমি খুশীই হলাম। তিন মাস হয়ে গিয়েছে, খবর পেয়েছি লেখার শরীর বেশ ভালই আছে।—লেখাকে দেখতে যাবার ইচ্ছায়, ক'দিনের ছুটি নিলাম।···

আমি যখন গেলাম, লতা তখন নেই, সে পরীক্ষার জন্য তৈরী হবে বলে বেশ কিছু দিন আগেই চলে গিয়েছে, খুব শীঘ্রই তার পরীক্ষা। লেখাকে খুশী করবার জন্যে, প্রায় দশ দিনের ছুটি নিয়েছিলাম। আমাকে দেখে, লেখার প্রথম কথা—

—ক'দিন থাকবে তো?—আমার আর এখানে ভাল লাগছে না।

—থাকবো, তোমার কাছে থাকবো বলেই দশদিনের ছুটি নিয়েছি।

—আমাকে কবে নিয়ে যাবে—

নিয়ে যাবই তো,—তবে তোমার জ্বরটা বন্ধ হয়ে এখনও এক মাস হয়নি—এখনও খুব রোগা তুমি—আর একটু সেরে ওঠ—তোমার শরীরটা ভাল হওয়াই আগে দরকার, না-হলে একা-একা কি আমারি ভাল লাগে?

লেখা বেশ খুশী হল।

দিন দশের ছুটি, কথাটা লেখাকে বলা ঠিক হয়নি। দুদিন যেতে না যেতে আমি হাঁফিয়ে উঠলাম। একটিও কথা বলার লোক নেই, খবরের কাগজখানা পর্যন্ত নেই। একা লেখার সঙ্গে কতক্ষণ কথা বলবো। তারও স্নান-আহার আছে। দুর্বল বলে বিশ্রাম আছে। এখানে এদের একটা আলমারীতে কিছু বই আছে। অতি পুরানো সেই ডরোথী মেম সাহেব আর সুকুমারি রায়ের আমলের বই। আর কিছু ধর্মপুস্তক, কিছু পাঠ্যপুস্তক, সেক্সপীয়র আর মিলটন কয়েকটা বাজে গল্প বই—তাও আমার পড়া বলাই চলে। সেদিন দুপুর বেলা, খাওয়ার পরে সকলেই যখন ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন, আমার ঘুম এল না। সকাল থেকেই শুয়ে শুয়ে কাটছে। উঠে এসে পুরানোগুলোই আবার দেখবার জন্যে আলমারি খুললাম। পুরানো বই এর পেছনেই মনে হল, দু'খানা নতুন বই, আগ্রহে হাতে নিয়ে দেখি, না-বই নয় খাতা বাঁধান খাতা। পাতলা আর নতুন ধরণের বই এর লম্বাটে আকারের। সাধারণ ভাবে উল্টে দেখতে গিয়ে দেখি লতার নাম লেখা,—আর লতারি হাতের লেখা। তার এলোমেলো মনের কথা, যেমন সে লিখতো তেমনি বোধহয়। রেখেই দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ওই পুরানো বইগুলোর চেয়ে—দেখিই না, কি লিখেছে লতা, তার এই নতুন খাতাতে।—অন্যের ডায়েরী পড়া উচিত নয়। আমি ঠিক কৌতূহল নিয়ে পড়তে চাইনি, অলস অবসর কাটাবার জন্যে—যা হোক একটা কিছু পড়ি এই ভেবেই খাতা দু'খানা বার করে—পাশের ঘরে একটা নেয়ারের খাট পাতা থাকে সেখানে গড়িয়ে পড়লাম। তখনও একটি ভাবপ্রবণ বয়স্কা শিশু

মনের মেয়ে ভিন্ন আর কোনও ধারণা ছিল না লতার প্রতি।

এলোমেলো পাতা উল্টে যাচ্ছিলাম। টুক্‌রো টুক্‌রো কথা—লেখার বিয়ে ঠিক হয়েছে। ঘর সংসার নিয়ে বেশ সুখেই থাকবে লেখা। পাতা উল্টে যাচ্ছিলাম। বড়মা বড়মা, তুমি নিশ্চিন্ত হয়েছো তো? প্রধান লাইনগুলিই দেখছিলাম। ভেতরে কোথাও কিছু কিছু লেখা আছে—কোথাও বা প্রধান, দুটি লাইনের পরেই সাদা জায়গা। অল্প অল্প লেখার অক্ষরের মধ্যে, মাঝে মাঝে ডাক্তার কথাটা চোখে পড়েছে, আর বোধহয় কারও অসুখের কথা—রুগীর ব্যথায় মন বিকল হওয়ার উচ্ছাস ভেবে—লক্ষ্য না করে উলটে গিয়েছি।

এক জায়গায় দেখলাম—আমি জানি, লেখা সুখী হবে, খুব খুসী হবে—কিন্তু আমি—আমি, কি হব? সুখী? কেন, সে আমাকে চাইলো না···

আমি চমকে উঠলাম। একি? আমাকে উদ্দেশ্য করেই লিখেছে নাকি—তবে কি লতা মনে মনে আমাকে—না-না, আর ভাবলাম না। খাতা খানা রেখে দিয়ে চুপ করে ভাবতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও লতার আচরণের মধ্যে কথার মধ্যে, এই ধারণার এতটুকু আভাস পর্যন্ত খুঁজে পেলাম না। উপরন্তু মনে হল, এরকম একজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গ লাভের যে আকর্ষণটুকু থাকা কিছু অসাধারণ নয়, সেটুকু পর্যন্ত যেন লতার মধ্যে ছিল না। আনমনে আবার অন্য খাতা-খানা টেনে নিলাম।

এ খাতা খুলতেই প্রথম পাতাতে ওর দাদার কথা,—কত দিন হল—তুমি চলে গিয়েছো, আমরা কি তোমার কেউ ছিলাম না—সবাই চলে যায়—কেউ জগত থেকেই চলে যায়, কেউ দূরে—দূরেই থেকে যেতে চায়।

একটা পাতায় প্রায় বার দশেক একটি নাম লেখা রয়েছে—মনীশ সরকার এম বি বি এস।

কে এই মনীশ? ওদের কেউ আত্মীয়? হবেও বা। আবার দেখি—ডাক্তার, তুমি কি কোন দিন বিয়ে করবে না—কোন দিনও নয়? আমার কিন্তু তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছা করে—তুমি কেমন দেখতে।

এ আবার কি? ঘাবড়ে যাই। কে এই এম-বি, বি-এস? এই যদি লতার লিখে রাখা ডাক্তার হয়, তার সঙ্গে লতার ভালবাসা হয়েছিল—হতেও পারে—দাদার সহপাঠী কিন্তু তুমি কেমন দেখতে কথাটা কেমন? তা হলে তাকে লতা দেখে নি, পরিচয় নেই? এই সময়ে আবার মেয়েটির মাথা ঠিক কি না সন্দেহ করি। ডায়েরী নয় যে পড়লেই বুঝতে পারবো। কোনও দিন তারিখ নেই, মাঝে মাঝে একেবারে অন্য কথা।—কোন সুজাতাদি, নৃপেনবাবু, কলেজ পড়া মেট্রন মাসী আমাকে ভুল বুঝেছেন।

এক জায়গায়—বেশ, ডাক্তার তুমিও বিয়ে করো না—আমিও বিয়ে করবো না—তুমি রুগী দেখবে, আমি পড়াবো।

একটা পাতায় এসে থমকে গেলাম—ডাক্তার, ডাক্তার তুমি যদি জানতে—আমি তোমাকে কত ভালবাসি, তোমার জন্য আমার মন কত ব্যাকুল হয়ে আছে। আবার দেখি—

লেখা বলছিল, মিস্টার রস্ আমাকে ভালবাসেন, আমাকে দেখলে তার চোখ জ্বল্‌জ্বল করে ওঠে। কিন্তু তা কি করে হবে—আমি, আমি তো আর কারও হতে পারি না।

একটা ধাঁধা—আমার মনে গোল পাকিয়ে উঠলো।—কিন্তু এত ছোট,—আর এই বিচ্ছিন্ন পাহাড়তলী গাঁয়ে এরা মানুষ। এদের কি রহস্য থাকতে পারে? শশীবাবুর মতন নিরীহ মানুষের মেয়ে লতা, তাঁর মধ্যেও কোন জটিলতা নেই। প্রায় শেষ পাতায় দেখি—"যখনি এখানে বা পাটনায় কোন ডাক্তারকে দেখেছি তখনই আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছে—আছে, আমারও একজন ডাক্তার আছে। তার সেই ছোট বেলার ফটোর চেয়ে সে এখন অনেক বেশী সুন্দর

হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে দেখতে—কিন্তু আমি তো ভাবতে পারছি না। ডাক্তার, ডাক্তার—বিয়ে করা কি দোষের কাজ?

আমি লক্ষ্য করলাম, যখনি আবেগ আসে, তখনি জোড়া কথায় সম্বোধন করা হয়েছে।

কৌতূহল বড় সাংঘাতিক। আমি আবার এ খাতাখানা রেখে অন্য খাতা টেনে নিলাম। যেখানটায়, লেখার বিয়ের কথা লেখা ছিল, সেখানটা দেখলাম।

কেন সে আমাকে চাইল না। এই সে-টা কে?—

হঠাৎ দেখি সুবীরবাবু লেখাকে বিয়ে করতে চেয়েছেন।

তার পরে প্রায় অনেকগুলি পাতায় অন্য কথা, পাহাড়, গাছ, বাবা, বড়মা, হঠাৎ দেখি লেখা চলে গেল।—আমিও চলে যাব। দূরে অনেক দূরে থাকবো আমি, থাকতেই হবে। যে আমাকে দেখেনি, সেও আমাকে চায়নি, আর যে আমাকে দেখেছে সে, সেও তো আমাকে চায়নি।

তার পরের পাতাগুলি সাদা।

বুঝতে পারলাম না, এটা কি লিখেছে, লেখা বিয়ের পরেই যখন গেল—না আটদিন পরে ফিরে এসে যখন গেল।

লতার লিখে রাখা শেষ কথা কয়টি নিয়ে অর্থ করতে বসলাম; সে আমাকে দেখেনি। তাহলে সেই ডাক্তারটি লতাকে কোন দিন দেখেই নি,—এটা বড় রহস্যজনক, আর যে দেখেছে, এই যে-টি কে? সে তাহলে আমি। না, আমি লতার দিকে চোখ তুলি নি, কিন্তু লতা যাকে দেখেছিল, তাকে—তাকে কি সে চেয়েছিল—কই তার এতটুকু চাওয়াও তো প্রকাশ পায়নি কোন দিন। প্রথম থেকে শেষ অবধি ভাবতে ভাবতে, লতার শেষ দিনের গান শোনানটা মনে পড়লো—"মনে রবে কি না রবে আমারে।" কিন্তু কোন মতেই গানের ছলে প্রণয় নিবেদন করতে পারে এমন ভূমিকায় লতাকে দাঁড় করাতে পারলাম না। নিজেকেই ছোট মনে হতে লাগলো

এমন নাটকোচিত কল্পনার জন্যে। তবে কপাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকা, করুণ রসের বিন্দুগুলি তার চোখের পাতায় টলটল করছিল, সে কি আমারি নিকট থেকে পর হয়ে যাবার আসন্ন দুঃখে ?

একখানি সুন্দর মুখের উদগত অশ্রু, যে আমারি জন্যে এ কথা ভাবতে পারবার মধ্যে একটা আনন্দের বোধ থাকেই, তখনি একটা নিরুত্তাপ আনন্দ অতি ক্ষীণ ভাবে আমার মনে জেগেছিল।

সে দিন বিকেলে চা খাওয়ার পরে লেখাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা মনীশ সরকার, এম-বি, বি-এস লোকটি কে ?

লেখা বলল, কেন বলতো,—লতার কোন খাতা দেখেছো বুঝি ? সে এক মাথা পাগলা মেয়ে।

—তার সঙ্গে কি লতার—যাকে বলে ভালবাসা—

—আরে দূর—তাকে ও কোন দিন চোখেই দেখেনি, ও কেন, বলতে গেলে মামাবাবু বড়মা এঁরাই দেখেন নি।

—তবে সারা খাতা জুড়ে ডাক্তার-ডাক্তার তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। তুমি কি কোন দিন বিয়ে করবে না—এই সব লেখা রয়েছে।

—তাহলেই বোঝ, ও একদিক দিয়ে একেবারে পাগল। কি সব আবোল-তাবোল ভাবে—আর মাঝে মাঝে তাই লেখে।

—আসল ব্যাপারটা কি ?

—মামাবাবু তখন আসামে, লতা তখন এক বছরের মেয়ে, ওঁর এক বন্ধু, তাঁর ছেলের সঙ্গে লেখার বিয়ের কথা বলেন। ছেলের বয়স তখন ছ' সাত কি সাত-আট। তারপর বোধহয় ছেলেটির মা, বাবা, মারা যায়—কারণ পরে ছেলেটি জোড়হাটে তার মামার কাছেই মানুষ। মামা ছিলেন ওখানকার নামকরা বড় ডাক্তার। তিনি আবার ছোট বেলায় মামাবাবুকে জানতেন। এ ছাড়া একজন ইংরাজ মহিলার দৌহিত্র হওয়ার জন্য কৃশ্চান সমাজে মামাবাবু—বড়মা এঁদের খুব খাতির আছে, এখানে ততটা বোঝা যায় না ; পাটনা, ভাগলপুরে

থাকতে এটা বেশ বোঝা যায়।

ছেলেটির মামা আমার মামাকে জানান, বন্ধুর দেওয়া কথা মামা-বাবুর মনে আছে কি না—তবে যদি তিনি বন্ধুর কথা রাখেন তাহলে কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে, ভাগ্নে উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত তো বটেই। তাঁর ভাগ্নেকে তিনি ডাক্তারী পড়াবেন। মামাবাবু জানতেন, তাঁর কথা তিনি ঠিক রাখবেন। এই ডাক্তারের বাবা ছিলেন ওঁর অতি প্রিয়জন। ছোট বেলা থেকেই লতা শুনেছিল তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। আর যখন ওর বয়স বছর নয়েক তখন খবর এল,—ডাক্তার বিশ্বাসের ভাগ্নে ম্যাট্রিক পাশ করেছে ফার্ষ্ট ডিভিশানে, আর দুটো লেটার পেয়েছে। মামাবাবুর আর আনন্দের অবধি থাকলো না।—তখন থেকেই লতা জানলো ওর বিয়ে হবে তার সঙ্গে। তারপর ছেলেটি ডাক্তারী পড়তে গেল খবর এসেছিল। আহা, ছেলে-জামাই দুই জনেই হবে ডাক্তার, কত আশা মামাবাবুর, একটাও সফল হল না।

—কেন, ওই ছেলেটি বুঝি অন্যত্র বিয়ে করলো।

—না—দেবুদা তখন আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন, লতাও পড়া ছেড়ে এখানে। খবর এল, ছেলেটি ডাক্তারী পাশ করেছে খুব ভাল ভাবে। এখনও হাউস সার্জেনসীপ ইত্যাদির কোর্স বাকী আছে—তারপর বিয়ের কথা হবে। ছেলে ডাক্তার হয়নি, তবু মামাবাবুর মনে হয়েছিল তাঁর জামাই তো ডাক্তার হয়েছে। সেদিনও কি আনন্দ বাড়ীতে।

—তা, এত দিনের মধ্যে এদের মধ্যে দেখা-শোনা ভাব করবার কোন সুযোগ হয় নি? এখানে আসেনি ছেলেটি?

— না, ম্যাটিক পরীক্ষার পরে মামাবাবু একবার এখানে পাঠাবার কথা জানিয়ে ছিলেন ওর মামাকে। কিন্তু তিনি রাজী হন নি। তিনি খুব কড়া মানুষ ছিলেন। লেখা-পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি এ ধরনের আসা-যাওয়া চান নি। ওঁকে একবার আমরা

দেখেছিলাম, হঠাৎ এসেছিলেন।

—তারপর বিয়ে হল না কেন? ছেলেটি অরাজী হল কেন?

—তা জানে না কেউ, এর প্রায় দশ-এগারো মাস পরেই ডাক্তার বিশ্বাস মারা যান। প্রথমে তাঁর মৃত্যুর খবর দেয়, ছেলেটি তার পরে, তার জন্যে অপেক্ষা না করে মামা যেন তাঁর মেয়ের বিয়ে দেন। কারণ তার বিবাহে ইচ্ছা নেই, সেও বিয়ে না করে মামার মত জীবন কাটাবে ঠিক করেছে জানায়।

মামাবাবু জানালেন, তাঁর মেয়েটিও এখন পড়াশোনা করছে, সুতরাং এর পরে যদি তুমি মত বদল কর তো, জানিও।—আর কোন জবাব দেয় নি ছেলেটি।

—তা, লতার বিয়ে হচ্ছে না কেন?

—লতা বি-এ পাশ না করে বিয়ে করবে না, তাছাড়া এমনিই সে বিয়ে করবে না। ওর ধারণায় সেই ডাক্তার গেঁথে বসেছে। তা ছাড়া পড়া ছেড়ে এসে বাড়ীতে বসে থাকার পর আবার নতুন করে পড়তে যাওয়া হচ্ছিল না। মামাবাবু বোধ হয় ওকে দূরে পাঠাতে চান নি, ঠিক বুঝি না সেটা।

লতার বলা অন্য দিনের কথা মনে পড়লো।

লতার বিয়ে হওয়ার জের তুলে লেখা বলে, আমাদের সমাজে লতার মত মেয়ে, কত ঘর থেকেই আপনি কথা আসে। পাটনায় এক বহু দিনের ইংরাজ পরিবার আছেন। অবস্থাপন্ন, ব্যবসা পীক ফীল্ড, মিস্টার রসের তো ভারি ইচ্ছা লতাকে তার ছেলের বৌ করবেন। আর ছেলে তো লতার জন্য পাগল।

—আর লতা পাগল বুঝি ডাক্তারের জন্যে।

—লতা এমনিই পাগল, ওর আর জন্যে লাগে না। তবে মামাবাবু এই ভারতীয় ইংরাজদের পছন্দ করেন না।

আমি কেন জানি না লেখার কাছে, আর দ্বিতীয় খাতা খানার

কথা বললাম না। এর পর থেকে আমি আর লতাকে পাগল বা অপরিণত বলে ভাবতে পারলাম না। বরং সেই ছোট বেলার মনে যার সঙ্গে বিয়ে হবে ভেবে না জেনে—না চিনেই ভাল বেসেছিল তার প্রত্যাখ্যান জেনেও তাকেই ভাল বেসে চলেছে এটা আমাকে বিচলিতই করেছিল। আমি লতার খাতা দু'খানি আবার রেখে দিলাম। লেখা দেখতেও চায়নি। এসব দিকে কোন ঝোঁক লেখার নেই, লেখা অতি মাত্রায় সংসারী। এর পরে কোনমতে দিনগুলি কাটিয়ে চলে এলাম।

ডাক্তার বিশ্বাসের উইল অনুযায়ী···তার নগদ টাকা থেকে দুটি বাড়ী কেনা হল শিলং-এ। দুটোর বায়না তিনি থাকতেই হয়েছিল, তার আয় থেকে উচ্চ শিক্ষার সাহায্য দেওয়া হবে। ডিসপেনসারীর আয় থেকে প্রতিদিন দশটাকা হিসেবে রাখা হবে স্কুলে শিক্ষার ব্যয় হিসাবে অল্প মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে। এবং তাঁর শেয়ার ইত্যাদির আয় থেকে অসুস্থ ও বৃদ্ধকে কিছু সাহায্য দেওয়া হবে। ডাক্তার বিশ্বাসের জীবিত কালে সুবোধ হালদার নানাভাবে টাকা বাড়াবার চেষ্টা করে। ডাক্তারের আয়ের টাকাকে বেশ ভাল অবস্থায় এনেছিলেন। তাঁর মেজদির নামে এই তরলা স্মৃতি ভাণ্ডার। মনীশ জানতো, যতদিন সুবোধ হালদার আছেন, ততদিন সব কিছু তিনিই ঠিকমত চালিয়ে যাবেন। মনীশ এতদিন যেন জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।

এদিকের ব্যবস্থা ঠিক হওয়ার পরে—সে আসাম সরকারের মেডিকেল বিভাগে চাকরী নিল। সমাজ কল্যাণ করতে হলে, বহু জানতে হবে, এই চাকরীতে দেশে দেশে বদলী হলে তা জানতে পারা সহজ হবে। সুবোধ হালদার বলেছিলেন···মনীশবাবু আপনি যে কাজে নামতে চান, তাতে আগে সামাজিক হওয়া দরকার। বড় বাধা আসে ভাল কাজে। মনীশ, হালদারবাবুর কথাটার মর্ম বুঝতে পারে নি।

হিন্দুই হোক, আর কৃশ্চান হোক, ডাক্তার হও আর উকিল হও,

যে কোন লোকের কাছেই যদি বাইরের থেকে তার পারিবারিক খবর জানতে চাও····তা ক্রমশ বিরাগের কারণ হয়ে দাঁড়াবেই।···· কিন্তু একজন স্ত্রীলোক অতি সহজেই জেনে নিতে পারে প্রতিবেশী বা বান্ধবীর সাংসারিক খবর।

শিলচরে থাকবার সময়ে ওখানকার কয়েক ঘর কৃশ্চানের সঙ্গে মণীশের আলাপ হয়। মণীশ তাদের মারফত সামাজিক পরিবেশ জানবার জন্য একটু মেলামেশা করেছিল। কেউ কেউ মণীশের ইচ্ছাকে সৎ ইচ্ছা বলে ভাবলেও, অন্য অর্থ করবার লোকের অভাব ছিল না, যে বাড়ীতে বয়স্থা মেয়ে আছে তারা। আর তারা কতদূর পড়া-শোনা করছে····কারও বন্ধ আছে কেন? কোন বাড়ীর ছেলে বসে আছে কেন····কাজকর্ম না করে—এ সব খোঁজ খবর নেওয়া····অর্থাৎ হাঁড়ীর খবর ডাক্তারের জানতে চাওয়া কেন? ছেলেপিলের পড়তে চাওয়ার টাকা সাহায্যের পেছনে এই যুবক রূপবান ডাক্তারের কি মতলব····ওই সব। শুধু শিলচর নয়, অন্য খানেও দেখেছে। দেখেছে অন্য রকম ও—ডাক্তারের জন্য শশব্যস্ত পরিবারের দল। তাদের আপ্যায়নের ঘটা। একা থাকে····চাকরে রান্না করে, সুখাদ্য খাওয়ার নেমন্তন্ন····তার মাঝখানে অবিবাহিত, বিবাহিত বহু রকমের মেয়ে-মহিলা তাদের চাহিদাও নানারকম। উচ্চ শিক্ষার বৃত্তি পাওয়ার অযোগ্য ছেলের জন্য এসেছে তার আত্মীয় স্ত্রী পুরুষ। তার সবটা ব্যবস্থা যে মণীশের হাতে নয়····এটা জেনেও বিশ্বাস করেনি সেই রাগে····অন্যদিকে দোষ দিতে চেষ্টা করেছে····কোথাও বা চরিত্রের কোথাও ডাক্তারী বিদ্যার। চাকরী জীবনের চেয়েও সমাজ পরিচয়ের চেষ্টায় হাঁফিয়ে উঠলো মণীশ দুটি বছরেই। ছুটিতে বাড়ী এলেই, সুবোধ হালদার চাকরী ছেড়ে জোড়হাটে বসবার পরামর্শ দেন, মণীশ এক-একবার তাই মনে মনে ঠিক করে, কিন্তু আবার নতুন করে জেদ চাপে—না সে তার কাজ চালিয়ে যাবে।

মণীশের দিক থেকে মুস্কিল হয়েছিল, তার চেহারা। মণীশ ছিল, তার মাতুল পরিবারের মত। মামার মৃত্যুর পরে তাঁর আলমারীতে কতকগুলি ফটো পায়। তার মধ্যে একটি ফটোতে, তিনটি মেয়েকে একত্র দেখেই বুঝতে পারে তার মা এবং মাসীরা।—ফটোরি ছোট জনকে সে চিনতে পারে, একজন যুবকের সঙ্গে দেখে বুঝতে পারে তার মা—বাবা। ফটোয় অবশ্য বোঝা যায় না, রং কি রকম; তবু আকৃতি দেখেই বুঝতে পারে মা সত্যিই সুন্দরী ছিলেন।....মামা কোনদিনও তাকে এসব ফটো দেখতে দেননি। ওর এইদিকটা একেবারে অন্ধকারই রেখেছিলেন তিনি।....তবু নিজেকে দেখে সে বুঝতে পারে সে মায়ের মতই দেখতে অনেকটা। তবে স্ত্রীলোক আর পুরুষে একটু প্রভেদ থাকবেই। ছোট বেলাতে মণীশ ছিল, রোগা রোগা গড়নের। যাকে আমরা পাতলা ছিপছিপে বলি। বড় হওয়ার পরে, বেশ খানিকটা লম্বা হয়ে এই গড়নটাকে বজায় রাখে। এখন মণীশের স্বাস্থ্য দীপ্ত চেহারা, লম্বা, ফর্সা, মেদহীন। হঠাৎ দেখলে কোন সিনেমার ছবির নায়ক বলেই মনে হয়। চুলটা পৈতৃক ধারায় একটু লালচে। পৈতৃক ধারাটা জানলো—সে একবার খোঁজ করে, তেজপুরে যায় এবং অনুসন্ধান করে। তার বাবার অন্য ভাই ও তাঁদের ছেলেদের দু-একজনকে পেয়েছিল।—মামার ড্রয়ারে একটা কাগজে মোড়ানো কতকগুলো চিঠির মধ্যে তার বাবার লেখা দু একখানা চিঠিও পেয়েছিল। তার একটায় লেখা ছিল, মামাকেই লেখা, আমার ছেলে যদি সত্যিকারের মানুষ হয়, আর যোগ্য হয় তবে, শশীনাথের মেয়েটিকে যেন বিয়ে করে, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে মেয়ে সুযোগ্যা হবেই। ওদের শিক্ষা দীক্ষা অন্য ধরণের, তাই মণীশ প্রকৃত উপযুক্ত না হলে আমার এ ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। তুমি এদের দুজনকেই দেখবে তা আমি জানি।—আমার সমস্ত বোঝা তোমার মাথায় তুলে দিলাম, শুধু আমার ছেলের কথা ভেবে। ভাগ্য আমাকে তুলে দিয়েছিল, আমার ধর্ম মায়ের কোলে, আমি

আমার ছেলেকে দিলাম, তোমার হাতে। চপলাকে তুমি ক্ষমা করো মণীশ।—ইতি—

বাবার শেষ কথা কয়টির মধ্য দিয়েই তাঁর অন্তরের পরিচয় পায় মণীশ।

শিলচরে থাকার শেষ দিকেই চাকরী ছাড়তে হল, মণীশকে। মণীশকে নিয়েই একটা গণ্ডোগোল বেধে উঠলো, কয়েকজন নার্স, ও একটি তরুণী পেসেণ্টকে নিয়ে। তরুণীটিকে ফ্রী বেড থেকে পেয়িং বেডে দেওয়া হল। জানা গেল, এই তরুণীটির সেই টাকা গ্রহণ করছে মণীশ সরকার। সেটা অবশ্য অন্য কথা,....এই তরুণীটির প্রতি নার্সদের অবহেলার অনুযোগ—শেষে রিপোর্ট নিয়ে খুব গণ্ডোগোল। মণীশ ভেবে পায়নি, প্রথমে নার্সের মত সেবা ধর্ম গ্রহণ করেছে যারা—তারা, এনেমিয়া, বিকোলাই, প্রভৃতি নানান রোগের ওপর ঠাণ্ডা লেগে ব্রক্‌টাইস প্যাচ হয়েছে—এমন রোগিণীর ওপর....সেবার অবহেলা করতে পারে....তার প্রধান কারণ—এই গরীব মেয়েটির প্রতি ডাক্তারের করুণা বড় বেশী—মেয়েটি ডাক্তারের একই সমাজের আর সেই ডাক্তার—তরুণী, যুবতী নার্সদের সম্বন্ধে বড় উদাসীন। অর্থবান ও রূপবান বলে অতি অহঙ্কারী।

অহঙ্কারী নয়, মেয়েদের ঠিক বোঝে না মণীশ। কেমন একটা ভয় আছে। তবে তরুণী রোগিণী তার কাছে মেয়ে নয়; সে ডাক্তার—মেয়েটি রোগী। মেয়েটি খুব গরীব, বিধবা মায়ের মেয়ে, তাই মায়ের করুণ কান্নায়। ভায়েরা যারা কাজ করে, তারা কিছু দেখেনা। ভদ্রমহিলা এক প্রাইমারী স্কুলে চাকরী করেন, আর একটা দুটো ছোটখাট টুইসানীর ওপর চলে তাঁর।

মেয়েকেও বেশী দূর পড়াতে পারেন নি। এই নার্সিং লাইনেই দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ও একটু দুর্বল গোছের।.... গরীব শুনেই তার চোখে ভেসে ওঠে মামার সব দীন দরিদ্র রোগী রোগিণীর কথা।....তাই ফ্রী বেড থেকে একটু বেশী যত্নে রাখবার

চেষ্টা তার হয়েছিল। তখন মণীশ অল্পবয়স্ক, তখনও মণীশ জগতের ক্রুর কুটীল দিকটা ভাল করে চিনতে শেখেনি। সহকর্মীদের মধ্যে যাদের বন্ধু বলে মনে করেছিল—তাদেরি কোন জনের চক্রান্ত হবে তার বিরুদ্ধে তা বুঝতে পারেনি—হঠাৎ একটা কথা উঠলো, রোগিনী রোগিনী যদি তরুণী না হত, রোগিনী যদি স্ব সমাজের না হত—তাহলে ও কি এমন প্রাণের দরদ নিয়ে-দেখতেন, ডাঃ মণীশ সরকারি ?

স্বসমাজ কথাটা চাবুকের মত লেগেছিল তার। আটাশ বছরের বন্ধনহীন বয়স নিরুপায়ের মত অপমান সহ্য করতে পারে না। মণীশ ও চাকরী ছাড়লো।

জামতাড়া থেকে আসার পরে, আমার মনে হঠাৎ খেয়াল চাপলো লেখাকে পাঠানো লতার চিঠিগুলি পড়বার। লেখা পুরাণো চিঠি জমিয়ে রাখে। আমারি একটা পুরাণো ট্রাঙ্কের ভেতর ওর সব সেলায়ের নক্সা ইত্যাদির সঙ্গে রাখা আছে। এর আগে যখন চিঠিগুলি আসতো, আর বেশ কয়েকদিন টেবিলের ওপরে ছড়ানো ছিটানো থাকতো। তখন কোনদিন দেখিনি, অথচ এখন এই ইচ্ছা কেন হলো ? কেন জানতে চাইছি, ও কি লিখেছে আমার সম্বন্ধে ?

একটা প্রবাদ শুনেছি সব কথা নাকি স্ত্রীলোকের কাছে বলতে নেই, তাতে ক্ষতি হতে পারে। তেমনি, একটি কথা বুঝি পুরুষেরও জানতে নেই, বিশেষ করে, যে পুরুষ তখনও যুবক। জানতে নেই যে তাকে কোন সুন্দরী যুবতী মেয়ে ভালবাসে। যতই সে কথা মন থেকে দূরে রাখতে চাই, ভদ্র-অভদ্রতার প্রশ্ন তুলে বিচার করি···· তবু যেন একটা মাদকতা, জারক রসের মত, নেশায় বিহ্বল করে দেয়।

লতার চিঠির মধ্যে সুবীর বাবু কেমন আছেন—কখন বা, তোরা কেমন আছিস, সুবীর বাবুকে নমস্কার জানালাম, এই সামান্য টুকুতেই গভীরভাবে ধরতে চাই। আর তাতে যেন কিছুটা তৃপ্তিও এই সময়ে আমি ব্যস্ত হয়েছিলাম, লতা কবে জামতাড়ায় আসবে

আমি সেই সময়ে একবার যাব····তবে কি লেখাকে আমি ভালবাসি না তা নয়। তাকে আমি হৃদয় মন দিয়ে ভালবাসি।—আমি তো, অকৃপণ হচ্ছি না····কিন্তু অমিয় বর্ষণ যদি অন্যভাবে পাই····সেটুকু যেন অনন্য পাওয়া····

লতাকে দেখতে পাওয়া সে যাত্রা আমার হল না। পরীক্ষা দিয়ে একটা দলের সঙ্গে লতা দার্জ্জিলিং বেড়াতে গেল। আর লেখাও মাস দেড়েক পরে। ওখান থেকেই একজন সঙ্গী পেয়ে চলে আসবার ব্যবস্থা করলো।

লেখা এসেছে। আস্তে আস্তে সংসারের কাজে কর্মে সকলের সঙ্গে মেলামেশায় নিজেকে সামলে নিয়েছে। তার কাছে মাঝেমাঝে অবসর বুঝে গল্প করি। পড়া-শোনা নিয়ে থাকার প্রশংসা করি।

লেখা কিন্তু বলে—লতার এখন পাগলামী ছেড়ে-বিয়ে করা উচিত।—মামাবাবুর বয়স হচ্ছে—কেবল্ ওর বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যই নয়, তাঁর বৃদ্ধ বয়সের একজন সহায় দরকার তো।—আমি তো কত ভাবে তাকে বুঝিয়েছি····আমার বিয়ে ঠিক হওয়ার পরে আরও বেশী করে····

কি যে পাগলামী—সেই ডাক্তার—যে আসবে না যে দেখবে না····

আমি বাধা দিয়ে বলি, তা লতা নিজে চাকরী করেই তো ওঁর সহায় হতে পারেন।

লতার তাই ধারণা। কিন্তু কাজটা অত সহজ নয়। স্কুল মাষ্টারী করে লতা পাবে কত? এছাড়া বুড়ী আর বুড়ো—পড়ে আছে, সহর ছাড়িয়ে কত দূরে, একটা বিপদ হলে বলতে গেলে খবর দেওয়ার কেউ নেই। এত মনটা খারাপ লাগে লতা যেখানে থাকবে সেখানে তো, এঁদের নিতে পারবে না। আর মামাবাবু আর কতদিন এমন খাটবেন····ভোর থেকে মাঠ-আর বাগান, সন্ধের পর ও হাটের হিসাব, মজুরদের হিসাব। ওই মানুষটার জন্য বেশী দুঃখ হয়।····কে জানি মাকে মনে হয়েছিল, লতার বুঝি ডাক্তারের পাগলামা কেটেছে····

তাই নাকি, তা তখন বিয়ে দেওয়া হয়নি কেন ?

ঠিকঠাক করতে হবে খোঁজ করতে হবে তো····ভাব করে, মেলামেশা করে বিয়ে করবার মত নয়····বড়মা ভাবছিলেন, একটু বাইরে যাবেন, পাটনা····ভাগলপুর····সমাজের পরিচিত যাঁরা আছেন। এমন সময় উড়ে এসে জুড়ে বসলে তুমি····তখন আর হল না।

আর তারও জেদ চাপলো আগে, বি, এ পাশ করি····

তাহলে আমিই বাধা হলাম লতার বিয়ের ?

না—না—তা কেন,····তবে, তখন ও কেমন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকায়—বড়মা আমি ভেবেছিলাম যে ও রাজী।—আর সে তো এখনও হতে পারে। এখন তো ও বিএ পাশ করে যাবে।····

আবার আমার মনে নতুন সুর তুলে দিল লেখা,—ডাক্তারের পাগলামী ছেড়ে যদি একটু রাজী হয়েছিল তবে আবার এমন ভাবে আপত্তি করলো কেন····আমার জন্যে—না আবার সেই ডাক্তারকেই আঁকড়ে ধরতে চেয়ে। আমি লতাকে বুঝতে চেষ্টা করি। বেশ একটু ভাবপ্রবণ মেয়ে—ছোটবেলা থেকেই····অর্থাৎ শৈশবের মন থেকেই, যাকে নিজের বড় আপন জন ভাবছিল····সেই আপন জন,—যে কত আপন হয়—তা বুঝবার বয়সেই জানলো,—তার স্বপ্ন, তার ধারণা কিছুই সফল হবে না। হয়তো বা এর ফলে পুরুষ জাতির প্রতিই মনটা বিরূপ হয়েছিল। তার পরে ধীরে ধীরে মনের উত্তাপ যখন নিভে এসেছিল, অমন স্থির হয়েছিল, ঠিক তার পরেই যখন দেখলো, আর একটি মেয়েকে ভাল বাসছে অন্য এক পুরুষ তখন তার মনেও সেই ভালবাসা পাবার বাসনা উদ্বেল হয়ে উঠেছিল।

এটা এমন কিছু অন্যায় নয়, বরং এইটাই যুক্তিযুক্ত।

চোখের সামনে দেখলো, এই মানুষটি ভালবাসতে জানে, তাই সেই মানুষটিকেই বুঝি সে নিজেই ভালবেসে ফেল্ল। মনে-মনে এই শেষ কথাটা উচ্চারণ করবার আগেই আমি রোমাঞ্চিত হলাম।···· এমন তো হয়েই থাকে, একটি পুরুষকে দুজন স্ত্রীলোক ভালবেসেছে,

ভাল বেসেছে এমটি মেয়েকে দুজন ছেলে। দুজন পুরুষের ভালবাসা একজন স্ত্রীলোকের মনে কি অনুভূতি আনে জানি না—তবে আমার মনে অন্য একটি মেয়ে তার হৃদয়ের কতটুকুও দিয়েছে—এটা একটা আলোড়ন এনেছিল। তবে অকপট সত্য কথা যে আমার লেখাকে তার জন্য এতটুকুও কম দেবার ইচ্ছার ছায়া পর্য্যন্ত আমার মনে আসেনি। ভাষায় না বলতে পারা একটা মৃদু আবেশ, অতি গোপনে আমাকে একটা সুখ-স্বাদ দিয়েছিল।....কখনও বা আমি নিজেই ভাবতাম। এ সব ভুল ধারণা, আবার পরক্ষণেই ভুলটাকেই সত্যি বলে ধরে নিতাম।

এর পরে লতার পাসের খবর এল। ডিস্‌টিংশান পেয়েছে লতা। লেখার খুব আনন্দ! এমন কি সে ঠিক করছিল, দু এক দিনের জন্য জামতাড়া যাবে। কিন্তু ওখান থেকে চিঠি এল, লতা পাটনা ফিরে গিয়েছে। কারণ এখুনি একটা স্কুলে সে জয়েন করবে, খালি আছে পোষ্ট। এই সময়ে আমার ইচ্ছা হয়েছিল লতাকে একটা চিঠি দিতে, মনের ভেতর একটা কিন্তু থাকার জন্যে পারলাম না।

লতা চাকরী করছে। পাটনার কাছেই দানাপুরে একটি স্কুলে। তাকে ছুটিছাটায় আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে লেখা। কিন্তু লতা আসতে চায়নি। নানা কারণেই এড়িয়ে গিয়েছে। প্রথম একটু বেশী ছুটি পেলেই আগে জামতাড়া যাওয়া দরকার। তারপর প্রাইভেটে এম, এ, দেবার ইচ্ছায়, এখন থেকে একটু একটু পড়াশোনা আরম্ভ করেছে।—এই সব।

আমার সন্দেহপ্রবণ মনে কেবল লতার সেই দূরে থাকতে চাওয়ার ইচ্ছা মনে হয়। কেন সে দূরে থাকতে চায়? তার আবাল্যের সঙ্গিনীর। অনুরোধ, নিমন্ত্রণ রাখা প্রায় দেড় বছরের মধ্যে সম্ভব হল না?....কেন নিজেকে গোপন রাখতে চায় লতা?

হঠাৎ সুরবালা দেবীর একটা চিঠিতে লেখা জানতে পারলো, উনি যেন কার কাছ থেকে খবর পেয়েছেন, সেই মণীশ ডাক্তার এখনও

বিয়ে করেনি, তবে সরকারি চাকরী ছেড়ে দিয়ে, বিলেত চলে গিয়েছে।

মণীশ সরকারের জন্য বড় দুঃখ হল, আর কথাটা লেখাকেও বলতে ইচ্ছা হল—বলি হায় ডাক্তার মণীশ সরকার, তোমারে কি দুর্ভাগ্য দেশে এমন এক রমণী রত্ন তোমার জন্য হৃদয় মন উজাড় করে বসে রয়েছে, আর তুমি কিনা বিদেশে চলে গেলে।

আমি যখন রমণী রত্ন কথাটা বলে ছিলাম, লেখা যেন একটু চকিত হয়ে উঠেছিল, অবশ্য আমার অনুমান মাত্র।

লেখা বলে আর সেই ডাক্তার হয়তো বিদেশে গিয়ে এক বিদেশিনী কেই বিয়ে করে বসবে—এখানে লতা পাগলামী করুক। তবে ডাক্তারের বিয়ের খবর যদি আসে কোনদিন,—তাহলে ওর মন ফিরতে পারে····

দিন চলে যায়····বছর ঘুরে গেল আবার। লেখা আবার সন্তান সম্ভবা। লতা চাকরী করছে। নানা ভাবে, বহু সুপাত্রে তার বিয়ের কথা তোলা হয়েছে; মণীশ সরকার বিলেতে চলে গিয়েছে সব জানানো হয়েছে, তবু লতার সেই প্রতিজ্ঞা,—তার সেই প্রতিজ্ঞাই, আমাকে যেন গোপনে সেই রমণীয় স্বাদের আস্বাদ দিয়ে চলেছে।····

লেখা সেদিন বল্ল—লতার বোধহয় বুদ্ধিবৃত্তির কিছু জ্ঞান হয়েছে—একটু ঠাট্টা তামাসা করতে শিখেছে, তোমার কথা কি লিখেছে জান?

তাই নাকি? লিখেছে, কি লিখেছে সে?

হ্যাঁ লিখেছেই তো। অনেক দিন হয়ে গেল, তোর সঙ্গে দেখা শোনা নেই, আর সুবীরবাবু, নিশ্চয় অল্প কয়েক দিনের চেনা মেয়েটিকে বেমালুম ভুলে গিয়েছেন।

আমি কথাটা উল্টে বল্লাম—উনিই বরং ভুলে যাওয়া মানুষটিকে আবায় কৃপা করে মনে করলেন মনে হচ্ছে।

লতা বেশ গদ গদ হয়ে বল্ল—এবার বোধহয় ডাক্তার ভূত ওর ঘাড় থেকে নেমেছে।

তাই বোধহয়। এই সময়, ওর একটু পরিবর্ত্তন দরকার। ওকে একবার এখানে আসতে বল। ঠিক এই সময়ে পরিচিত জনের মধ্যে কাটিয়ে গেলে ওর মনটা আরো ভাল হবে।

ঠিক বলেছো····আর ভূত নেমে থাকলে আসবেই লতা।

আমার মন চাইতে থাকলো, লতা আসুক, একদিনের জন্যও সে আসুক। চাকরী জীবন নিয়ে দূরে পড়ে থাকা লতার জন্য মনটা সত্যিই খারাপ লাগছিল। মায়া হচ্ছিল মেয়েটির জন্যে। একটু ভিন্ন প্রকৃতির মেয়েটির জন্যে প্রথম থেকেই একটা মায়া, কোমল অনুভূতি আমার ছিল—অন্য ছায়া পড়ে তাকে একটা গভীর মায়ায় ভরে দিয়েছে, তাই বুঝি আমি মনে করতে পারলাম, আহা সে যেন আসে।

চাকরী ছেড়ে দিয়ে জোড়হাটতে থাকলো মণীশ। তেমন করে প্রাকটিশের কোন চেষ্টা করেনি। ওর বরাবর ইচ্ছা ছিল, চাকরী করে কিছু জমিয়ে নিয়ে বিলেত থেকে, এম, আর, সি পি, হয়ে আসবে। আর মামা যে টাকা দিয়েছেন, তাই দিয়ে, ও নার্শিং হোম খুলবে, তাতে গরীবদের জন্য কিছু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকবে। তখনও ও এদেশে এত নার্শিং হোমের চলন হয়নি। কিন্তু বছর আড়াই এর চাকরীতে বলতে গেলেই কিছু জমেনি। এদিকে মণীশের গতি মতি দেখে সুবোধ হালদার মণীশকে বিলেত পাঠিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ডাঃ বিশ্বাস বেঁচে থাকলে তিনি যে ওকে বিলাত পাঠাতেন, তাতে তার কোন সন্দেহ নেই।

সুবোধ হালদারের অনুরোধে, আর চারিধারের পরিচয়ে মন বিক্ষিপ্ত থাকায় মণীশ যেন পালিয়ে যেতে চাইলো। তাই যাওয়ার আগে সুবোধ হালদার আর একবার বিয়ের কথা তুললেও, মণীশ বিয়ে না করে থাকবার কথাই জানায়। যাওয়ার ব্যবস্থা আদি করতেও বেশী সময় লাগলো না। মণীশ চলে গেল খাস লণ্ডন সহরেই থাকবে সে।

বছর তিনেক বিলেতে কাটিয়ে, এম. আর. সি. পি. হয়ে ফিরলো

মণীশ সরকার। মণীশ যতদিন বিলেতে ছিল, আর চিঠি এলেই সুবোধ হালদার আগ্রহ ভরে আশা করতেন ওর বিয়ের খবর থাকবে। বিদেশিনীই বিয়ে করুক সে তবু বিবাহিত হোক, এইটাই চাইতো সে। ছোটবেলা থেকে দেখেছে, শান্ত ভদ্র ছেলেটিকে। বড় হয়েও এমন কি মামার মৃত্যুর পরেও, কোনদিন মনিব সুলভ ভাব, কি উদ্ধত ভাব দেখেনি মণীশের মধ্যে। কি সংযত চরিত্র। এছাড়া, প্রায় ছেলের বয়সী, ছেলেটি, আর এতবড় পৃথিবীতে সত্যিকারের আপনজন বলতে কেউ নেই, এটাই বড় বাজতো সুবোধ হালদারের। কিন্তু মণীশও যেমন কোনদিন মনিবসুলভ ব্যবহার করেনি, সুবোধ হালদারও কোনদিন নিজেকে কর্মচারীর পর্য্যায় থেকে সরিয়ে উঁচু দেখান নি।—বিনীত ভাবে জামাতার কথাটা মনে করিয়ে দিতেন। কারণ উনি জানতেন ডাক্তার বিশ্বাসের ইচ্ছা ছিল, মণীশ বিয়ে করলে যেন এই মেয়েটিকেই বিয়ে করে। এবং শেষ চিঠিতে, তিনি মণীশ বিয়ে করুক এমনি ইচ্ছা যেন প্রকাশ করেছিলেন মনে হয়েছিল তার। ডাক্তার বিশ্বাসের শেষ চিঠিটার কথা কয়টি মনে হল—মণীশের পক্ষে বিয়ে করাই ভাল মনে হয়। দুর্নামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারা বড় কঠিন কাজ। এর সঙ্গে লড়াই করা সহজ নয়। বিবাহ একটা দিক রক্ষা করে। তবে সে উপযুক্ত, নিজের বিচারেই জীবনের চলবার পথ ঠিক করে নিক। তুমি রইলে, সে রইল।

ওই আদেশটুকুই তাঁর কাছে যথেষ্ট।···মণীশ যখন একাই ফিরে ফিরে এল, তখন মনে মনে একটু দুঃখিতই হয়েছিল সুবোধ হালদার।

আসার অল্প দিনের মধ্যে নাহারকাটিয়ার আসাম অয়েল কোম্পানীর চাকরী পেয়ে গেল। মোটা অংকের বেতন। মণীশ ভাবলো, এইবার কিছু জমিয়ে নিতে পারবে। নার্সিং হোম খোলার স্বপ্ন তার মন থেকে যায়নি। ডাক্তার বিশ্বাস, নিজের সমাজের অনুন্নতদের শিক্ষার জন্য চিন্তা করেছেন মণীশ কিছুদিন ছোট সহরের হাঁসপাতালে ঘুরেছিল। তাই দেখেছে অনেক অভাবী রোগগ্রস্ত

মানুষের অবস্থা। তার চিন্ত নার্সিংহোম। কিন্তু সব কিছুতেই অনেক টাকার দরকার। তাই এই চাকরী পাওয়া মাত্রই সে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। নতুন গড়েওঠা ছোট কলোনী সহর।

এবার চাকরী নেওয়ার পরে মণীশ প্রথম থেকেই সাবধান থাকলো। প্রথম বয়সের অনভিজ্ঞতার জন্য খোলাখুলি মেলামেশার ফলে সুফলের বদলে অন্যরকমই ঘটেছে। এখানে সে ধরণের সুযোগও একটু কম। এটা একটা বিলিতি কোম্পানীর চাকরী। কোম্পানীর চাকুরেদের কোম্পানীর হেলথ্ অফিসেই দেখতে হয়। তাছাড়া জুনিয়ার ডাক্তারের রিপোর্ট দেখেই কাজ করতে হয় কিংবা তাদের সঙ্গে আলোচনা করে। অবসর সময়টা মেডিক্যাল জার্ণাল পড়ে, ও কিছু কিছু অন্য পড়া নিয়ে কাটে তার। কিন্তু মানব সমাজে বাস করতে গেলে, যতই এক পাশ হয়ে থাকুক, কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েই যায়। মণীশের তার ব্যতিক্রম হয়নি।

মণীশ এখানে নিজের নিজস্ব পরিচয় দেয়নি, খুঁজে বেড়ায় নি, কোথায় আছে কোন কৃশ্চান পরিবার, তাদের কাছে বলতে যায়নি। শিকার ব্যাপারে সামান্য সাহায্য করবার চেষ্টা আর। সেটা যে ভাবে সুবোধ হালদার চালাচ্ছেন তাই সব চেয়ে ভাল। যার প্রকৃত প্রয়োজন সেই খুঁজে নেবে নিজের প্রয়োজনে।

মণীশ না চাইলে কি হবে, এমন একজন, বিলেত ফেরত, রূপবান অবিবাহিত, উচ্চ বেতনের জন্য, আগ্রহী লোকের অভাব হল না।—এখানকার একজন বাসিন্দা তিনি, খোঁজ খবর করে জানলেন যে মণীশ ডাক্তার বিশ্বাসের ভাগ্নে। ডাক্তারের বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ও আবার হয়েছিল শিলংএর একটি হোটেলে। উনি এখন অবসর নিয়েছেন। ছেলেটি কাজ করে এই কোম্পানীতে। বীরেশ্বর বকসীও কৃশ্চান। তিনি নিজেই খোঁজ করতে এলেন মণীশের কোয়ার্টারে। মামাকে জানতেন শুনে, একটু আগ্রহ নিয়েই আলাপ করে মণীশ।....

আমরা এক হোটেলেই ছিলাম কদিন। খুবই আলাপ হয়ে ছিল, ওই ক'দিনে। উনি তখন ওর অসুস্থ বোনের, মানে আপনার কোন মাসীর চিকিৎসার ব্যাপারে ওখানে গিয়েছিলেন····

মণীশ চুপ করে থাকে। মামার ডায়েরী থেকেই জেনেছে, এইসব মেয়েদের মামা সর্বদা তাঁর বোনের পরিচয়েই বলতেন। নিজের বোনেদেরই দেখতে পেতেন, বিপথে যাওয়া মেয়েদের মধ্যে।

বীরেশ্বর বকসী তার পরে জোড়হাটের এক চেনা লোকের কাছ থেকে মণীশের সব কথা জানতে পারেন। ক্রমশঃ মামার বন্ধুর হয়ে মণীশের প্রতি অতি স্নেহপরায়ণ হয়ে পড়লেন। বাড়ীতেও মাঝে-মাঝে আপ্যায়ন করতেন। খুব কম হলেও। মণীশকে যেতে হত। একজন বয়স্ক ব্যক্তি, তার উপর মামাকে জানতেন। এ ভিন্নও মণীশও একজন মানুষ, একেবারে একলা সে কিছুতেই থাকতে পারেনা।—তাই মণীশকেও মধ্যে মধ্যে বীরেশ্বর বকসীর বাড়ী যেতে হত।

যথা সময়ে লতার চিঠি এল, সে আসবে, প্রথমে জামতাড়া যাবে, তারপর এখানে আসবে। লেখা খুব খুশী, তবু যেন একটু বিব্রত, লতাকে নিয়ে হৈ হৈ করে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াবার মত শারীরিক অবস্থা তার নয়, তবু যে টুকু করা চলে, তাই নিয়েই একটা প্রোগ্রাম করে ফেল্ল। লেখা হৈ-হৈ করতে ভালবাসে। লতা কি খেতে ভালবাসে এসব নিয়ে মসগুল হয়ে থাকলো লেখা। লতা আসবে, এতে আমি খুবই খুসী হয়েছিলাম, কিন্তু যখনই লতার চিঠি এল সে আসবে, তখন আমার একটু ভয় ভয় লাগলো,····আমি কি ধরা পড়ে যাব। লতা কি জেনে ফেলবে যে আমি তার মনের কথা জানি।—লতা আসুক—আবার না আসুক, এই দোটানা ইচ্ছাকে, আমি টানাপোড়েনের মত ওঠা-নামা করতে লাগলাম। কতদিন দেখিনি লতাকে? সেই জামতাড়া ষ্টেশান থেকে, তার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়েছিলাম।

সারাদিন লতার কথাই আমাদের মধ্যে আলোচনা করেছিলাম। লেখার সঙ্গে সংগোপনেও তার কথা ভেবেছিলাম বলেই কিনা জানি না, এদিন রাত্রে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম।....জামতাড়ার অজয় নদীর ধারের সেই বড় পাথরটায় লতা বসে আছে। উঁচু হয়ে থাকা পাথর থেকে তার পা দুটি ঝুলছে। আমি লতার পাশে বসে আছি। হঠাৎ ওর ঝোলান পা দুটীর তলায়, নিজের পা দিয়ে, ওর পায়ে একটু দোল দেওয়ার চেষ্টা করলাম। লতা একটু ঘাড় নীচু করে নিজের পায়ের দোল খাওয়া দেখছিল, কিন্তু যেই আমি ওর কাঁধের ওপর হাত রাখলাম, লতা চমকে ডাক্তার, ডাক্তার বলে চীৎকার করে উঠে ছুটে পালিয়ে গেল, আমি ছিটকে পাথরের থেকে পড়ে গেলাম।—স্বপ্নে পড়ে গেলাম, আর ভয়ে জেগে উঠলাম।.... সমস্ত গা ঘেমে উঠেছে। লেখা একটু সরে শুয়ে আছে,—আমি আস্তে করে ওর গায়ে হাত রেখে, নিজের ভয়কে শান্ত করলাম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমুতে পারলাম না, কেন এমন স্বপ্ন দেখলাম। আমি তো সত্যিই তাকে এমন ভাবে চাইনি।... লেখা, আমার লেখা। অনেকক্ষণ ধরে ঘুমন্ত লেখার গায়ে আমার আদরের হাত বুলিয়ে নিজেকে শান্ত সংযত করতে চেষ্টা করলাম। আমারও কি লতার মত পাগলামী আরম্ভ হল,....না এসব চিন্তা আর নয়। প্রতিজ্ঞা করে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম।

তখনকার মত আমাদের আশা সফল হল না। পর দিনই লতার চিঠি এল, যে ওদের স্কুলের একজন টীচার হঠাৎ মারা যাওয়ায় এখনকার মত যাওয়া বন্ধ করতে হল। সুযোগ পেলে সে একবার আসবেই, কতদিন দেখেনি লেখাকে। লেখাও অনেক আশা করেছিল তার নিজের সংসারের পরিবেশে এনে, লতার মনেও সংসারের ইচ্ছা জাগাবার প্রচেষ্টাই তার বেশী ছিল। জানে লতার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে বলবেন না মামাবাবু। বড়মাও তেমন জোর করবেন না। কোন দিক দিয়েই লতা অসুখী হোক

অখুসী হোক তা তাঁরা চান না। সে যা করে সুখ পায় তাই করুক। কোন রকম অন্যায় সে করবে না, এ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁদের আছে। তিন বছরের ওপর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে, আমাদের কাছে লতা এখনও আসে নি।

এর পরে মাস দুই পার হয়েছে, লেখারও ডেট হয়ে আসছে। এবার সুরবালা দেবী আসতে পারেন নি, তাঁর নিজেরি শরীর অসুস্থ। বৌদিরা আছেন,—এ ভিন্ন মানিক বৌদি আছেন। তাঁর বাড়ী হস্‌পিটেলের খুব কাছে। মেডিকেল কলেজেই ব্যবস্থা করেছি। এর মধ্যে অফিস থেকে ফিরে দেখি, লেখার শরীর ভাল নেই। রাত আট্‌টা নাগাদ, ওকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হল। ভোরবেলা কন্যার জননী হল লেখা।....এবার সব কিছুই নিরুপদ্রবে হল। শরীরও ভাল আছে। ভোরবেলা হওয়ার জন্য কেউ মেয়ের নামকরণ করলেন উষসী, কেউ প্রভাতী। লেখাকে বারদিন পরে বাড়ী এনেছি। ঠিক এর দুদিন পরে সকালবেলা এক চক্রর চা খেয়েছি। দাড়ীটা কামিয়ে দ্বিতীয়বার চা খাব এমন সময় নীচেকার তলার বাবুদের চাকরটা বলে, এক মেমসাহেব আপনার খোঁজ করছে।

মেম সাহেব! আমার খোঁজ করছে? হাতের ব্রাশটা তখনও গালে লাগাই নি নেমে গেলাম। দেখি, একটা ট্যাক্সি থেকে লতা মুখ বার করে রয়েছে—

আরে? আপনি? আসুন আসুন। ছুটে যাই।

লতাও প্রায় লাফ দিয়ে নেমে আসে—সামনে থেকে বয়স্ক এক ভদ্রলোকও নামলেন।....লতা বল্ল উনি মিশনের কাজে আসছিলেন তাই চলে এলাম....আসুন মিষ্টার সেন, চা খেয়ে যাবেন। কিন্তু উনি আবার ট্যাক্সিতেই উঠলেন, বললেন, দেরী হয়ে যাবে আজ, পারিতো পরে আসবো....তুমি আমার সঙ্গেই যাবে কিনা, একটা ফোন করে দিও। নাম্বারটা আছে তো?

হ্যাঁ, বলে লতা। ট্যাক্সীটা ছেড়ে গেলে, লতা খুসী খুসী মুখ

করে বলে, চলুন।

লতার মুখখানা ট্যাক্সীর মধ্যে থেকে দেখে মেমসাহেব ভাবা কিছু ভুল হয়নি। ওর চুল এমনিই একটু কোঁকড়ান ছিল, তারপর মনে হয় কার্ন করিয়েছে। তাই আরও অবাঙ্গালী মনে হচ্ছে। একখানি গাঢ় হলুদ রং সিল্ক শাড়ীতে চমৎকার দেখাচ্ছিল। আরও সুন্দর হয়েছে যেন।

লেখা, কিন্তু মেম সাহেব শুনেই মনে করেছিল, লতাই এসেছে।

লতা একেবারে বদলে গিয়েছে যেন। প্রায় ছুটে গিয়ে লেখাকে জড়িয়ে ধরে····

লেখা ছাড়-ছাড় বলে ওঠে। লেখাকে জড়িয়ে ধরে ঘাড়ের পেছনে চুমু খেয়ে, লেখার অন্যদিকে শুয়ে থাকা ছোট্ট শিশুটির দিকে তাকায় লতা—একটুখানি তাকিয়ে থেকে বলে, বড্ড ছোট না রে।

না তো তোর মত বড় হবে ভেবেছিলি নাকি ?

লতা যা বলে একটু হেসে ওঠে। আর লেখা হাহা করে হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে। বহুদিন পরে এমন করে হাসলো লেখা। এ যেন, লাল পাহাড়ের ওপরের লেখা। লতাকে পেয়ে বড় আনন্দ হয়েছে ওর। এ যেন ওদের দুজনের নিজস্ব ব্যাপার।

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিলাম।

হঠাৎ লতা তার গৃহকর্ত্রীর ভূমিকায় ফিরে এল। গোকুল, গোকুল বলে ডাক দিয়ে, আমার দিকে ফিরে বলে, একটু চা এর ব্যবস্থা কর। ঘরে অতিথি এলো, বাজার ইত্যাদির ব্যবস্থা কর ভাল কর। লতা, তুই এমন সময়ে এলি যে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াব, সে উপায় নেই। কিন্তু আমি বোধ হয় চেয়ারে বসে চা-টা করতে পারবো····

লতা লেখার গালে আঙ্গুল দিয়ে ছোট ছোট গোটা দুই চড় দিয়ে বলে—চুপ-চুপ, দুষ্টু মেয়ে, তোমাকে কিছুটি করতে হবে না···· দেখ্‌না আমিই কি করি। জানিস লেখা, আমি ম্যাগাজিন দেখে

কত রকম রান্না শিখেছি।

তুমি! তাও ম্যাগাজিন দেখে, কাউকে রান্না করে খাইয়েছিলে····

মানে! আমাদের টীচারদের হস্টেলে কত ছুটির দিন রান্না করেছি।

কি রান্না করলি, আর কেমন করে করলি বলতো একটু।

অত প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেব না।

এবার লেখা বলে, লতা তুই যদি শুধুই আমার দিকে নজর দিস—আর একজন কিন্তু চটে যাবে।

এবার লতা যেন, আমার দিকে মুখ ফেরায়। আমার দিকে এগিয়ে এসে—তার সুন্দর মুখখানা, উজ্জ্বল করে বলে—

আপনি আমার ওপরে-রাগ করবেন?

ঠিক কি উত্তরটা দেব ভাবছি। সেই মুহূর্ত্তেই, আমার চাকর গোকুল,—চা আর খাবারের প্লেট নিয়ে ঢুকলো। একজন মেমসাহেবকে দেখে। হঠাৎ ও যেন, কর্মে পটু হয়ে উঠেছে। শুধু চা নয়।—আমলেট ভেজেছে, টোষ্ট, সামনের দোকান থেকে সন্দেশ এনেছে। দরকার হলে ওখান থেকে বাকীতে আমার ব্যবস্থা করা আছে। গোকুলের সুবুদ্ধি দেখে আমরা সবাই খুব খুসী হয়ে উঠলাম।

আমি বললাম, মুখ হাত ধুয়ে একটু খেয়ে নিন। সারাদিন গল্প করবেন। আমি তো থাকব না।

থাকবেন না?

বা! আমার অফিস নেই?

হাত মুখ ধুয়ে খেতে খেতে লতা, কেমন আবদারের সুরে বল্ল,—বারে আমি এসেছি—আপনি ছুটি নিতে পারেন না?

লেখা একটু উদগ্রীব হয়ে আমার দিকে তাকালো।

আমি বলি, আজ তো যেতেই হবে। এর পর আমি গোকুলকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে চলে গেলাম। তারপর খেয়ে উঠে অফিস গেলাম।

মেয়ের জন্য একজন আয়া রাখা হয়েছিল, মানুষটি মাঝবয়সী, শান্ত ও পরিচ্ছন্ন। সে আর গোকুল মিলে রান্না করলো। খাওয়ার পরে লেখা আর লতায় গল্প হল।

এবার তোর বিয়ে করা উচিত লতা—আর ছেলেমানুষী নয়।

করবো, আগে সামনের বছর এম. এটা দিয়ে নিই।

তোকে সংসারী বিবাহিত দেখলে কি মামাবাবু বেশী খুশী হবেন, না?

তা হবেন, তবে আমাকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখলেও খুব খুসী হবেন।

একটু থেমে বলে—ডাক্তার কিন্তু এখনও বিয়ে করেন নি।

কি করে জানলি?

আমাদের স্কুলে তিনটি মেয়ে পড়ে, তারা তরলা স্মৃতি, ডাক্তারের সাহায্য পায়। ওদের আবার নিয়ম, ষ্টুডেন্টের হাতে টাকা দেয় না—ইস্কুলে। সেই ফর্ম-এ চারজনের মধ্যে ডাক্তারের নাম দেখলাম। একটু বুঝেছিলাম, আর যাঁর সঙ্গে এলাম উনিই বল্লেন—তরলা ডাক্তার বিশ্বাসের দিদি ছিলেন—আর ভাগ্নে মণীশ সরকার বিলাত থেকে এসেছে বটে, কিন্তু এখনও বিবাহ করেন নি।

সে যখন বিলেতে বিয়ে করেন নি তাহলে সত্যিই করবে না।

আমিও করবো না।

এ তোর পাগলামী।

বিয়েটা এমন কি, এই আমাদের কত টীচার বিয়ে করেননি, আমি আমাদের মিস দাসের মত থাকবো।

আর যদি, এখন ডাক্তার আসে,—মত বদল করে?

লতা····একটু থামে—পরে বলে, ডাক্তার যদি কখনও আসে···· তখনই আমাকে রাজী হতে হবে।

লেখা একটু স্থির হয়ে লতার মুখের দিকে তাকায়। দেখে লতার মুখে যেন প্রগাঢ় প্রত্যয়, ডাক্তার আসবেই।

বিকেল বেলা অফিস থেকে একটু আগেই ফিরলাম। দেখি লতা, ছোট বাচ্চা মেয়েটির পাশে বসে, তার অতি ছোট্ট হাতের মুঠো নেড়ে চেড়ে দেখছে। কিছু কলা আপেল. আঙ্গুর নিয়ে এসেছিলাম। জামতাড়ায় থাকতে দেখেছি, লতা খুব কলা ভালবাসতো। সে অবশ্য বাড়ী গাছের কাঁধি ভর্ত্তি কলা।

কলা দেখেই লতা, বলে····আপনি দেখছি কিছুই ভোলেন নি।

লেখা আমার এইসব আনা দেখে, অসম্ভব খুসী হয়ে উঠলো। তার বাড়ীতে এসেছে লতা। লেখা, আমাকে বল্ল····তুমি যদি পার, দিন দুই ছুটি নাও, লতাকে কলকাতার দর্শনীয় কিছু দেখিয়ে দাও। আমি তো বন্দী।

লতা বল্ল—দর্শনীয় মানে, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা তো,····আমি ওসব কিছুই দেখবো না। দুদিনের জন্য এসেছি, শুধু তোর কাছে থাকবো। ও একা-একা আমার মোটেই ভাল লাগবে না।

লেখা যেন একটু খুসী হল।····বল্ল, দুদিন মানে, সাতদিনের কমে ছাড়বো না।

বা রে, নরেন বাবু চলে যাবেন যে।

তা যান—তুই একাই যাস। তুলে দেওয়া হবে তোকে।

আমিও বলি তাই ভাল। জামতাড়া ও একাই যাতায়াত করে অবশ্য।

রাত্রে শোবার সময়ে একটু গোলমাল হল প্রথমে। আমাদের দুটী শোবার ঘর তার সামনে টানা দালান। দালানের শেষে সিঁড়ির দিকে বাথরুম, তার অন্যদিকে একটু ছাত, তাতে টালীর রান্নাঘর। দালানেই খাওয়া-দাওয়া। শেষের শোবার ঘরটাই আমাদের। সেখানে জোড়াখাট আছে। প্রথম ঘরেই আগেই একটা বড় চৌকি ছিল। এখন সেখানে লেখা স্বকন্যা রয়েছে—এঘরে আমি একাই থাকি। মাসখানেক গেলে অন্য কিছু করবার ইচ্ছা, এখন আয়া রাত্রে ওদের কাছেই থাকে।

আমি দালানে একধারে মাটীতে শোয়ার ব্যবস্থা করলাম। তাতে
এ দারুণ আপত্তি হল। তারপর সেই রাত্রে, লেখা তার কন্যা ও
কাপড় সমেত জোড়া খাটে এল, তাকে নিয়ে লতা ওই খাটে
লো। আমি লেখার চৌকিতে এলাম।
পরের দিন সন্ধ্যাবেলা লেখা তার শিশু কন্যাকে শান্ত করতে
ছিল,—লতা, এঘরে আসার সঙ্গে গল্প করতে এল। একটা
বেতের চেয়ারে বসে বলল্—জানেন, কতদিন মনে হয়েছে,
াকে দেখতে আসবো—কিন্তু কিছুতেই আসতে পারিনি····
কেন? ছুটির তো অভাব নেই আপনাদের।
না—তা নেই, তবে—
তবে কি, এই আমাকে দেখতে হবে বলে—
লতা কেমন চুপ করে গেল প্রথমে, তারপর মুখখানা নিচু করে
—খানিকটা তাই; আমার মাঝে সত্যি খেয়াল হয়েছিল, কখনও
নার সামনে আসবো না····
আমার সৌভাগ্য যে আপনি সে খেয়াল ছেড়েছেন।
াছাড়া আপনিও তো আমাকে দেখতে চাননি, লেখাই বারবার
খছে, আপনি তো একবার লেখেন নি।
লতার সমস্ত চোখ মুখে কেমন অভিমানের ছায়া।
আমি বলি—লতা আর আমি তো এক, তার কথাই তো
ার কথা····
তবু আমি ভেবেছিলাম, আপনি হয়তো একবার লিখবেন। লতা
মুখখানা ওধারে জানলার দিকে ফিরিয়ে নিল। একটু পরে
া দাঁড়িয়ে ওঠে। আর প্রায় কোন দিকে না তাকিয়ে বলে—
ম কেবল ছোট্ট খুকুকে দেখতে এসেছি। লতা ও ঘরে চলে গেল।
আমার ওপরে লতার এই সামান্য অভিমানটুকু আবার একটা
আলোড়ন এনেছিল। তাহলে লতা আশা করেছিল, তাকে
ম চিঠি লিখবো। তাকে আমি মনে রাখবো। সাধারণ হিসাবে

যদি লতার সঙ্গে আমার শ্যালিকা-সুলভ ব্যবহার থাকতো, তা
এসব কথা নিয়ে তামাসার মধ্যেই হাল্কা হওয়া যেত। কিন্তু ও
শ্যালিকা ইত্যাদি ব্যবহার ওদের বাড়ীতে চল ছিল না। এমন
বিয়ের পরেও আমাকে লেখা লতা বা সুরবালা দেবী লতাকে আ
বলতেও বারণ করেন নি। এসব ব্যাপারে ওঁরা বড় শিষ্টাচারী
সম্পর্কে ধরলে লতা-লেখা একেবারে নিঃস্পর সম্পর্ক। কিন্তু যে
বা আসবে না ভেবেছিল, আবার এল, তবে কি সে আবার অ
জন্যেই এল। মানুষ কেবল নিজের দিকটাই দেখতে চায়,
আমিও আমাকেই বড় করে দেখছিলাম। না তাহলে আমাকে
এ কথা বললো কেন, এই সন্ধ্যাবেলায়।

আমি এ ঘরে আসি,—একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে পরে বা
লতিকা দেবী, অনেকদিন আপনার গান শুনিনি, শোনাবেন ?

গান গাওয়া তো ছেড়ে দিয়েছি। সেই যে জামতাড়ায় গেয়েছি
তার পর থেকে আর গান গাইনি আমি।

এত সুন্দর গলা ছিল আপনার, ছেড়ে দিলেন !

লতা কোন উত্তর দিল না।

এর পর থেকে সকলে ঘুমুতে যাওয়া পর্য্যন্ত লতাকে
অন্যমনস্ক দেখেছি।

লতা বেড়াতে যেতে রাজী হল না বলে, আমি আর ছুটীর
চেষ্টা করিনি। লতা পাটনা থেকে ঠিকানা এনেছিল দু-এক
সঙ্গে দেখা করবে বলে। আর ও কোন কথা আমাকে আর বা
ক্রমশ লতার চলে যাবার দিন এগিয়ে এল।—একটা মঙ্গলবার স
লতা এসেছিল, কাল মঙ্গলবার লতা ফিরে যাবে। সোমবার
বেলা সেই ক্যানভাসের চেয়ারে বসে লতা আমার সঙ্গে
বলছিল। আয়া এই সময় লেখাকে তেল মালিশ করে দেয়।
জানলার দিকে তাকিয়ে ছিল, আমি তাকিয়েছিলাম লতার
বছর পঁচিশ বয়স হবে লতার। দেখায় তার চেয়ে অনেক কম।

কেমন নিঃপ্রাণ ভাব ছিল মুখে, এখন বোধহয় চাকরী জীবনে, পাঁচটী মেয়েদের মধ্যে থাকার জন্যে মনের একটু পরিবর্ত্তন হয়েছে, তার ফলে যে চঞ্চলতাটুকু এসেছে, তাই ওকে প্রাণবন্ত করেছে ও সজীবতা এনে দিয়েছে। লতা হঠাৎ এদিকে মুখ ফেরালো, দের চোখে চোখে এক হল। লতা চেয়েই থাকলো—আমি চোখ নালাম।

সুবীর বাবু—

লতার ডাকে আমি তাকালাম।

নিজের একখানা হাত অন্য হাতের মধ্যে রেখে লতা যেন ঃ খুব র করে কিছু বলছে, এমনভাবে বল্ল—আপনি একদিন আমার হতে চেয়েছিলেন, মনে আছে—

নিশ্চয় আছে—চেয়েছিলাম কেন, আপনার বন্ধু হয়েই আছি। ন কি করতে বলেন ?

না—কিছু করতে বলছি না—কথাটা মনে করিয়ে দিলাম।—তবে কোনদিন কিছু বলি—

আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব, তা নিশ্চয়ই করবো।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে লতা বল্ল—আমার চিন্তা বাবাকে যে কেউ থাকলে—

তার দরকার কি, আপনিই রয়েছেন—আবার এম, এ পাশ করে সোসারী করবেন। মেয়েরাও আজকাল সমান—

বাবা আমাকে আঁকড়ে রয়েছেন, নইলে, আমি পালিয়ে যেতাম—

কোথায় ? বিলেত-টিলেতের মতলব নাকি ?

আমার কথাটায় লতা যেন বেঁচে গেল।

চুপ করে স্বীকার করে নিল। আমি স্পষ্ট দেখলাম কথাটা তা নয়,—তবে কোথায় পালাতে চায় লতা ? কার কাছে যেতে চায় তা ?—এলোমেলো চিন্তায় চুপ করে থাকা লতার প্রতি মায়ায় আবার আমার সমস্ত মন ভরে উঠলো।

একটু পরে লতা উঠে ওঘরে চলে গেল।

আমার কাছে হঠাৎ বন্ধুত্বের দাবী তোলা, পালিয়ে যেতে চা কথা, সব যেন লতার দুঃখের একটা পাহাড় হয়ে আমার সা এল।—কেন সে আশা করেছিল, আমি তাকে চিঠি লিখবো। হলে আমি তাকে একটু মনে করি, এটা তার ভাল লাগে?— কি তার কোনও দুঃখ লাঘব করতে পারি? লতার মত মেয়ে দুঃখ পায়? সন্ধ্যা থেকে রাত পর্য্যন্ত যতটুকু সুযোগ পেয়েছি, মুখের দিকেই দেখেছি। আর প্রতিবারই মনে হয়েছে, ওকে কাছে টেনে নিই। খাওয়া হয়ে গেলে, লেখার ঘরে বসে অনে গল্প করে, তবে এ ঘরে আসছিলাম, আজ তা পারলাম না— বলতে বলতে আমার চোখ কেবল লতার মুখের ওপর পড় এবার আর আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারছিলাম না, তা করে সরে এলাম।—আমিও পালিয়ে এলাম? লতাও পালিয়ে চায়—আমার সমস্ত গায়ে শিহরণ বহে গেল।

পরের দিন হাওড়া স্টেশনে, ট্যাক্সী থেকে লতার হাত নামলাম। তার হাত দুটোর ছোঁওয়া আমার মনকে লোভী কর একটা কুলী ডেকে সুটকেসটা দিয়ে ভিড়ের অছিলায় ওর হা এগিয়ে গেলাম। ট্রেন তখন প্ল্যাটফর্মে এসে গিয়েছে একটা সে ক্লাশ ফিমেল কম্পার্টমেণ্টের সামনে এলাম। ছোট কামরা একে খালি। লতা উঠলো।—আমিও উঠে কুলীর হাত থেকে সুটকে নিয়ে বাক্সের ওপর রেখে ওকে বিদায় দিলাম। আমাকে সু রাখতে দিয়ে লতা পেছনের দিকে সরে দাঁড়াল। পেছন দি জানলাগুলো বন্ধ। গাড়ীর ভেতর দিকটা তাই অন্ধকার। আমি দিকে সামনে ফিরলাম। গাড়ীর অন্ধকারের মধ্যে লতার গৌর মুখখানা এক মায়াবী রূপ নিয়েছে,—

আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম,—না, মুগ্ধ ঠিক নয়, আমি হারালাম।—লতা বলে উঠলো—সুবীরবাবু····

তার গলার স্বর মুহূর্তে আমার জ্ঞান সঞ্চার করলো।

তার গলার স্বর কেমন উচ্চকিত। আমার মুখে সে কি দেখেছিল! আমাকে কোন কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে লতা প্ল্যাটফর্মে নামলো। মুক্ত আকাশের আলোর তলায়। আর একজন যাত্রিনী এসে উঠলেন।

আমার মুখের দিকে তাকালো লতা, আর ধীরে ধীরে নিজের হাত বাড়িয়ে আমার হাতখানা নিজের দুহাত দিয়ে ধরে থাকলো।

এই প্রথম সে আমার হাত, তার হাতে নিল। লতা আমায় ক্ষমা করলো, লতা আমায় স্বীকার করলো।

তখনও আমি কাঁপছিলাম, এক অজানা ভয়ে,—লতা যদি আমাকে না ডাকতো, তাহলে আমি নিশ্চয় তাকে আমার দুহাতের মধ্যে টেনে নিতাম, আর তার সুন্দর মুখের ওপরে নিজের মুখ—খোলা প্ল্যাটফর্মে ভাবতেও ভয় পেলাম আমি।

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে লতা গাড়ীতে উঠলো। শুধু চোখের ভাষা ছাড়া আর কোন কথার বিদায় বাণী বলা হল না। গাড়ীর দরজা থেকে লতার মুখখানা দেখলাম—এক চাপা কান্নায় ছাপিয়ে গিয়েছে।

মনে হল, আশে-পাশে দুচারজন আমাকে দেখেছে। তারা হয়তো ভাবলো আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা কিংবা স্বামী-স্ত্রী। কি এক আবিষ্ট মন নিয়ে আমি আস্তে আস্তে হাওড়া ষ্টেশন ছেড়ে বার হয়ে এলাম।—সেদিন সন্ধ্যাবেলা-এ কথা সে কথার পর আমি বল্লাম—লতাকে সংসারী হওয়ার উপদেশ দিয়ে রাজী করতে পারলে?

না—ও বিয়ে করবে না। সে ডাক্তার ভূত বোধহয় ওকে ছাড়বে না।

কি করে জানলে? ও কি তোমাকে বল্ল?

প্রায় তাই।—ও নাকি খবর পেয়েছে, সে এখনও বিয়ে করেনি। ওকে আমি বোঝাতে পারলাম না—ডাক্তার বোধহয় কোন দিন বিয়ে করবে না।

আমি এ ঘরে এলাম। গড়িয়ে পড়লাম, ক্যানভাসের চেয়ার খানাতে। সেই এক অনন্য সুখ-স্বাদ, আমাকে দোলায়িত করছিল। ডাক্তার নয়, ডাক্তার নয়—সে কারণ নিশ্চয় আমি। আমি ভাবতে লাগলাম লতাকে।

কেমন আছেন, ডাক্তার সরকার? বীরেশ্বর বকশী এসে হাজির হলেন। সন্ধ্যের এই সময়টা প্রায় একা-একাই কাটায় মণীশ। ডিটেকটিভ গল্প তার খুব প্রিয়। এই সময়টা অলস ভাবে বই নিয়ে কাটিয়ে দেয়। আটটায় খাওয়া-দাওয়া করে ক্লাবে যায়।—তাস খেলা মণীশের আসে না। কলকাতায় থাকতে একটু টেবিল-টেনিস খেলতো। এখানে মাঝে মাঝে ক্লাবের টেবিলে খেলে।

বীরেশ্বর বাবুও একাই বলতে গেলে। রিটায়ার মানুষ। তিনটি ছেলে, চার মেয়ে। মেজ ছেলেটি বোম্বাইতে কাজ করে। বড় ছেলেটি থাকে কলকাতায়। ছোট ছেলে ত চা বাগানে চাকরী করে। সেখানে থাকে।

বীরেশ্বর বাবু বলেন—বিবাহ করেন নি, আপনি খুব ভাল কাজ করেছেন। আমাদের সেই কোন ছোট বেলায় বিয়ে দিয়ে ছিল, ঘানি টানতে-টানতে জিব বার হয়ে গেল।—কোন সুখ নেই এ সংসারে। বেশ কাটিয়ে গেলেন আপনার মামা।

কেন—আপনি তো সব দায়িত্বই শেষ করে ফেলেছেন।

হ্যাঁ, আমার কর্ত্তব্য আমি প্রায় শেষ করেছি, একটা দায় অবশ্য বাকী—এখনও তবে তার জন্য ভাবি না····

মণীশেরও মনে পড়ে গেল, বীরেশ্বর বাবুর বাড়ীতে একটি অবিবাহিতা মেয়েকে দেখেছে। কোনদিন চা-খাবার দিয়ে যায়। বীরেশ্বর যেমন অনেকে দেখেছে, বাড়ীর মেয়েদের এনে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, এঁর তেমনটি আছে বলে মনে হয়

না। হয়তো একমাত্র চাকরটি বাইরে গিয়েছে, মিসেস বকসী রান্না বা কাজে ব্যস্ত, মেয়েটি চা দিয়ে চলে যায়।

মিসেস বকসী যেন একটু বেশী স্নেহপরায়ণা। গেলেই চায়ের সঙ্গে কিছু না কিছু পাঠিয়ে দেবেন। প্রথমটা মণীশ ভাবতো, এই অতি সাধারণ অবস্থার মানুষ, এঁরা তাকে বড়লোক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ইত্যাদি ভেবে একটু খাতির বেশী করছেন। কিন্তু ক্রমশঃ তার মনে হল, না, এর সঙ্গে তাঁর স্নেহের যোগ আছে। বয়স্কা বা অল্পবয়স্কা কোন মহিলাকেই মণীশ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।—তবু এতখানি বয়সে কোন স্ত্রীলোকের স্নেহ বঞ্চিত থাকা জীবনে মিসেস বকসীর স্নেহ যত্ন মাতৃসুলভ কথাবার্ত্তা ভাল লাগতো নয়, কেবল যেন একটু আকর্ষিতও করেছিল।

কিছুই নয় মিল্ক স্যাণ্ডুইচ খেয়ে মণীশ ভাল বলেছিল····

মিসেস বকসী বলে ওঠেন—আমার সুরেশ্বর, কি ভালইবাসে এই মিল্ক স্যাণ্ডুইচ খেতে—বাড়ী এলেই বলে "মা····আজ করবে কিন্তু।" চল্লিশ বছরের ছেলে স্যাণ্ডুইচের জন্য চার বছরের ছেলের মত করবে।

মণীশ অবাক হয়ে যায়—চল্লিশ বছরের ছেলে, মার কাছে এমন করে খাবারের জন্য আবদার করে!····সত্যি····মা থাকা····কি····মা কেমন। ওর মা থাকলে কি সে এমন করে আবদার করতো?

মণীশকে ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখে বীরেশ্বরবাবু উঠে পড়লেন, তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গিয়েছে এমনভাবে বললেন—শনিবার দিন সন্ধ্যাবেলা যাবেন কিন্তু। বিশেষ কিছু এমন নয়, জন্মদিন····ওর মা-ই····ঘরে একটু যা হোক করেছেন····আমাকে বলে দিলেন আপনাকে বলতে।

ও! আচ্ছা নিশ্চয়ই যাব····আপনি মিসেস বকশীকে বলে দেবেন····

একেবারে রাতের খাওয়া কিন্তু।

ঠিক আছে, বলে মণীশ।

বীরেশ্বরবাবু চলে গেলে মণীশ খাওয়া-দাওয়া করে ক্লাবে রওনা

হল। এখানকার অফিসারস ক্লাব। এখানেও নানা ধরণের লোক আছেন মহিলার দল আসেন কিন্তু খোলাখুলি জায়গায়, মণীশ ভয় পায় না। লণ্ডন সহরে কাটিয়ে এসেছে। তবে মণীশের ভাগ্য সে এক বাড়ীতে পেয়িং গেষ্ট ছিল। বয়স্ক দম্পতি সন্তানহীন স্বামী স্ত্রী। আর ইংরাজের স্বভাবসুলভ নির্বিকারত্ব ছিল। মাপা ব্যবহার প্রয়োজনটুকুই পর্য্যাপ্ত। মিসেস উড ঠিক দরকার ছাড়া কোন কথা কোনদিন বলেন নি। আমাদের ভারতবর্ষও ক্রমশঃ তাই হয়ে উঠছে। অন্যজন কি করছে তার খোঁজখবর বড় একটা কেউ রাখতে চায় না। পরস্পরের প্রতি একটা নিস্পৃহতা,....তবে যার প্রয়োজন সে ঠিক অন্যকে সন্ধান করে নেয়।

তেমনি বুঝি বকসী দম্পতি খুঁজে নিয়েছিলেন মণীশকে। কেবল স্বজাতি বলে নয়, অর্থবান উচ্চপদস্থ চাকুরে বলেও কিছুটা। এখানে অবশ্য অনেকেই জানতো বকসী পরিবারের আসল ইতিহাস। কিন্তু মণীশকে কেউ সেকথা বলে দেয় নি।....হয়তো তেমন করে কেউ লক্ষ্য করেনি।

শনিবার দিন সকালে মণীশ একবার ভাবল, ওই মেয়েটির জন্মদিন, তবে কি কিছু উপহার নিয়ে যাবে? তারপর ভাবলো, যার সঙ্গে একটা কথাও এ পর্য্যন্ত বলেনি, তেমনি একজনকে উপহার দেওয়াটা ঠিক সৌজন্যমূলক হয়তো হবে না।....তাছাড়া কোন লোকের সঙ্গেই বেশী জড়িয়ে পড়ার পক্ষপাতি নয় মণীশ। ছোটবেলা থেকেই একা একা থাকতে অভস্ত সে।....বিনা উপহারেই গেল মণীশ।

একেবারে অন্য কেউ নেই নয়, দুচারজন নিমন্ত্রিত মহিলা পুরুষকে মণীশ দেখলো।....

আসুন, আসুন করে—আপ্যায়ন করলেন, বকশী দম্পতি। বীরেশ্বরবাবু গদগদভাবে মণীশের পরিচয় দিলেন। মণীশের মামা তাঁর বন্ধুজন ছিলেন....তিনি যে কৃশ্চান সমাজের জন্য কতখানি করে গিয়েছেন তার বর্ণনা দেওয়ার পর, মণীশের গুণ কীর্ত্তনের পালা হল

কিছুক্ষণ, স্বামী এটা অল্প কথায়—সুরু করবার পরে স্ত্রী তাকে অনেক ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে শেষ করলেন। আর লোকের সামনেই সেই লোকের গুণ গাইবার চমৎকার আর্ট জানতেন মিসেস বকসী···· গুণবান ব্যক্তিটির তখন চুপ করে শোনা ছাড়া আর কোন উপায় থাকতো না।

ছোটখাট দু একটা উপহার যেন দিয়েছে কেউ কেউ মনে হল মণীশের। খেতে বসা হল। মণীশ এটা স্বীকার করবে হাতের রান্নাটা মিসেস বকসীর ভালই। আর খুব পরিপাটি ব্যবস্থা সব কিছুতেই।

খাওয়ার পরে····পান-মশলা দেওয়ার সময়ে পানটা পাত্র সমেত একজায়গায় দেওয়া হল। মণীশ পান খায় না। মশলার পাত্রটি নিয়ে বকসীর মেয়ে মণীশ যেদিকটায় বসেছিল, সেইখানে একটি ছোট টিপয় টেনে রেখে দিয়ে এল।····পানের সঙ্গে না রেখে না আলাদা মণীশকে দেওয়াটা যেন উভয়ের মধ্যে বেশ আলাপ পরিচয় আছে। পরিচিত জনের সুবিধার জন্য কাছে টেনে এনে দিল। ওই পর্য্যন্তই। মশলার পাত্রটা কাছে দিয়ে, চুপ চাপ শান্তভাবে ভেতরের ঘরে চলে গেল অজিতা।

এই বকসী দম্পতি ছিলেন, যাকে বলে খেলোয়াড় দম্পতি। যেন ঠিক কোন মাছটি ধরতে হয়, তা চমৎকার জানতেন।····বিশেষ করে এ বিষয়ে মিসেস বকসী একেবারে অল রাউণ্ডার ছিলেন। তিনটি মেয়ের বিয়েই এইভাবে জাল ফেলে ধরে দিয়েছেন। এই ছোট সহরের মধ্যে এমন কোম্পানী····এখানে সব বাছাই করা ভাল ছেলেরা চাকরী নিয়ে আসে।····বিশেষ করে যারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা আসে—তাদের মধ্যে থেকে নিজেদের মনোমত পাত্রটি খুঁজে নিয়ে কাউকে দিদির স্নেহ দিয়ে, কাউকে বৌদির মত আদর দিয়ে····ক্রমশ একেবারে আপন করে নিয়েছেন।····এদের মধ্যে আবার অনেকে স্বেচ্ছাতেই কিছুটা এগিয়ে আসার ফলে জড়িয়ে

গিয়েছেন। বড় মেয়ে সুজাতার বিয়ে দিয়েছেন····খাঁটী হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে এখানে এসেছিল, সদ্য ইনজীনীয়ারিং কলেজ থেকে বার হয়েই। মেজ স্বাগতা, জাতিতে একটু কমা হলেও বিরাট কনট্রাক্টারী ফার্মের অংশীদার ছেলেটি এখানে এসেছিল, কোম্পানীর কিছু বিলডিং এর চার্জ নিয়ে।····ছোট সহরের পুরাতন বাসিন্দার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ছিল, গল্পগাছা করেছিল, পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির—তাকেই আলাপ করে নিয়েছিলেন বকসী বউদি। অবশ্য তখন তিনি, আর বৌদি রইলেন না। পারমিতা, গৌহাটি কলেজে পড়বার সময়েই প্রায় পাকড়ে রেখেছিল সহপাঠীর এক দাদাকে। নামকরা ছাত্র। বাকীটুকু পূর্ণ করে দিলেন মা····বাড়ীতে আসবার নিমন্ত্রণ গ্রহণের পর। —সে মেয়ে জামাই এখন এমেরিকায় থাকে। ছোটটির জন্য এখন গেঁথে তুলতে পারলেই হয়।

কোন ছেলে, কেমন প্রকৃতির, সে কি চায়, সে কিভাবে মানুষ, কি ভাবে অভ্যস্ত, এটা বড় সহজেই বুঝতে পারতেন মিসেস বকসী। —আর সেই ভাবেই চালিয়ে যেতেন তাঁদের সুকৌশলগুলো। খুব বেশী যায়গাতে হতাশ হতে হয়নি তাঁদের।

তাই বীরেশ্বরবাবু হয়েছিলেন কর্ত্তব্যপরায়ণ, অথচ্ উদাসীন গৃহকর্ত্তা।—মিসেস বকসী হয়েছিলেন মায়ের মত মমতাময়ী। শিশুকালে পিতৃমাতৃহীনের কাছে····এটার একটা কল ফলাবেই।

ঠিক এমনি শুধু আসা যাওয়ার আলাপেই কেটে গেল সাত-আট মাস। মণীশ বকসী পরিবারের প্রতি কিছুটা সহজ সরল হয়েছিল।···· ক্রমশ মিসেস বকসী একটু অসুস্থ হতে আরম্ভ করলেন····বুকে একটু হাঁফ ধরা, পেটের বাঁ দিকে কেমন ব্যথা····সকলে কোন মতে ওঠেন, বিকেলের দিকে আর পারেন না যেন।····স্নেহপরায়ণা এই মহিলাটির প্রতি মণীশ কেমন শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েছিল। মণীশের দেখাশোনার ওপরেই ছিলেন মিসেস বকসী। সন্ধ্যে বেলা নিজে চলে ও বাড়ীতে···· কেমন আছেন জানা, কোন অসুধে কাজ না হলে, অন্য অসুধ ঠিক

করা। মিসেস বকসীর ঘরে বসে থাকার মধ্যে মাকে জল দিতে অসুধ দিতে, মণীশকে চা-খাবার দিতে, কিংবা এটা নিতে মেয়েটি বারে বারে আসতো। প্রথমটায় কেমন অস্বস্তি বোধ হত মণীশের। কিন্তু মেয়েটির শান্ত ভাবের জন্যে আস্তে আস্তে সেটা কেটে এসেছিল। প্রায় একমাস মত, অসুস্থ আবার সুস্থ এমনি ভাবেই কাটছে মিসেস বকসীর। অনেকদিন বকসী বাড়ী থেকে ফিরে এসে মণীশ আর ক্লাবে যেত না। ফিরে এসে মিসেস বকসীর অসুখের কি কি অসুধ ঠিক করা যায় ভদ্রমহিলা ভুগছেন—বেশ। তাই ভাবতো।

এদিক ক্লাবে মণীশের আসা প্রায় বন্ধ দেখে, অনেকের মধ্যেই চাপা চাপা কথা বার্ত্তা—তাহলে' সরকার, বকসী ফাঁদে পড়েছে?

ওকে কিন্তু বেশ কঠিন মনে হয়েছিল।

একজন বল্লেন ভালই হয়েছে এ অবিবাহিত····আর ওদের মেয়ে আছে····

তা-যা বলেছো, তা ভোজটা লাগছে কবে?

তাস ভাজতে ভাজতে খেলোয়াড়রা যেন কিছু হাসির কথাই বললেন।

টেবিল টেনিস টেবিলে ডাক্তারের কিন্তু বেশ হাত খুলছিল।····

হ্যাঁ····তা খুলছিল,····তবে ওদিকে শুনছি বরাত খুলতে চলেছে।····

কি রে বাবা····লটারীর টিকিট পেয়েছে নাকি····

তার চেয়েও বড়—স্ত্রী লাভ হচ্ছে। ডাক্তার যে আজকাল বকসী বাড়ীতেই আড্ডা গেড়েছে····

মিসটার চৌধুরী বলে ওঠেন—না—না এটা ঠিক নয়, ওকে সাবধান করে দেওয়া উচিত····

আহা, ডাক্তার যেন নাবালক, তাছাড়া এমন চেহারা এমন চাকরী আইবুড়ো কার্তিকটি থাকাই বা কেন? একজনের মেয়ে যদি সুপাত্রস্থ হয়—ই—তাতে তোমার আমার ব্যাগড়া দেওয়ার দরকার কি?

তার ওপরে যখন ঘরে বরে মিল রয়েছে, নিজের গেমটা শেষ করতে করতে বললেন ইনজীনীয়ার চ্যাটার্জি।

আরে বাবা রিটায়ার করবার পরেও এই সহরের প্রায় বাইরে পড়ে থাকার উদ্দেশ্যই তাই বকসী সাহেবের। আসাম-ওয়েল কোম্পানীর বড় চাকুরী পাওয়া—তাজা ছেলেদের মধ্য থেকে মেয়ের বর বাছাই করবার জন্যেই তো····

গগন বড়ুয়া বলেন—তা ওই মেয়েটা কোন অংশে অমন ছেলের উপযুক্ত।

প্রত্যেক দিন হেরে যাওয়া ভাগ্যের ওপর দারুণ বিদ্বেষী সুরথ বকসী বলেন—আরে বাবা যারা সব দিক থেকে সব সেরা সেরা ভাবে পেয়েছে—একদিকে তারা একটু কমই পাক না।

অর্থাৎ এই ঘটনাটা যাদের লক্ষ্যে এসেছে—তারা জানে, এই জাল থেকে আর ডাক্তার সরকারকে বার হতে হবে না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা, গিয়ে মণীশ দেখে, মিসেস বকসীর ঘরের আলো জ্বালা নেই, পর্দ্দাটানা। মণীশ একটু দাঁড়ালো।

অজিতা এসে বল্ল—আপনি একটু এ ঘরে বসুন····আজ সারা দুপুর বিকেল পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট পাওয়ার পরে সবে একটু ঘুমিয়েছেন মা।

মণীশ—আমি তবে যাই, বলে বার হয়ে যেতে গেল।

অজিতা মায়ের অসুখের ভাবনায় দিশেহারা হয়ে যাবার মতন ব্যস্ত হয়ে বলে—কোনও ওষুধ—বদল করে বা লিখে দিয়ে যাবেন না?

মিষ্টার বকসী কোথায়?

বাবা এইমাত্র একটু বার হলেন—সারা দিনই মার কাছে ছিলেন।

উনি এলে পাঠিয়ে দেবেন।

মণীশ বার হয়ে গেল। সকাল বেলায় বীরেশ্বরবাবু গেলে মণীশ বলে মিসেস বকসীকে সদরের বড় হসপিটেলে দেখাবার ব্যবস্থা করুন····

কেন? কেন? আপনি কি, কিছু কঠিন ব্যাপার মনে করছেন?

না তা—নয়····তবে আমি হয়তো এমনি দেখে কিছু বুঝতে

পারছি না····হয়তো বাড়ীতে অনিয়ম হচ্ছে। রোগীর পক্ষে হাসপাতালই সবচেয়ে ভাল।

অন্য পথ ধরতে হবে। মায়ের অসুখের চিন্তায় ব্যাকুল মেয়ের দিকে চোখ ফেরানটা খুব সুবিধের হল না।

বদলে দেওয়া অসুধটা খেয়ে ক্রমশঃ ভাল হয়ে উঠতে লাগলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরে নীল মৃদু আলোয় অ্যাপ কালারের পাউডারের মৃদু প্রলেপে বেশ রুগ্ন বিষাদ মেকআপ নিয়ে, বসে থাকতেন মিসেস বকসী····তাঁর খাটের পাসেই মণীশকে বসতে দেওয়া হত····আর অজিতা কিছু কিছু খাবার রেখে যেত। নিজের সুরেশ্বর বীরেশ্বর তেজেশ্বরের কথা মনে করাতে করাতে মণীশকে নিজের আসনে রেখে খাওয়াতেন, এই সময়ে দু একজন মহিলা পুরুষও আসতেন।

কেউ হঠাৎ এসে পড়তেন····কিন্তু বেশীর ভাগকেই হয়তো সামান্য চা এর নেমন্তন্ন····কিংবা মিসেস বকসী অসুস্থ যেতে পারছেন না একা ভাল লাগছে না। যদি খবর পেয়ে আসেন। এঁরা এই ছোট সহরটারি বাসিন্দা।—ছোট সহর হলেও তার দোকান পসার, ইস্কুল, সিনেমা সবই কিছু কিছু থাকে কিছু কিছু অন্য বাসিন্দা। রিটায়ার হয়ে যাওয়া কিছু লোকও থেকে গিয়েছেন।

তাঁরা এসে দেখতে পান, বেশ পারিবারিক পরিবেশে এখানে যাতায়াত করছে মণীশ বার বার।

এর মধ্যে সকলের সামনেই অজিতা জিজ্ঞাসা করছে—আপনাকে চা দেব?

সংক্ষেপে হ্যাঁ বা না, বলেছে মণীশ। মিসেস বকসীর মমতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে মণীশ।····সন্ধ্যাটা মণীশ এলে তাঁর ভাল লাগে। দু একখানা মিল্ক স্যাণ্ডুইচ বা ঘরে করা ভেজিটেবিল প্যাটিশ, কি টেক্কা নিমকী বা মোহন ভোগ না দিয়ে পারেন না বাড়ীছাড়া মাতৃহারা মণীশকে। ক্রমে-ক্রমে অজিতাও সহজ এল মণীশের কাছে।

কোনদিন কোন খাবারটা, কেমন হয়েছে, কিংবা মা একটু

মাছের শরষে বাটার ঝাল খেতে চাইছেন····দেব কিনা····এসব দিয়েই কথার শুরু। তবু অজিতা বুঝতে পারতো, এ মানুষটি প্রশ্নের উত্তরই কেবল দিয়ে যাবে, প্রশ্ন করবে না কোনদিন।

এদিকে ক্লাব থেকে বাইরে····বাইরে থেকে অফিসে····একটু একটু গুঞ্জন উঠতে লাগলো। অজিতার জন্ম দিনের দিন সকাল বেলাই পাঠিয়ে দেয়া দামী শাড়ী, অনেকে স্বচক্ষে দেখেছেন।—চা খাবার খাওয়া দেখার লোকের অভাব হয়নি····অসুস্থা মহিলা শুয়েই থাকেন····সেখানে দুজন যুবক যুবতী তাঁর শিয়রে চুপচাপ বসে থাকে না নিশ্চয়ই, কিন্তু মণীশ এতবড় চাকরী করে যে এসব কথা তার কানে তোলার মত সাহস সাধারণের থাকে না।····যারা প্রায় তার সমান তারা ওসব কথা ওই ঠাট্টা ইয়ার্কী পর্য্যন্তই রাখে—এসব বলে অপ্রিয় হবার বা নিজেকে খেলা করবার অথবা অন্যের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে নাক গলাবার দরকার মনে করে না।

এরপর মিসেস বকসী ভাল হলেন····মণীশ গিয়ে দেখলো ওঁরা নেই—অজিতা বল্ল—আপনি বসুন ওঘরে। মা বাবা এখুনি আসবেন, কি কাকাকে যেন বল্ল, দেখতে গিয়েছেন একটু—নিজেই বলছে এমনি ভাবেই বল্ল—বাড়ীতে এতদিন বন্দী থেকে মা যেন হাঁফিয়ে গিয়েছেন। আপনার কথা বলে গিয়েছেন····বসুন····আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সত্যিই সে ভেতরে চলে যায়····চাকরেই চা-টা দিয়ে যায়। একটু পরেই বকসী দম্পতি আসেন।

মণীশও মানুষ—প্রায় প্রত্যেক দিন যেতে যেতে আর বাড়ীর ছেলের আদরে বাড়ীতে তৈরী খাবার খেতে খেতে তার মনেও বুঝি একটা নেশা লেগেছিল। সমস্ত বাড়ীটায় মহিলাদের হাতের ছোঁয়ায় যত্ন।····মাঝে মাঝে বেশী দেরী হতে থাকলো বকসী দম্পতির ফিরবার। চলে আসতে চাওয়া মণীশকে অজিতা বসিয়ে রাখতো—মা খুব দুঃখ পাবেন, আপনাকে একটা ম্যাগাজিন দেব।

ম্যাগাজিন, আচ্ছা দিন····হাত ঘড়িটা দেখে মণীশ। সেই ঘরেরি

একদিকে গা আলমারীর থেকে ম্যাগাজিন বাছে অজিতা। অনেকক্ষণ ধরেই বাছে। একলা ঘরে যতক্ষণ নিজেকে মণীশের চোখের সামনে রাখা যায়।....কিন্তু মণীশ তাকিয়ে থাকে একেবারে উল্টাদিকে।

দিন চলে যায়, মা যা আশা করেন, তার কিছুই পূরণ করতে পারে না অজিতা। কিন্তু অজিতাও একটি মেয়ে। নিজের আত্ম সম্মানবোধ, রমণীসুলভ গর্ববোধ সবই আছে। যে লোক ফিরে তাকাবে না স্থির করেছে, যে লোক তাকে প্রায় সাপের মত পরিহার করে তাকে নিজের দিকে ফেরাবে অজিতা।

ম্যাগাজিন বাছা শেষ হবার আগেই মণীশ বলে, থাক আমি এখন চলেই যাব। চলেই যায় সে। অজিতার ফিরে দাঁড়ানো মুখের দিকেও তাকায় না সে। কেমন এক লজ্জা আর অপমান বোধে ভেঙ্গে পড়ে অজিতা।

পাটনায় ফিরে গিয়ে নিরাপদে পৌঁছবার খবর দিয়েছিল লতা। লেখার নামেই দিয়েছিল। তারপরের চিঠির উত্তর এসেছিল বহুদিন বাদে....লেখা লতার শারীরিক অসুখের কথা ভেবে টেলিগ্রাম করবে ভাবছিল। লতা লিখেছে....পড়ার জন্য ও খুব ব্যস্ত আর এখন অ্যাসিসট্যাণ্ট হেড মিস্ট্রেস হওয়ার ফলে কাজও বেশী, এই সব। আমার আর লেখার নাম মিলিয়ে—আমাদের মেয়ের নাম রেখেছে সুরেখা।....দেওয়ালীর ছুটিতে জামতাড়া যেতে পারে।

আমি লতাকে কোন চিঠি লিখিনি। আগে হলে পারতাম, কিন্তু নিজের ভেতরটা দুর্বল হয়ে যাবার জন্য আর পারলাম না। আমিও যেন ব্যস্ত হয়ে গেলাম....কবে দেওয়ালী, লেখা নিশ্চয়ই যেতে চাইবে।

লেখা কিন্তু সুরেখা নামটা পছন্দ করলো না....সে মেয়ের নাম রাখলো সুলতা।....তার ইচ্ছা তার মেয়ে মনে প্রাণে লতার মত হোক। তবে পাগলামীটুকু বাদ দিয়ে।

দেওয়ালী এল····আমারও যাব ঠিক, কিন্তু বড়মার চিঠি পেল লেখা লতা আসবে না এখন····ওরা কজন মেয়ে গৌহাটি শিলং বেড়াতে যাচ্ছে।

গৌহাটি-শিলং কেন? আমি যেন প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। তবে তবে কি—ডাক্তারের জন্যে লতা নিজেই বার হয়েছে—লেখাও ঠিক বুঝতে পারলো না, এই কার্ত্তিকের শীতে লতা কেন এখন যাচ্ছে। বেড়াতে নয় নিশ্চয়ই—লতাকে সে যতদূর জানে নিজে থেকে যেচে সে কোনদিন ডাক্তারকে ডাকবে না।····ডাক্তার আসবে, নিজেই আসবে। তবে কি এতদিনে ডক্তার তার সঙ্গে যোগাযোগ করছে। সেই কোন্ ছোটবেলার দেওয়া কথা সে কি মনে করে রেখেছে? সে তো জানে না লতা এমন করে তার জন্যে বসে আছে।

মামুলী বেড়াতে যাওয়ার মত করে জামতাড়া ঘুরে এলাম। লতা বাড়ীতেও জানায় নি সে কেন ওখানে যাচ্ছে। সুরবালা দেবী বা শশীনাথবাবু লতাকে সে কারণ জানাতেও বলেন নি। এই সময়ে আমাদের অফিসে একজন এলেন····তিনি অবশ্য কেমিষ্ট নন অ্যাকাউণ্টাণ্ট····তাঁর বাড়ী আসামে। তিনি আসামের কোন অঞ্চলের লোক ঠিক জানতাম না····বর্ত্তমান দিনের মেয়ের বিয়ের সমস্যার কথা বলছিলেন, আমাদের একজন শ্যালিকা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন তিনি। আসামবাসী আর কলকাতায় শিক্ষা দীক্ষা—এহেন মারাঠী গণেশ পাণ্ডে চমৎকার বাংলায় বলে ওঠে—কারও সঙ্গে লাগিয়ে দিতে পারছেন না।—আরে আমার দাদা থাকেন নাহারকাটিয়ায় আমিও সেই আসাম অয়েল কোম্পানীতেই ছিলাম, বেটার চান্স পেয়ে এলাম। ওখানকার মিসেস বকসী তো তিনটে মেয়েই পার করেছে। ওই লাগিয়ে দিয়ে এবারও পাকড়াও করেছে—ভাল, বিয়েটা দেখে আসা হল না। মণীশ ডাক্তারের বিয়েটা হয়তো হয়েই গেল।

প্রথমে অত কান করিনি একথায়, মণীশ ডাক্তার নামটায় যেন বিদ্যুতের চমক খেয়ে উঠলাম····মণীশ ডাক্তার?····মণীশ সরকার কি?

হ্যাঁ হ্যাঁ মণীশ সরকার এম. আর. সি. পি., চেনেন নাকি! Looks

like Adonais। ভাগ্য ভাল লোকটার, চেহারা, বিদ্যা, চাকরী, আড়াই হাজারী ম্যান··· তবে স্ত্রী ভাগ্যটা ভাল হবে না। ওর কাছে কিছুই নয়, অতি সাধারণ, তবে সেই····যার যাতে মজে মন।

আমি যেন, আর কিছুই শুনছিলাম না। বিয়ে হয়ে গিয়েছে। নিজের সব কথা ভুলে গিয়ে লতার জন্য সমবেদনায় মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠলো।····লেখা বলে, লতার স্থির বিশ্বাস, ডাক্তার আসবে। কি সহ্য করবে লতা। কেন ওই মেয়েটার ভাগ্য এমন হল। মণীশ ডাক্তার অন্যত্র বিয়ে করার চেয়ে যেন সে এসে লতাকে বিয়ে করছে এ সহ্য করা আমার পক্ষে অনেক সহজ ছিল।—কোথাকার খবর কোথায় আসে, কি ভাবে আসে।····আমার কাছে এ খবর এল কেন? —নাই বা জানতাম আমি····স্বপ্ন নিয়ে লতা বেশ ছিল। তবে কি এই খবর পেয়েই লতা আসাম ছুটেছিল? ওরা কি গৌহাটি এসে বিয়ে করেছিল, এই শীতে হনিমুন গিয়েছিল শিলংএ।

আমি ভাবলাম—অন্তত লতা এখবর জেনেছে কিনা—না জানবার আগে লেখাকে জানাবো না।

বড় দিনের উপহার পাঠিয়েছে লতা। তার ছোট সুরেখার জন্য। লেখার জন্য আমার জন্য কার্ড। কিন্তু তার মধ্যে ডাক্তারের বিয়ে হওয়ার খবর কিছু নেই, বা ডাক্তারের জন্য কোন খবর নেই। —আমিও কিছু বলিনি লেখাকে।

এর পরে দিন কেটে চলেছে, কিন্তু জানতে পারিনি, লতা আর ডাক্তারের বিয়ের খবর পেয়েছে কিনা। সাধারণ কৃশ্চান সমাজে যারা একটু প্রতিষ্ঠিত হন, তাদের বিবাহের খবরের কাগজে দেওয়ার চলন আছে।····তাই লক্ষ্য রেখেছি, বিবাহের বিজ্ঞাপনে····তবে····আমি থাকি বাংলায়, লতা বিহারে, ডাক্তার থাকে আসামে।····কখনও বার হয়ে থাকলে কেউ না জানাতে পারে।—এম. এ পরীক্ষা দিয়ে লতা জামতাড়ায় এসেছিল, কিন্তু আমাদের মেয়েটি অসুস্থ থাকায় লেখা যেতে পারেনি। বড়মাকে নিয়ে লতাকে আসবার জন্য লিখেছিল।

কিন্তু এটা ওটা, ছুতো তুলে ছুটী নেয়া প্রায় একমাস····লতা জামতাড়ায় কাটিয়ে পাটনা চলে যায়।

আমি বুঝে উঠতে পারলাম না কেন লতার এই অনিচ্ছা। তবু ভাবলাম, খেয়ালী মেয়েটি হয়তো আবার এক খেয়ালে ছুটে আসবে।

লতার এম. এ পাশের খবর বার হল। সেকেণ্ড ক্লাশ প্রথম হয়েছে সে। ইংরাজীতে এম. এ পাশ করেছে লতা।····লেখার ইচ্ছা লতা যদি কোনও ভাল চাকরী পেয়ে শশীবাবুকে নিজের কাছে নিয়ে যায় তাহলে বড়মাকে সে নিজের কাছে এনে রাখতে পারে। শশীবাবু জামতাড়ায় থাকলে তা সম্ভব নয়। শশীবাবু সম্বন্ধে লেখার মনে একটা অন্য ধরণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আছে।

লেখা প্রায় রাগ করে বলে যথেষ্ট বড় হয়েছে বাবার কষ্ট বোঝা উচিত।

লতা যদি ওঁকে জোর করে নিয়ে যায় তাহলে উনি না গিয়ে পারবেন না।

কিন্তু থাকে হষ্টেলে····মাইনেও তেমন কিছু নয়····

কেন এখন তো অন্য জায়গায় চেষ্টা করতে পারবে। হয় বিয়ে কর—না হয় যাতে বাবার কষ্ট দূর হয় কর····অমন মানুষ, ছেলে-মেয়েরা তাঁর ঠিক দুঃখটা বুঝলো না। এই যে এতবড় মেয়ে বিয়ে থা না করে রইল এটা কোনও বাবার ভাল লাগে।

লতার চিঠি এল····আমার এম. এ. পাশের খবরে বাবা বড়মা এত খুশী হয়েছেন, ওঁরা পাটনায় ছুটে এসেছেন।····বাবার যদি টাকা থাকতো, আমি জামতাড়ায় একটা স্কুল করতাম। ওখানে একটা স্কুল দরকার। আমি বোধহয় দার্জিলিং-এ একটা চাকরী পাব। বড়মা, বাবা খুব খুশী হয়েছেন।

শশীবাবু খুবই খুশী হয়েছিলেন। তার জীবনের সব দুঃখ যেন, মেয়ে এম. এ পাশ করার জন্য ভুলে গিয়েছিলেন। বড় আঘাত দিয়ে ছেলে চলে গিয়েছিল····আজ মেয়ে যেন তাঁকেই গৌরবে

পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। সুরবালা দেবীও আনন্দ পেয়েছিলেন ঠিক অমনি করেই। লেখা সংসার পেয়েছে কিন্তু লতাকেও যেন ভগবান বিমুখ করেন নি।....মেয়ের বিয়ে হয়ে না থাকার জন্য শশীবাবু মাঝে মাঝে চিন্তা করতেন....আজ আর সে চিন্তা রইল না। কৃতী মেয়ে তাঁর। পাটনায় এসে যেন নতুন জীবন পেলেন শশীবাবু। সুরবালা দেবী যেন বেশী বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন, কিন্তু নিত্য কঠোর পরিশ্রম ও একেবারে নিয়মমত থাকার ফলে শশীবাবু এখনও বেশ শক্ত। পুরাণো এবং বিশ্বাসী চাকর মতিয়ার হাতে বাড়ী ঘর ছেড়ে তাঁরা পাটনায় চলে এসেছেন। এখন কয়েকদিন থাকবেন। উঠেছেন এক মহিলার বাড়ী। এখন শশীবাবু ঠিক করলেন, আরও কিছুদিন থাকবেন। পাটনায় এসে চেনা জানা বহু বাড়ীতেই নিমন্ত্রিত হলেন তাঁরা। যেন ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। ছেলের মৃত্যুর পরে, শশীবাবু ভাবতে পারেন নি যে তিনি আবার পাটনায় আসতে পারবেন। কিন্তু মেয়ের পাশের টেলিগ্রাম পেয়েই হঠাৎ তিনি কঠি করেন পাটনা যাবেন।

শশীবাবু পাটনা গিয়েছেন খবরে লতা খুবই আশ্চর্য্য হয়ে যায়। ছেলের মৃত্যুর পর যখন তাঁকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে সকলে এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলে শশীবাবু বলেছিলেন ...না....পাটনায় আমি আর এ জীবনে যেতে পারবো না।....সুরবালা দেবী গিয়েছিলেন। শেষবারের মত, সে মুখখানা না দেখে তিনি থাকতে পারেন নি। আমার খুব ইচ্ছা হয়েছিল—লেখা এই সময় পাটনা যাবার ইচ্ছা করে। কিন্তু লেখা তা করে নি।

আমি বল্লাম, লতিকাদেবী যা খেয়ালী, এবার না বিলেত যাবার চেষ্টা করে বসেন....

লেখা বলে—ও টাকা পাবে কোথায়? মামাবাবুর তো বলতে

গেলে ওই জমিটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই। সামান্য যদি চায়ের শেয়ার থাকে।

পাঁচ বছরের ওপর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে····কিন্তু কোনদিন আমি ওঁদের কারও—শশীবাবু, সুরবালা দেবীর····আর্থিক বিষয়ের কোন খবর জিজ্ঞেস করিনি। লেখাও বলেনি।····বরং লতাই একটু বলেছিল।····

আমি বল্লাম—কোন মিশনের সাহায্য জোগাড় করবে····তাছাড়া টীচারদের পাওয়া খুব সহজ····

করলে খুব অন্যায় করবে।····তবে শুনেছি ডাক্তার বিশ্বাসের কিছু সাহায্য আছে—উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে····

আবার সেই ডাক্তার, কথাটা আমার ভাল লাগে না। বলি, লতা কি ডাক্তারের কাছে আবেদন করবে নাকি?

আমার মনে হয় না, লতা ডাক্তারের কাছে কোন কিছুর জন্য আবেদন করবে। তবে এখন এম. এ. পাশ করেছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা হওয়া বিচিত্র নয়, তবে অন্যভাবে চেষ্টা করবে। এখন ওর আদর্শ হয়েছেন আমাদের স্কুলের প্রিন্সিপাল, মিস দাস। তিনি বিলাত ইত্যাদি সবই ঘুরে এসেছেন।

পাটনা থেকে ভাই বোন ফিরে এসেছেন। প্রায় দেড়মাস ছিলেন তাঁরা। কালিংপএ চাকরী নিয়েছে লতা। ভাল মাইনে ছুটিতে বাড়ী আসবার ভাড়া সব কিছু পাবে। পাটনা থেকেই লতাকে রওনা করিয়ে দিয়ে শশীবাবু জামতাড়া ফিরেছেন। পাটনায় থাকতে এম. এ পাশ করা মেয়েকে নিয়ে একটা ফটোও তোলেন শশীবাবু। তিনি ও সুরবালা দেবীর মাঝখানে লতা। বড়মা তার এক কপি লেখাকে পাঠিয়েছেন। আর চিঠিতে লিখেছেন। শশীর এতদিন পাটনায় থাকবার আসল ইচ্ছা ছিল লতার জন্য পাত্র স্থির করা। তার এখন একান্ত ইচ্ছা লতার বিয়ে হয়। এক ছোটবেলার সম্বন্ধ ধরে বসে থাকা তার উচিত হয়নি। শশীর ধারণা লতাও এখন অরাজী হবে

না—কারণ পড়া তো শেষ করেছে। আমাদের সেই শিশির সমাদ্দার বাবুকে তোমার মনে আছে? তাঁর ছোট ভাইটি বড় ভাল ছেলে। ছেলেটি এম. এস. সি পাশ টাটা কোম্পানীতে চাকরী করে। শিশির বাবুর কোন ছেলেপুলে নেই সম্প্রতি স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। শশীর ভারি ইচ্ছে ওই ছেলেটিকে জামাই করে। আমরা থাকবার মধ্যেই ছেলেটি বাড়ী এসেছিল। আমরা শেষ কিছুদিন শিশির বাবুর বাড়ীতেই ছিলাম, ফলে লতার সঙ্গে ছেলেটির আলাপ হয়েছে।

এসব এখনও শশীর মনে মনেই আছে····এখানে এসে আমাকে বলে। ছেলেটি সব দিক থেকেই ভাল উপযুক্ত। রংটাই ময়লা, তাই আমার মনটা কেমন লাগছে। তবে গুণবান ছেলে। ঈশ্বর যা করবেন····তাই হবে। তাঁরই মঙ্গল ইচ্ছাতে সব কিছু হয়। ইত্যাদি····

চিঠি পড়া শেষ করে লেখা বলে, মামাবাবু খুব ঠিক কাজ করছেন।····দেখা যাক লতা পাগলামী ছাড়ে কিনা····

লতা পাগলামী ছাড়বে কিনা····সেটা আমিও ভাবছিলাম। লতা কেন কিছুতেই আমাদের কাছে—বিশেষ করে যেন আমার সামনে আসছে না। আমরা যেতে পারি এই কথা ভেবে সে জামতাড়ায় আসছে না। লতা কি সত্যিই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি তার কাছে ধরা পড়েছি, সে কি আমার কাছে ধরা পড়ে যাবার ভয়েই এমন করে পালাচ্ছে? ডাক্তারের জন্য স্বপ্ন ভরা ছায়ার রাজত্বে····কায়ার মত ভেসে এসেছিলাম আমি····আবার····ডাক্তারের ওপর কার মোহ···· ক্রমশঃ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে আমিও মিলিয়ে গিয়েছি? একা একা বিবাগী ভাব নিয়ে, তার মন সঙ্গীহীন হয়েই থাকতে চাইছে। লতা তার নিজের মনে যা কিছু ইচ্ছা করুক। আমার নির্জন মনে তাকে নিয়ে এক জগৎ সৃষ্টি করেছিলাম।···· সাংসারিক লোকে····লেখা,····সঙ্গে লেখা, শয্যায় লেখা, কিন্তু সামান্য অবসর ক্ষণের মনের বিলাসে লতা আমার নিত্য সঙ্গী হয়ে গিয়েছিল। তাকে নিয়ে আকাশ রচনা করা আমার লীলারঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

তাই যখন শুনলাম····লতার অন্যত্র বিয়ের কথা হচ্ছে, আমি খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য, যেদিন শুনেছিলাম মণীশ ডাক্তারের বিয়ে হবে····আমি সত্যিই দুঃখ পেয়েছিলাম,—লতা মনোকষ্ট পাবে মনে করে। লতা মনে কোন রকম দুঃখ পেলে আমিও দুঃখ পাই···· কেন? আমিও যে তাকে দুঃখ দিতে চাই না····আমিও তাকে ভালবাসি।····কিন্তু, এ বিবাহে লতা মনে মনে সুখী হবে না····যেন···· নিয়ম মেনে বিবাহ করা। লতার মনে মনে অসুখী থাকার মধ্যে আমি, আমি নিশ্চয়ই থাকবো লতার মনে। কিন্তু ডাক্তার, যে কোন মুহূর্ত্তেই পারবে····আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে যেতে। আমার আকাশ থেকে আমাকে নামিয়ে দিতে। তার মন থেকে লাল পাহাড়ের প্রভাত আলোয় দেখা····একখানি মুখ, চির দিনের মত অস্ত যাবে। মানুষের মন কি আশ্চর্য, মানুষের মন কি স্বার্থপর! আমি চাইনি ডাক্তার অন্যত্র বিয়ে করে লতাকে দুঃখ দিক। আমি চাইনি ডাক্তার লতাকে বিয়ে করে, আমাকে লতার মন থেকে মুছে দিক, লতা সুখী হোক। কল্পনা লোকে লতাকে আমি হারাতে চাইনি।····আমি ও লেখা, কেবল অপেক্ষায় থাকলাম, কবে লতার বিয়ের খবর আসবে। কি হবে ওর এই ব্যাপারে।

রুক্ষ কঠিন ভাবে মেয়েকে বলেন মিসেস বকসী, প্রত্যেকদিন তোমার কাছে এক কথা শুনতে চাইনি আমি। তুমি, কচি খুকুটি নও অজিতা। একটা মানুষের সঙ্গে একটু গল্প করতেও শেখোনি তুমি। তিনটে পয়েণ্ট আমি তোমাকে দিয়ে গিয়ে ছিলাম····লেখক লেখিকার কথা, কিংবা বিলেতের শীত বা গরমের আবহাওয়া বা কোন কঠিন রোগের কথা····। এ সব নিয়ে আরম্ভ করা কিছু শক্ত নয়····সাধারণ কৌতূহল ভিন্ন এর মধ্যে কিছু থাকা····বোঝা যায় না।

অজিতা চুপ, মার উপদেশ মনে ছিল। ঠিক সেই ভাবেই, ম্যাগাজিন আনতে গিয়েছিল সে।....

বলে চললেন মিসেস বকসী।

কোন কোন মানুষ থাকে....যাদের বাইরেটা একটু আবরণ দেওয়া, যারা একটু গোটান মত....তাদের জন্যে একটু খরচ করতে হয়। মণীশ সরকার খুবই ভাল,....তবে তার বাইরের সঙ্কেতটা একটু বেশী, তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে। অজিতা কি করবে? অজিতার কোন দোষ নেই। রূপের দিকে থেকেও, একেবারে নিন্দনীয়া ছিল না সে। বড় আকর্ষণ ছিল, তার এক পিঠ কালো চুল। অবাক হয়ে দেখবার মতই, কেশবতী মেয়ে অজিতা। কিন্তু মেয়েদের জন্য মণীশের ছিল এক আতঙ্ক।....মনে মনে....এই আতঙ্ক যদি না থাকতো....তবে এত দিনে মিসেস বকসীর বাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হত। আলোতে হাসিতে ভরা মেয়ে—অজিতা....জয় করে নিত মণীশকে।

কোন মেয়ে....বিশেষ করে....সুন্দরী মেয়ে....কারণ হয়েছিল একটি যুবকের....নিজের হাতে মৃত্যু ঘটাতে। যে সুন্দরী মেয়ে ছিলেন....তার মা।....মামার সেই কথাটা—আমার বোনেরা ছিল সুন্দরী। কেবল সুন্দরী মেয়ে নয়, এর ফলে—সমস্ত মেয়ের দল থেকে দূরে থাকতো মণীশ।

কোন মেয়ে তার সঙ্গে একটু বেশী মেশবার চেষ্টা করলেই, কেমন আতঙ্কে পালিয়ে যেত মণীশ। শক্ত হয়ে আপনি থেকেই মিসেস বকসীর বলা ওই শামুক শ্রেণীর মতই নিজেকে সঙ্কুচিত করে ফেলতো।

তার পরে মাস দুই কেটে গিয়েছে। ফল একই রয়েছে। অন্য পথ নিয়েছেন মিসেস বকসী। এটা তাঁর হাতের মধ্যে....বাইরে রটিয়ে দিয়েছেন, অজিতা ও মণীশের ভালবাসার কথা।....যে কথা আপনি থেকেই কিছুটা ছড়িয়ে ছিল....তা একেবারে সত্যি হয়ে....প্রচারের রূপ নিল। মিসেস বকসীই বলেন....

মণীশের ইচ্ছা আর দেরী না করা....আমি বলি, দেখি অন্য ছেলে

মেয়েরা কে কবে আসতে পারে····কিংবা বিয়েটা শীতের শেষে অর্থাৎ বসন্তেই ভাল····সবদিক থেকেই ভাল····এই মন। চারিদিকে যে কথা সত্যি হয়ে ওঠে····তাকে অস্বীকার করা শক্ত। তারপরের টুকু তাঁর মেয়ে যদি না পারে তবে আর কিছু বলবার নেই তাঁর।

এই উপায়টা সবে ছাড়তে আরম্ভ করেছেন মিসেস বকসী। অজিতা ভয়ে হিম হয়ে যায়····সে জানে মণীশ ডাক্তার, মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকায় না····এই ভাবে কোন চাপ দিয়ে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হলেও,····এর সঙ্গে কি করে ঘর করবে অজিতা? অজিতা মণীশকে একজন মহিলা বিদ্বেষী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। কিন্তু কেন····কোথাও কি খুব বড় আঘাত পেয়েছিল সে? বিলেতে কিংবা এখানে, কোন মেয়ের কাছ থেকে। কথা যে ভাবে রটছে তাতে····এখন সমস্ত মান রক্ষা হবে····এই বিয়ে হলে।···· আরো বেশী রটনা হওয়ার আগেই শেষ চেষ্টা করতে হবে অজিতাকে। মায়ের ঘন ঘন অনুপস্থিতির জন্য মণীশ বাবু আজকাল কম আসছেন।

সেদিন অজিতা মণীশের বাড়ীতে চিঠি পাঠিয়ে দিল। একবার আসুন, বিশেষ দরকার····অবশ্য নামটা দিল বাবার। মণীশ ভাবলো, অনেক দিন যায় না তাই। মণীশ অবশ্য যাওয়া বন্ধ করেছিল অন্য কারণে····এর আগে একদিন মিসেস বকসী বেশ কয়েকজন মহিলা পুরুষের সামনেই তার প্রশংসা করছিলেন এমন ভাবে····যেটা, তার ভাল লাগেনি····ইদানীং তাকে পুত্র সুলভ ভাবে, নাম ধরেই বলতেন তিনি····তবু বারে বারে····আমাদের মণীশ কথাটা, কেমন ঠেকেছিল। ····না····এ বাড়ীতে যাতায়াতটা যেন বেশীই হয়ে গিয়েছে, ঘনিষ্ঠতাটা একটু কম করতে চাইছিল সে। তবু এত দিন যে বাড়ীতে গিয়েছে, আদর যত্ন নিয়েছে, চা জল খাবার খেয়েছে সেখানে বিশেষ প্রয়োজনে ডেকে পাঠালে না যাওয়াটা অশিষ্টতা হয়। চাকরটিকে বলেছিল আধ ঘণ্টার মধ্যেই যাব।

অজিতা তৈরী ছিল।····ফগ্ অর্থাৎ কুয়াশা রং শাড়ী ব্লাউজে,

একপিঠ কালোচুলে, আর সযত্নে পরা কাজলকে আঁচল দিয়ে অল্প মুছে দিয়ে। এক বিষাদিনী মোহিনী রূপ নিয়ে।

মণীশ এলো বেশ কয়েকদিন পরে আসার জন্য কোন কৈফিয়ৎ না দেবার জন্য একটু সপ্রতিভ হতে যায় সে—প্রশ্ন করে—

মিসেস বকসীর কি অসুখ করেছে আবার ?

না তিনি ভালই আছেন····আপনি ঘরে গিয়ে বসুন।

ডান দিকেই বসবার ঘর····ঢাকা বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে যায় মণীশ। ওঁরা কোথায় ?····উত্তর না দিয়ে চলে যায় অজিতা।

চা শুধু চা হাতে করেই আসে। চা রেখে মণীশের সামনের চেয়ারটায় বসে। ওদিকে মণীশ, এদিকে অজিতা। মা বাবা বাড়ী নেই, আমিই আপনাকে ডেকেছি।

থতমত খেয়ে যায় মণীশ। কেন····কেন ?

আপনি বিয়ে করবেন না মণীশবাবু ? সোজা প্রশ্ন করে।

বিয়ে····বিয়ে····না তা একথা কেন ? একটু ক্রুদ্ধ হয় মণীশ।

আমার মায়ের ইচ্ছা····আপনি কি কিছুও বুঝতে পারেন নি ?

মণীশ প্রথমে চুপ করে থাকে····তারপর বলে, না। প্রথমে বুঝিনি, পরে অনুমান করেছিলাম····তাই আসা বন্ধ করেছিলাম। বেশ একটু কড়া ভাবে বলে মণীশ।

কিন্তু আপনার আশা নিয়ে, লোকে অনেক কথা বলতে থাকায় মাও আশা করেন····যে আপনি····আমার জন্যই কিন্তু আপনি তো জানেন····আমি আপনার সঙ্গে মেলামেশা বা সেভাবে মেশবার চেষ্টা কোনদিন করিনি।

হ্যাঁ, এইবার মণীশের মনটা একটু নরম হয়,—না, এই মেয়েটি তেমন কোন ভাব দেখায় নি।

তবে এই নিন্দার ভার আমার মাথায় কেন আসছে। বলুন মণীশবাবু।····কুমারী মেয়ের নামে এই রকম রটনা জীবনের কতদূর পর্য্যন্ত যায় তা জানেন আপনি ? তার ভবিষ্যতেও অশান্তি আনে।

অজিতার গলা ধরে এল। একরাশ ছড়িয়ে পড়া চুলে ভর্ত্তি পিঠখানা যেন একটু কেঁপে উঠলো। মুখটা নীচু করে উঠে দাঁড়ালো অজিতা। ঠিক এমনি ভাবে, একটি নতমুখী মেয়ে, যার পিঠের এলানো চুলের ভার কম্প অপেক্ষমান চোখের পাতা। তার কাছে গিয়ে যে কোন যুবক বুঝি তার সেই চুলের ভারে ভরা পিঠের ওপরে নিজের সান্ত্বনার হাতখানিই রাখতে পারে শুধু। মণীশও উঠে দাঁড়ালো। নিস্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর অজিতার দিকে এগিয়ে না গিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ালো····খোলা জানলার দিকে····বাইরে দৃষ্টি মেলে।

অজিতা ফিরে দাঁড়ালো মণীশের দিকে। কাজল মোছা চোখে জল ভরে উঠেছে। কোন মেয়ের চোখের জল দেখেনি মণীশ। এমন করে কোন মেয়েকেও দেখেনি। একবার বাইরের দিকে একবার অজিতার দিকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো সে। সত্যিই যেন নতুন কিছু দেখছে সে।····কিছুক্ষণ এমনিভাবে থেকে নিজের মতটাকেই বুঝি বিচার করে নিচ্ছিল মণীশ। দীর্ঘক্ষণ পরে····গম্ভীর বেদনাগ্র গলায় মণীশ বলে—

আপনাকে গ্রহণ করতে, আমার নিজের কোন বাধা ছিল না। কিন্তু আমি নিরুপায়—আমি বাকদত্ত।····আর সেকথা, আমার বাবা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে দিয়ে গিয়েছেন।

অজিতা নির্ব্বাক, অজিতা যেন কাঁপছিল। তবে যে ওরা শুনেছিল বিবাহ করেনি মণীশ, মা ভেবেছিলেন কেউ নেই বলেই এতদিন হয়নি····নিজেকে সামলে নিয়ে বলে····

তাহলে এতদিন হয় নি কেন?

আমি অপেক্ষা করে আছি····যেন নিজের মতের অপেক্ষার কথাই বলে····ঠিক হয়ে ওঠেনি····এতদিন····

অজিতা ভাবে····তবে কি এই মেয়ের কাছ থেকেই আঘাত পেয়েছেন মণীশ সরকার····তবুও তারি অপেক্ষায় রয়েছেন।

আমাকে আপনি মাফ করবেন মণীশবাবু।

আপনিও বিশ্বাস করবেন যে আমি স্বেচ্ছায় আপনার কোনও ক্ষতি করতে চাই নি।

না, আমরা দুজনেই কেউ কারও ক্ষতি করিনি। কিন্তু আপনার বিয়ে কবে হবে?—

আমার বিয়ে? আমার····বিয়ে····

বাঃ এই তো আপনি বল্লেন—বাগদত্ত আপনি। নিশ্চয়ই তিনি খুব সুন্দরীই হবেন। আর কতদিন অপেক্ষা করবেন আপনারা? অজিতা যেন একটু বন্ধুর ভাব তুলে নিজের অবস্থাটা সহজ করে নেয়।

মণীশ যেন এক জগত থেকে অন্য জগতে ফিরে আসে। বলে, না···· আর বেশীদিন নয়।····মণীশ দ্রুত বার হয়ে যায়।

বাড়ী এসে মণীশ ভাবে, কেন অজিতার সামনে····সত্য কথাটা বলতে পারলো না? বিবাহ করবে না এটা বলবার সাহস তার হল না কেন? অন্য একটি মেয়েকে এনে, নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা। অজিতার চোখে জল দেখে এত দুর্বল হয়ে গেল সে!

এলোমেলো পদচারণার মধ্যে····ঘুরে ফিরে ভাবছিল অজিতার কথাই। ঠিক বুঝি অজিতার কথা নয়। জল ভরা চোখের পাতায় কি এক আশা নিয়ে চেয়ে থাকা একটি মুখ। একটি মুখ, ওই মুখ-খানাকেই কি কাছে টেনে নেয়? ইংরাজী সিনেমায় দেখা অনেক ছবি মনে ভেসে উঠলো। মণীশের সমস্ত দেহ টলমল করে উঠলো। বুঝি পড়েই যাবে, কোন মতে কাছের চেয়ারে বসে পড়লো। খানিক বাদে উঠে ঘাড়ে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে এল। এমনি সাধারণ ভাবে মণীশের সঙ্গে অজিতার দেখা হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া মণীশ নিজের গাড়ীতেই চলা-ফেরা করে। তথাপি এর পর থেকে মণীশ চেয়েছিল, যেন অজিতার সঙ্গে তার দেখা না হয়।····একটি মেয়ে, প্রায় নিজে থেকে যে প্রস্তাব তুলেছিল, তাকে এমন ভাবে প্রত্যাখ্যান করবার একটা লজ্জা····মণীশের পুরুষ মনকে বুঝি লজ্জিত করেছিল। বীরেশ্বর বকসী মহাশয় আর আসেন নি, এটাও একটা বাঁচোয়া।

ওই মেয়েটিই বোধ হয় ওঁদের জানিয়েছে। অথচ নানা কথার সঙ্গে উত্তর দিতে দিতে মণীশ, তাঁকে বলেছিল, বিবাহের ইচ্ছা তার নেই। মামার মতই অবিবাহিত থেকে—কিছু সমাজ কল্যাণের কাজ করবার ইচ্ছা তার। কিছুদিন পরে চাকরী ছেড়ে····নার্শিং হোম খোলবার প্ল্যানও তার আছে।····উনি কি মণীশকে মিথ্যাবাদী ভাবলেন? বকসী পরিবার সম্বন্ধে অন্যভাব এলেও····অজিতার কাছে····লজ্জার ভাব····অন্য কারণে।

ছোট সহর····বহুদিন পরে একটা সিনেমা দেখতে গেল। মনটা কিছুটা হালকা করবার জন্যেই।····হঠাৎ মণীশের নজর পড়লো, অজিতাও এসেছে অন্য একটি মহিলার সঙ্গে। মণীশ কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো, যদি অজিতা তাকে দেখে ফেলে। খানিক বাদে, সিনেমা দেখা বন্ধু রেখে উঠে গেল মণীশ।····আচ্ছা এক অজিতা আতঙ্ক পেয়ে বসলো মণীশকে। কিন্তু আতঙ্কও একটা চিন্তা। ভয়ের মধ্যেই ভাবনা।

অজিতা তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল····বিয়ে····কিন্তু তার বিয়ে তো, ঠিক হয়েই আছে, সেই ছোট এক বছরের একটি মেয়ের সঙ্গে। এক বছরের মেয়ে? মণীশ কি পাগল,····সেই মেয়েটি এখনও নিশ্চয়ই ছোট নেই।····বড় হয়েছে। কত বড়····অজিতার মতই।

অম্লি করে চোখ তুলে। তার দিকে তাকাবে সেই মেয়েটি। বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল অজিতাকে। এক পিঠ চুল ছড়ানো মেয়েটিকে মনে করে বেশ ভালই লাগছে কেন?····ভাবতে ভাবতে অজিতার নানান ভঙ্গী মণীশের মনে পড়তে লাগলো। ততই একটা উত্তেজনার ভাব, তার মনে গভীর হয়ে উঠতে থাকে।····এখুনি যদি অজিতার মত একটি মেয়ে এখানে থাকতো? কোথায়? যদি তার এই বিছানার পাশেই। কেমন ভয়ে ভয়ে, পাস বালিশকেই—মনে মনে অজিতা মনে করে····আলত একটা আঙ্গুল দিয়ে ছুঁতে যায়, পর ক্ষণেই নিজের পাগলামী বুঝতে পেরে শক্ত হয়ে উঠে বসে। হঠাৎ বহুকাল

পরে, মামার লেখা চিঠি মামাকে লেখা নিজের বাবার চিঠি যা যত্ন সঙ্গে এনেছিল বার করে পড়ে।....মামার চিঠির একটা চোখ আটকে যায় তার। "বুঝতে পারছি আপনজন কি, রক্তের টানের শক্তি কতখানি।"....মণীশ চুপ করে ভাবতে থাকে সত্যিই তো আপনজন কি,....মণীশের তো কেউ নেই....রক্তের টান? মণীশের সব চিন্তা এলোমেলো হয়ে গেল।—কতদিন হল মামা মারা গিয়েছেন....হিসাব করে মণীশ....প্রায় ন'বছর শেষ হতে চলেছে। এর মধ্যে এতদিন হয়ে গেল। এখনও তো মনে হয় এইতো সেদিন তখন মামা ছিলেন। এই প্রথম নিজেকে বড় একা মনে হল মণীশের। নিজের বয়েসেরও একটা হিসাব করে। তবে কি এতদিন ধরে সেই মেয়েটি তার অপেক্ষা করে আছে। মামা বলেছিলেন তার বাবাও বৃদ্ধ হয়েছেন তাঁর অপেক্ষা করবার সময় নেই। তাইতো এত দেরী কেন করলো সে? তাদের তো মণীশ জানিয়েই দিয়েছিল....তার অমত। যাক গে তাদের কথা।....মণীশ আর ভাবতে পারে না।

সে কথা না ভাবলেও নিজের একাকীত্ব বোধ মণীশকে পেয়ে বসলো। সাইকোলজীতে একে বলে বয়স বেড়ে যাওয়া। তাতো ঠিক কথাই....বয়স বেড়ে গিয়েছে নয়....এরপর তো দিন দিন বেড়ে চলবেই না একা আর থাকতে পারবে না মণীশ। এরপর ঠিক করে বিবাহ করবে সে।....হ্যাঁ বিবাহ। মনস্থির করে মণীশ।....তবে এতদিন পরে আর অন্যত্র কেন।....অজিতাকেই বিয়ে করবে সে।....অজিতার মুখখানা আবার ঘুরে এল তার মনে। অজিতাকে একটা চিঠি লিখে জানানো,....বাগদত্ত মেয়েটির কথা একেবারেই ভুলে গেল মণীশ। তার মন জুড়ে এল অজিতা।....একবার মনে হল, চিঠিটা আজ রাত্রেই লিখে রাখে। আবার কি খেয়ালে ভাবলো, থাক। রাতও হয়েছে অনেক।....এগুলো বন্ধ করে। নিজের একলা থাকার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো মণীশ।

সকালে উঠতে একটু দেরীই হয়েছিল, ব্রেকফাস্ট খেতে বসলে

তার বয়....সকাল বেলার চিঠি দিয়ে গেল। জোড়হাটের চিঠি। সুবোধ হালদারের চিঠি আসে প্রায়ই। ডিসপেনসারী তরলা স্মৃতি ভাণ্ডার সব কিছুর খবর দেন তিনি। এ হাতের লেখাটা তো তাঁর নয়। খুলে দেখে....সুবোধ হালদারের বড় ছেলের চিঠি, হালদার কিছুদিন হল অসুস্থ। ডাক্তার তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। লিখেছে বাবা খুব ব্যস্ত হয়েছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। বাবা এমনি ভালই আহেন। তবে যদি আপনার সুবিধে হয় একবার আসবেন। মানসিক শান্তি পাবেন। আর বাবার ধারণা আপনি দেখলেই তিনি ভাল হবেন। আপনার উত্তরের অপেক্ষায় আছেন বাবা।

মণীশ দারুন ভয় পেয়ে যায়—হালদার বাবু অসুস্থ! এই পৃথিবীতে বলতে গেলে, তার শেষ আপন মানুষটি। সেব্যাল সিং মারা গিয়েছে, সে বিলেতে থাকতে ল্যুটান কাজ ছেড়ে গিয়েছে অনেক দিন।....এক বৃদ্ধকে রেখেছেন, হালদার বাড়ীতে, আর একটি দারোয়ান। না যেতেই হবে তাকে।....যত শীঘ্র হয় সে যাবার জন্য ব্যবস্থা করবে—আজই ছুটি চাইবে।....পারলে আগামী কালই রওনা হবে।....অজিতার কথা। বিয়ের কথা। সবই ভুলে গেল। এমন কি ব্যস্ত হয়ে, টেলীগ্রাম করে দিল। যথা সম্ভব শীঘ্র রওনা হচ্ছি।

শশীবাবু সত্যিই এবার ব্যস্ত হয়ে ছিলেন। লতার বিয়ে দেবার জন্য। চোখের সামনে সুপাত্র পেলেন, একেবারে মনের মত। শিশিরবাবু শিক্ষিত লোক। স্কুলের হেড মাষ্টার। বহুকাল মাষ্টারী করে রিটায়ার করেছেন। একখানা বাড়ীও করেছেন পাটনাতে। নিজের কোন ছেলেপুলে নেই। ছোট ভাই আছে, একটি ফিজিক্স এর এম. এস. সি. টাটাতে ভাল চাকরী করে। ছেলেটি, অতি ভদ্র। (দিদির অবশ্য মনটা একটু অন্যভাব, ছেলেটির রং ময়লা বলে।

—ওটা কিছু নয়) অজিত ছেলেটি সত্যিই ভাল। আর, সুধীশের ছেলেটি তো, বিয়েই করবে না বলে জানিয়েছে। তবু সেই সুধীশ···· তাঁর ছোট ভায়ের মত। এক সঙ্গে মানুষ হয়েছেন। দেবুকে নিয়ে কি হৈ হৈ করতো। তার ছেলেটি জন্ম গ্রহণ করবার আগে বলতো···· আমার একটি মেয়ে হবে, আর দেবুর সঙ্গে বিয়ে দেব।—দেবু আমার জামাই হবে।····মেয়ে হল না, ছেলেই হল।

তার ছ'বছর পরে হল লতা।····সেই রাত্রেই তাকে ছেলের বৌ বলে চেয়ে রাখলো।····সেই সুধীশের শেষ পরিণাম····কি হল? শশীবাবু বার বার বারণ করেছিলেন, চপলা বিশ্বাসের মত মেয়েকে, বিয়ে না করতে। কি ভাগ্য! সেখানে যা আছে তা ঘটবেই।—ছেলে, অমন শিক্ষিত ছেলে, উপযুক্ত ছেলে, তার বিয়ে না করবার ইচ্ছা হল। পরমেশ সমাজের উন্নতির কাজ করেছে, তার ভাগ্নে ও তাই করবে। তাই করুক সুধীশের ছেলেটি সুখী হোক। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করে ছেলেটিকে। সুধীশের মনে হতেই আর একবার ইচ্ছে হল। তার ছেলেটির মত নিতে। এদিকে ও এখনও একটু দেরী হবে। এই এখনি নতুন কাজে গিয়ে লতা চাইবে না ছেড়ে আসতে। লতার মন না জেনে তো। তিনি শিশির বাবুর কাছে কথা তুলতে পারবে না।····একদিকে ভালই হয়েছে, লতার সঙ্গে অজিতের পরিচয় হয়ে গিয়েছে। একই বাড়ীতে দুদিন ছিলেন তাঁরা এক সঙ্গে। তাঁদের থাকার মধ্যে ছুটিতে এসেছিল অজিত।

লতাকে লিখবেন তিনি, অন্য ভাবে, তাঁর বয়স হচ্ছে, আর দিদি দিন দিন অশক্ত হয়ে পড়ছেন। এখন তাঁরা চান লতাকে সংসারী দেখতে। আর লেখাকে দিয়ে অজিত ছেলেটির কথা লতাকে জানাতে হবে। অবশ্য তার মতের বিরুদ্ধে তিনি কিছু করবেন না।····সুধীশের ছেলেটি হলে, সব দিক থেকে ভাল হত। কত ছোট থেকে লতা বলতো····আমার বিয়ে হবে ডাক্তারের সঙ্গে, তখন অবশ্য আট-দশ বছরের হবে। তারও আগে সুধীশ ও চপলার সঙ্গে থাকা। পাঁচ

বছরের ছেলের ছবিটি দেখে, চার পাঁচ বছরের লতা বলতো····ওর সঙ্গে বিয়ে হবে····ও যে বড় ছোট।····কবে যেন লেখাকে ছবিটা দেখিয়ে দিদি গল্প করেছিলেন, সেই থেকেই জেনেছিল লতা।····ওই ছবির ছেলেটার সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে।····সুধীশের ছেলেটি এখন কোথায়···· তাও সঠিক জানেন না শশীবাবু।····তবে ওর জোড়হাটের ঠিকানাটা জানেন।····সুবোধ হালদারকে লিখলেই জানা যাবে।····সুবোধ হালদারকেই আগে চিঠি দিলেন তিনি।

মণীশ বিলেত যাওয়ার পরে, তাঁর মেয়েটি, লেখা-পড়া নিয়েই ছিল। সম্প্রতি সে এম. এ. পাশ করেছে। আর অপেক্ষা করা চলবে না। তবু শেষ বারের মত, মণীশের ইচ্ছাটা জানলে, তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন যে মৃত বন্ধুকে দেওয়া কথার খেলাপ তিনি করেন নি। মণীশ কোথায়? কি করছে এখন, কেমন আছে ইত্যাদি। লতাকেও নিজেদের অভিপ্রায় জানিয়ে দিলেন, অবশ্য পাত্রের কথা নয়। তাকে সংসারী হওয়ার কথা। মনটা তৈরী করুক সে। বড় হয়ে যাওয়া ছেলেপুলেদের নিয়ে বড় ঝামেলা। দুদিকে দুখানা চিঠি দিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন শশীবাবু। অনেকদিন পরে জামতাড়ার বাহিরে ঘুরে এসে বেশ ভালই লাগছে। লতা আজ এম. এ পাশ করেছে আজ আর কোন দুঃখ নেই তাঁর।

লতার চিঠির জবাব আসবার আগেই সুবোধ হালদারের চিঠি এসে গেল। মণীশের সব খবর দিয়ে তিনি লিখেছেন, আর দেরী না করে তাঁর মেয়েটির বিয়ে অবিলম্বে দেওয়াই ভাল। মণীশবাবু বোধ হয় বিবাহ করবেন না। আমি এ ব্যাপারে মাস আষ্টেক আগে তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তাতে অমতই জানতে পেরেছি। এমন একটি ভাল ছেলে। উনি তাঁর মামার মতই থাকবেন। আপনার মেয়েটি সুপাত্রে পড়ুক।····ইতি।

এদিকটায় নিশ্চিন্ত হলেন শশীবাবু। লতা তাঁর কথাটা এড়িয়ে গিয়েছে। লিখেছে বাবা আমি খুব শিগ্‌গীরই এখানে বাসা নেব।

তুমি, আমি, বড়মা আমরা সংসার পাতবো। বাড়ীটা মতিলালের হাতে রেখে জমিটা লীজ দেবার যে প্ল্যান তুমি অনেক দিন আগে করেছিলে—তাই হবে এবার। মল্লিক বাবুদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলো।....তুমি আমি বড়মা পাহাড়ের ওপর বাড়ী....এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় কি চমৎকার। কেমন হবে বলতো ?

এইবার লেখাকে জানালেন সুরবালা দেবী। লতাকে তার বিয়ের কথা ভাল করে লিখতে। অজিত ছেলেটির কথাও ভাল করে জানাতে। শশীর একান্ত ইচ্ছার কথাটা লেখা যেন খুব ভাল করে তাকে বুঝিয়ে দেয়। বড়মার চিঠি পেয়ে লেখা তার কর্ত্তব্যে রত হয়ে গেল। আমি জানি না শুধু শশীবাবুর জন্যেই এত চিন্তা কিনা। লেখা কি আমার মনের নিগূঢ় খবর জানতে পেরেছে ? তবে কি মেয়েদের পক্ষে সবই সম্ভব। কেমন করে যেন ওরা বুঝে নিতে পারে ওদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বোধ দিয়ে।....আমি অপরাধী নিজের অপরাধকে সাবধান করেই রেখেছি, তবে বেশী সাবধানীরাই বুঝি ধরা পড়ে। লতার এম এ পাশের খবরে সকলে যখন পাটনায়, তখন লেখা যদি ইচ্ছা করে তবে দুদিনের জন্য আমরাও পাটনা যেতে পারি, একথা বলেছিলাম। কোথায় উঠবো,....ওঁরাই আছেন অন্য বাড়ীর কথায় দু একদিন কোন হোটেলেও ওঠা যায়। এ প্রস্তাবও আমি দিয়েছিলাম কিন্তু লেখা না যাবার সংকল্পেই অটল থাকলো। শশীবাবুর কথা ভেবে লতার বিয়ে না করে থাকাটা বাবার প্রতি কর্ত্তব্যহীনতার সঙ্গেও তুলনা করেছে লেখা। আগে হলে আমিও লেখার এই দায়িত্ব পালনের অংশীদার হতে পারতাম! এতদিনের মধ্যেও আমি লেখার কাছে মণীশ ডাক্তারের বিয়ে হতে পারার কোন কথাই বলিনি। লেখাকে বলা মানেই সে খবর লতার জানা। লতার স্বপ্ন আমি ভেঙ্গে দিতে পারিনি।....একজন নেই এবং একজন আছে এই আলো ছায়াই লতার মনে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু লতা যখন জানালো, বাবাকে মনঃক্ষুণ্ণ করতে সে পারবে না।

তবে শেষ বারের মত মণীশ সরকারকেই জানানো হোক····তার অভিমতটা জানাতে। বিবাহ না করে থাকাটাই যদি তার মত হয়, জীবনের ব্রত হয়, তবে লতার দুঃখ করবার কিছু থাকবে না।

লেখা খুব খুশী হল। লতা যে তার ভাবরাজ্যের থেকে, সংসার জগতে ফিরেছে, কল্পনাবিলাস ছেড়ে বাস্তববাদী হয়েছে এতে লেখা খুসী। আমাকে বল্ল—পাগলামী ছেড়েছে লতা। ডাক্তার ভূত এত দিনে ওকে ত্যাগ করেছে····যতই হোক বড় হয়েছে তো····বয়স হলেই বুদ্ধি হয়। অবশ্য কমে যেতেও দেখা যায়····বলে, আমার দিকে একটু বক্রভাবে তাকালো।

আমি সেটা লক্ষ্য না করে বললাম—আমার যতদূর জানা আছে ডাক্তারের বিয়ে বোধহয় হয়ে গিয়েছে।

সত্যি! লেখা অদ্ভুত ভাবে চীৎকার করে উঠলো····ও যেন, একটু ভয় পেয়ে গেল····ডাক্তার বিয়ে করেছে জানলে, বড় আঘাত পাবে লতা····লতার যে একান্ত বিশ্বাস ছিল, ডাক্তার আসবে তার কাছে····আরে তা না হলে····ডাক্তার বিবাহই করবে না। ওর ডাক্তার ছোট বেলার ডাক্তার—স্বপ্নের ডাক্তার····সে বিবাহ করেছে অন্য একটি মেয়েকে····আর একবার পাগলামী ধরলে কি লতাকে মত করাতে পারা যাবে····লতার জন্য লেখার বড় মন কেমন করে উঠলো।

তুমি কি করে জানলে?

আমি মিসটার পাণ্ডের কথা বললাম।

আচ্ছা, তাঁকে বলে, তাঁর দাদাকে দিয়ে সত্যিকারের খবরটা নেওয়া যায় না?

সত্যিই মেয়েদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।····পাণ্ডে পাছে মণীশ সরকারের বিয়ের কথা বলেই বসে····আমি তাকে এড়িয়ে চলতাম, জানতে চাইতাম না তার কথা।····আর পাণ্ডেও হয়তো ভুলেই গিয়েছিল····কোন এক ডাক্তারের কথা।····তাই অফিসে এসে পাণ্ডের খোঁজ করলাম—আচ্ছা, সেই ডাক্তারের বিয়ে কি হয়ে গিয়েছে?

কোন্ ডাক্তার ?

সেই যে আপনি একদিন বলেছিলেন····আপনাদের মণীশ ডাক্তার····

ওঃ সেই আসাম অয়েল কোম্পানীর····তা তো, ঠিক জানিনে, তবে হয়ে যাওয়াই সম্ভব। ও বকসী পেয়ার, যাকে ধরে তাদের আর জাল কাটবার উপায় থাকে না। আরে নিজেরা কৃশ্চান হয়ে, দুটো দুটো হিন্দু ঘরের ভাল ছেলে পাকড়াও করে নিল। একটা আবার কুলীন ব্রাহ্মণ তার মধ্যে।

আপনি একটু কষ্ট করে আপনার দাদাকে লিখে খবরটা সঠিক কিনা জেনে দিতে পারেন····বড় উপকার হয়····

তা আর কঠিন কি····তবে মণীশ সরকার তো কৃশ্চান।

তা জানি, খবরটা আমার মামাশ্বশুর জানতে চান····জেনে দেব তাই। পাণ্ডে কালই চিঠি দেব বলে গেল।

বিয়ে লতা করবে কি করবে না এটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো।

লেখা বল্ল—ডাক্তার বিয়ে না করলে—আর করবে না জানলে লতা ঠিকই বিয়ে করতো—

কিন্তু ডাক্তারকে তো সে দেখেই নি। চেনেই না।

তবু ওর মনটাই অন্য রকমের। ছোটবেলা থেকে ডাক্তারকে নিয়েই স্বপ্ন দেখতো। কত ভাল ছেলে লতার জন্য তাদের মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছে····লতা তার কল্পনার ডাক্তারকে নিয়েই থেকেছে। অজিতবাবুকে তার কেমন হয়েছে····কিছু লেখেনি।

না····ডাক্তারের পর তার কাছে····অজিত—সুজিত সবাই সমান।

আমারও মন, একই চিন্তায় আচ্ছন্ন—ডাক্তারের বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকলে লতা কি করবে। বিমুখ হয়ে উঠবে পুরুষ জাতের প্রতিই ? নাকি চিন্তার মধ্যের আর একজনকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরবে ? কিংবা সব কিছু ভুলে গিয়ে বা ভুলবার জন্যে অজিতবাবুকেই বিয়ে করবে।····আমার কিছু পাওয়ার দাবী নেই····মনে মনে যে লতাকে আমার বলে ভাবতে পারতাম তাকে হারাবার ভয় আমার সবদিক

থেকেই। দূরে পালিয়ে থাকা লতা আমার। অজিতের সঙ্গে বিয়ে হওয়া লতার মধ্যে—আমার ঠাঁই একটুও থাকবে না।....

প্রথমটায় চমকে উঠলেও সারাদিন ভেবে লেখার ধারণা হল—লতাকে বিয়েতে রাজী করাতে পারবে। ওই যে ও লিখেছে, যে বাবাকে ক্ষুণ্ণ করতে সে পারবে না। মামাবাবু একটু পিঠে হাত বুলিয়ে, বা একটু দুঃখ জানালেই লতা বিয়ে করবে। বাবাকে দুঃখ না দেওয়ার কর্ত্তব্যে সে অমনি রাজী হয়ে যাবে। কাজেই এত উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই....লতার বিয়ে হবেই এবার। এখন কবে হবে। অন্তত মাস তিনেক দেরী করতে বলবে লেখা। লেখা আবার সন্তানসম্ভবা। সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহেই তার ডেট। পুরাণো আয়াটি এখনও আছে মাস দুই-এর শিশু নিয়ে সে ঠিকই যেতে পারবে এইসব মনে মনে ভাবছিল। লতাকে কি উপহার দেওয়া যাবে তারও একটা প্ল্যান করছিল। লতার বিয়ে হওয়া খুব দরকার ডাক্তারের খবরের কথা জানাবার দরকার কি? আগেই জানিয়ে দি লতা রাজী আছে....সুবোধ হালদারের শেষ চিঠির কথাই তাকে এখন জানানো হোক। আটমাস আগেও যখন বিয়ে হয়নি....তখন সেটা যথেষ্ট জানান চলে।

লেখা তার বড়মাকে জানিয়ে দিল, মামাবাবুর ইচ্ছাতেই লতার ইচ্ছা বলে লতা তাকে জানিয়েছে তাঁকে ক্ষুণ্ণ করতে বা তাঁর অমতে লতা কিছুতেই যাবে না। চিঠিটা লিখে যেন নিশ্চিন্ত হল লেখা। কেবল বড়মা ও শশীবাবুকে নিশ্চিন্ত করা নয় নিজেও যেন নিশ্চিন্ত হল।

মণীশ এসে উপস্থিত হল জোড়হাটে। তারপরে গেল, হালদার বাবুকে দেখতে। এতদিনের মধ্যেও হালদার বাবুর বাড়ীতে কোনদিন আসেনি, ওঁর বড়ছেলে পরেশকে ছাড়া ওর বাড়ীর আর কাউকে দেখেই নি সে। পরেশই এখন বিশ্বাস ফার্মেসী দেখা-শোনা করছে।

মণীশের চেয়ে কিছু ছোট সে।....মণীশকে দেখে বড় খুসী হলেন সুবোধ হালদার, তিনি ভাবতেই পারেন নি, তাঁর অসুখের খবরে এমন করে ছুটে আসবেন মণীশবাবু।....এখানে তাঁর বাড়ীতে ছুটে আসবেন।

মণীশ বল্ল—আমি বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম মনে হচ্ছে ভালই আছেন আপনি।

হ্যাঁ তা আছি, তবে কি জানেন....এখন আমি হয়েছি নাবালক, আর আমার গার্জেন হয়েছে ছেলেমেয়েরা তাদের শাসনে আমাকে কিছুদিন বিশ্রাম নিতেই হল....

তা বেশ তো, বেশ তো, অনেক খেটেছেন এবার বিশ্রাম নিন।

হাসেন হালদারবাবু। মণীশবাবু, ছেলেমেয়েদের এই শাসন বড় আনন্দের। বাবার কাছ থেকে সংসারের ভার নিয়েছিলাম.... হ্যাঁ ডাক্তার বিশ্বাস সে ভার দিয়েছিলেন আমায়। আজ আমি নিশ্চিন্ত, আমার পরেশ সুরেশ যোগ্য হয়ে উঠেছে। ছেলেমেয়ে স্ত্রী এই সকলের মধ্যে থেকে চলে যেতে পারতো সৌভাগ্য....

না, এখনি এসব কথা না বলাই ভাল, বলে মণীশ।

বাড়ীর সকলেই শশব্যস্ত হয়ে মণীশকে আপ্যায়ন করলো। চা জল খাবারের আয়োজন হল বিরাটভাবে। সুবোধবাবু দুই ছেলেকে ডেকেই আদেশ দিয়ে দিলেন, বাড়ীতে মণীশের জন্য সব ব্যবস্থা ঠিক করে দিতে। এখন যে চাকরটা রেখেছেন বাড়ীতে সে বুড়ো হলেও বেশ সমর্থ আর মেয়ে জামাইও থাকে ডাক্তার বিশ্বাসের গ্যারেজ আর ওপরের ঘরটা নিয়ে তারা থাকে। বাড়ীঘর দেখাশোনা করে। বাড়ীতেও সব কিছু আছে। ওরা যেন ওঁর খাওয়া-দাওয়া চা রান্না সব কিছু দেখে দেয়।....তাই দেয়ও তারা যখন ক্বচিৎ মণীশ আসে।....

মণীশ বলে....হ্যাঁ সে আপনি ভাববেন না।

ডাক্তার বিশ্বাস....আপনার খাওয়া-দাওয়ার খবর নিজে নিতেন, একটু দেখা আমার কর্ত্তব্য। পরলোকগত মনিবের নামটা শ্রদ্ধাভরে

বলেন। মণীশ কাল এসে হালদার বাবুকে ভাল করে দেখবে, অর্থাৎ ডাক্তার হিসেবে বলে আসে।

বুড়ো তারণ দাস····আর মেয়ে····খাওয়ার ব্যবস্থা ভালই করেছিল। বাজার ইত্যাদি মনে হয় সুবোধ হালদারের ছেলেরাই করে দিয়েছে। ····মামার ঘরেই, নিজে থাকার ব্যবস্থা করলো মণীশ।····মামা চলে গিয়েছেন, মণীশ আছে····তার পরে····কে থাকবে····বন হয়ে যাবে···· হয়তো। না—না,—তা হবে না।····কি সুন্দর রয়েছেন হালদার বাবু। ব্যস্তসমস্ত, ছেলে মেয়ে স্ত্রী····কিন্তু তার রোগশয্যা পাশে···· সেখানে তো, কেউ থাকবে না। থাকবে, আবার ভাবে····ব্যাকুল চোখ তুলে অজিতা থাকবে, আর····পরেশ সুরেশের মত সুযোগ্য ছেলে····থাকবে না? মণীশ আর ভাবতে পারে না····তবে এটুকু স্থির যে, একলা আর সে থাকবে না। এখন একলা সে থাকতে পারবে না।

পরের দিন দেখতে গেল হালদারবাবুকে। বেশ ভাল করে দেখলো, দেখলো আগের ডাক্তারী রিপোর্ট অসুখ।····একটু অনন্য মত হল মণীশ। যেটা এরা হার্টট্রাবল ভাবছেন····মণীশের মতে সেটা ঠিক নয়। তার ধারণা হালদারবাবুর যা হয়েছে তা তার পেটের ট্রাবল থেকেই হয়েছে। নিজের মতামত জানায়।····হালদারবাবু তার মতেই থাকতে রাজী হলেন····বল্লেন—এখন তো ভালই আছি—আপনার চিকিৎসা চলুক। পরের দিনের ছুটি নিয়েছেন তো····আমাকে তুলে নিয়ে যান মণীশবাবু। এরকম শুয়ে কি থাকা যায়? বিশ্বাস ফার্মেসীর ওই ঘরটায় না গেলে কেমন মন কেমন করে জানেন। হেসে ওঠেন, হালদারবাবু, হাসে মণীশ সুরেশ, পরেশ, হালদারবাবুর দুই মেয়ে সকলে যারা এই ঘরে ছিল সবাই—হা—হা করে হাসলো। এমন হাসি মণীশ বুঝি কোন দিন হাসে নি। মণীশের মনটা বেশ সহজ দেখে হালদার বাবু খুসী হন। ভাবেন এর মধ্যে আর একবার বিবাহের কথাটা বলবেন। এই যে বাড়ী এসেছে—কেউ নেই। চলে যাবে সঙ্গে কেউ নেই। এমন একটি রত্ন ছেলের জন্য বড় মায়া হয়

হালদারবাবুর। হ্যাঁ, আর একবার বোঝাবেন তিনি। এখন আর মনিব বলে সমীহ করে না বলবার আর দেরী করবার সময় নেই। চেহারাটা যেন একটু খারাপই হয়েছে মণীশবাবুর। আবার আসবেন কিন্তু বলেন তিনি।

হ্যাঁ নিশ্চয়, যে কদিন আছি আসবো। মণীশ যেন একটু পারিবারিক হতে চায়।

মণীশ বাড়ী এসে ভাবে হালদারবাবুর কাছে বিয়ের কথাটা বলতে হবে। বিয়ের কথাটা কিভাবে তুলবে তাই ভাবে সে। আচ্ছা, এখান থেকে বকসী মশায়কে একটা চিঠি লিখে দিলে কেমন হয়। থাক, আগে হালদারবাবুকে বলি। তারপর ওঁদের জানাবো। আচ্ছা, অজিতা কি খুসী হবে? মেয়েরা আমায় পছন্দ করে কি? মনে হয় অজিতা আমাকে পছন্দ করবে। অজিতার উঠে দাঁড়ানো তাকিয়ে থাকা সব কিছু থেকেই তার ধারণা হয়েছিল, মণীশকে পছন্দ করে। জামা কাপড় পরতে বা টাই বাঁধতে বা দাড়ি কামাবার জন্য যেমন আয়নার সামনে দাঁড়ায়, তেমন নয়, নিজেকে কেমন দেখতে তেমনি করে দেখবার জন্য আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো মণীশ। অনেকক্ষণ ধরে দেখলো নিজেকে। না তেমন খুব বুড়ো হয়ে যায়নি সে। মোটেই বুড়ো হয়নি। তার যেমন মনে হয়েছিল অনেক বয়েস হয়ে গিয়েছে, চেহারা দেখে তা কিছু বোঝাই যাচ্ছে না। সুবিধা হলে কালই কথাটা জানিয়ে দেবে হালদারবাবুকে।

সুবোধ হালদার যেন বলেই রেখেছিলেন আজ মণীশ খাওয়ার পরে প্রাথমিক কথা একটু চা ইত্যাদির পরে ছেলে মেয়েরা চলে গেল। একা রইলেন তাঁরা। কথা তুললেন হালদারবাবু—মণীশবাবু···· আপনাকে উপদেশ দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই। অনেক বেশী শিক্ষিত আপনি····তবে ব্যবহারিক জগতে আপনি খুব অনভিজ্ঞ। বিয়ে করুন মণীশবাবু। জগতে একা বাস করা খুবই কঠিন। তাহলে সংসার ত্যাগ করে আশ্রমে যেতে হয়····এমন কি মানুষ এমন প্রাণী আশ্রমে

স্নেহ মায়া মমতা কিছু কাটিয়ে উঠতে পারে না। আপনার মত লোক বিবাহ করবেন তবেই তো আবার—সমাজ অন্য সুসন্তান পাবে···· আপনার সন্তানের মধ্যে। হালদারবাবু একটু চুপ করলেন।

মণীশ নিজেকে প্রস্তুত করে····বলে, এবার তাই ভাবছি।

ভাবছেন····আর ভাবাভাবি নয়····একেবারে পাকাপাকি করুন। জানেন, ডাক্তার বিশ্বাস তাঁর মত বদলে ছিলেন বলে আমার মনে হয় তাঁর শেষ চিঠিটায়····আপনাকে বিবাহের কথা বলতেই যেন বলেছিলেন আমার ধারণা উনি থাকলে, এতদিনে আপনার বিয়ে দিয়ে দিতেন। আর উনি থাকলে তাঁর বন্ধু শশীনাথবাবুর মেয়ের সঙ্গেই আপনার বিয়ে দিতেন। মেয়েটিকে তাঁর ভারি মনে লেগেছিল মনে হয়····

একটু অস্বস্তি ভাব নিয়ে মণীশ বল্ল—কিন্তু সে মেয়েটি তো আর এখনও অবিবাহিতা হয়ে বসে নেই····তা-ই

না—না বোধহয় এখনও তার বিবাহ হয় নি। এই তো মাসখানেক আগে আপনার মত বদল হয়েছে কিনা····জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। তার পরেই তো আমি অসুস্থ হলাম····আপনাকে আর জানানো হয়নি। পড়া শোনা করছিল মেয়েটি, এম. এ পাশ করেছে।

তবু অজিতার দিকে ঝুঁকে পড়া মন নিয়ে মণীশ বলে, যেন বাধা দেবার মত করে বলে—কিন্তু যাকে বলে দেখতে শুনতে····

বাধা দিয়ে সুবোধ হালদার বলেন, আমি তো দেখিনি তবে মনে হয়, মেয়েটি খুব সুন্দরীই হবে। ওই যে বললাম ডাক্তার বিশ্বাসের মনে ভারি দাগ কেটেছিল মেয়েটি। একটা ব্যাপারে মেয়েটিকে দেখে উনি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন, আপনি বোধহয় তখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়েন। ডাক্তার বিশ্বাস একবার কলকাতা গেলেন, বলেছিলেন সুবিধা হলে একবার জামতাড়া ঘুরে আসবো। শশীনাথের সঙ্গে দেখা করে আসবো। তারপর এসে কথায় কথায় আমাকে বললেন—জান, বংশতত্ত্ব নিয়ে আমি খুব আলোচনা করিনি—হেরেডিটির ওপর লেখা দু-একখানা নামকরা অথরের বই অর্ডার দাও তো, ভারি কৌতূহল

হচ্ছে আমার। বন্ধুর মেয়েটিকে দেখলাম অবাক হয়ে গেলাম। ঠিক যেন সেই চোখে লেগে থাকা, ডরোথী মেম সাহেব, অবশ্য তাঁকে যখন আমি দেখি তিনি তখন বৃদ্ধা আর একটি কিশোরী মেয়ে—তবু যেন তিনি, সেই অবিকলটি। সেই রকম চোখ, মুখ ফেরানো—এমন কি ডরোথী মেম সাহেব বাইরে চেয়ারে বসে থাকতেন; দূর থেকে আমাদের দেখলে একমুখ হাসি নিয়ে হাতের ইশারায় ডাকতেন এ মেয়েটি আর একটি মেয়েকে ডাকছিল হাত নাড়ার ভঙ্গীটিও একেবারে এক যেন। অথচ তাঁর পরে এ তৃতীয় জন। শশী হল ডরোথী মেম সাহেবের দৌহিত্র।

ডরোথী মেম সাহেব—কথাটা কানে যেতেই কেমন উন্মনা হয়ে গেল মণীশ—ডরোথী মেম কথাটা তার বাবার চিঠিতে আছে তার বাবাই তো ঠিক করেছিলেন—তার এই বিয়ে।

এই চিন্তার মধ্যেই হালদারবাবু আবার বলেন, মৃত বন্ধু মানে আপনার বাবাকে কথা দিয়েছিলেন বলেই শশীবাবু এতদিন অপেক্ষা করেছেন। তাই শেষ বারের মত আপনার মত জানতে চান। মেয়েরও বয়স হচ্ছে, উনিও বৃদ্ধ হচ্ছেন। উনি যদি হঠাৎ মারা যান মেয়েটিও একেবারে একলা হয়ে যাবে।

মেয়েটিও একেবারে একলা হয়ে যাবে, একেবারে একলা, তবে তো মেয়েটি বড় কষ্ট পাবে—ভাবে মণীশ। অজিতার মা সবাই আছেন, শশীনাথ বাবুর সঙ্গে একসঙ্গেই মানুষ হয়েছিলেন বাবা। বাবার কাছে দেওয়া কথা ধরে—এতদিন অপেক্ষা করেছেন তিনি। আর সেই মেয়েটি, সেও কি অপেক্ষা করে আছে?

হালদারবাবু বলেন—অমত করবেন না মণীশবাবু, স্বর্গত গুরুজনদের ইচ্ছা পূরণ করুন....আপনি সুখী হবেন।....আপনি শশীনাথবাবুকে একটা চিঠি দিন....যে আপনি মত পরিবর্ত্তন করেছেন।....আমিও জানাতে পারি....তবে আপনি লিখলেই ভাল হয়।....

আচ্ছা আমি একটু ভেবে নিই....আপনাকে পরে জানাবে।

মণীশ বাড়ী আসে।....বাবার চিঠিখানা পড়ে। হালদারবাবুর কাছে শোনা, মামার মুখের কথাগুলি, তার মনেও কৌতূহল সৃষ্টি করে। বাবার কাগজপত্রের মধ্যে রাখা....মিসেস পিটার ও ডরোথী মেম সাহেবের ফটোটা দেখে....একটু বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে....চেয়ারে ফটোটা দেখে....একটু বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে....চেয়ারে বসে বৃদ্ধাটিই ডরোথী মেম সাহেব হবেন।....বৃদ্ধা....তবু কি স্বপ্নালু চোখ। এক বৃদ্ধার ফটোর চোখের মধ্যে দিয়ে....অল্পবয়সী একটি মেয়ের চোখ মনে করতে চায়। যে মণীশ কোন মেয়ের কথা....কোনদিন ভাবেনি.... এতদিন পরে—তাই ভাবতে বসে....দিশেহারা যায়।....ডরোথী মেম্ বাবার কথা....অজিতা....সব তাল গোল পাকিয়ে যায়।

স্থির বুদ্ধি দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক করে—এখন অজিতা, যেমন আছে থাক। আগে জামতাড়ায় শশীবাবুর সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যাক। তাঁর মেয়ের বিয়ে না হয়ে থাকলে....আর ভাল লাগলে সেখানেই বিয়ে করবে। তার ফর্লো পাওয়া আছে। আগে সেটা নিতে হবে।—আর শেষ পর্য্যন্ত শশীনাথ বাবুকে কোন চিঠি না দিয়ে.... হঠাৎ জামতাড়ায় চলে যাওয়াই তার ভাল মনে হল। এত কাল পরে আমি মত পরিবর্ত্তন করেছি বলতে লজ্জাই হয়। যদি বাইরে থেকেই জানতে পারে যে শশীবাবুর মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে....তবে নিশ্চিন্ত মনে অজিতাকে বিয়ে করতে পারবে।....আর না হয়ে থাকলে, সোজা গিয়ে উঠলেই তার মত জানানো হয়ে যাবে। উনি ওখানকার এত দিনের বাসিন্দা, ওঁর মেয়ের বিয়ে হয়েছে কিনা নিশ্চয়ই স্থানীয় লোকদের কাছেই জানতে পারা যাবে।

ফিরে যাওয়ার আগে, হালদার বাবুকে তার অভিপ্রায় জানালো, গিয়ে ছুটি নিয়ে, সোজা জামতাড়ায় যাবে—তার পরে যথা কর্ত্তব্য ঠিক করবে।

হালদারবাবু ও কথাটা ঠিক যুক্তিযুক্ত বলে সমর্থন করলেন। মণীশবাবু যে বিবাহে রাজী হয়েছেন, এতেই তিনি খুশী।

বিবাহ করবার জন্য মন স্থির করে মণীশ ফিরে এল।

সেদিন অফিসে যেতেই পাণ্ডে বল্ল—খবর এসেছে। আরে মণীশ ডাক্তার তো, বড় ধারালো লোক····ঠিক জাল কেটে পালিয়ে গিয়েছে···· আর হবে না কেন····বিলেত ফেরতা মাল তো।

আমার যেন এইটুকু জানাই যথেষ্ট ছিল।····মনটাও ভাল ছিল···· একটু সকাল সকালই ফিরলাম খবরটা লেখাকে দেব বলে। কিন্তু বাড়ীতে আমার জন্যে তার চেয়ে ও অনেক সাংঘাতিক খারাপ অপেক্ষা করছিল। আমি যেতেই, ভয়ে বিবর্ণ লেখা, কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। একটু আগে জামতাড়া থেকে টেলীগ্রাম বসেছে—শশীবাবু সাংঘাতিক অসুস্থ, সেরিব্রাল অ্যাটাক। সরকার সাহেবের মেজ ছেলে টেলীগ্রাম করেছে। এ খবরে কি করবো····কি বলবো····ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে-প্রাণে বিচলিত হয়ে পড়েও লেখা বুদ্ধি স্থির করে ছিল—বল্ল, আমাদের যাওয়া উচিত।····কিন্তু আমি তো এই অবস্থায় যেতে পারবো না,····তুমি চলে যাও। বাড়ীতে পুরুষ বলতে কেউ নেই——বড়মা····বড়মা যে কি করছেন। আর লতা····লতার কথা বলতে—লেখার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো····

আমি তবু ইতস্তত করছি, আমি যাব····কিন্তু তুমি, তোমাকে এ অবস্থায় রেখে····

চোখ মুছে শক্ত হয়ে লেখা বল্ল, বড়দিকে খবর দাও, তিনি আর দিলু, (বড়ভাইপো) এখানে আসুক। এখনি ওখানে ফোন কর। মাণিকদাকে ডেকে পাঠাবো····তারপর বল্ল—না—না—না, ফোন নয় চা খেয়ে তুমি ও বাড়ী যাও। এ সময় কিছু টাকা নিয়ে যাওয়া দরকার, কাল টাকা তুলে নিয়ে যেতে সময় লাগবে। এর পরে দরকার হলে খবর দিও····আমি, আমার ব্যাঙ্ক থেকে তুলে পাঠিয়ে দেব। লতাকে কে সামলাবে····আমি পারতাম····কিন্তু আমি তো, যেতে পারছি না····না যেতে পারবার জন্য লেখা বড় ব্যাকুল হয়ে পড়ে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—তুমি পারবে লতাকে সামলাতে,

জানি না····এই খবর পেয়ে তার অবস্থা কি হয়েছে।····বেচারী—বেচারী—

তাইতো, লতাকে তো সামলাতে হবে-- সত্যিই বেকারী।

লেখা বলে, তুমি দেরী করো না—দেখ যদি রাত দশটার ট্রেনটা ধরতে পার। কোনমতে এক কাপ চা খেয়ে আমি বার হয়ে গেলাম।

দাদা বৌদিরা প্রত্যেকেই আমাকে আজ রাত্রেই রওনা হতে বল্লেন। বড় বৌদি বল্লেন—লেখার জন্য কোন ভাবনা নেই। আমি এখনি তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি। দীনু এলেই এরা পাঠিয়ে দেবে। দাদা বৌদিরা সবাই মিলে টাকা দিলেন। বাড়ী এসে সামান্য লুচি তরকারী খেয়ে নিলাম। লেখাও ত কিছু টাকা গুছিয়ে দিল। একটা সুটকেস ও গুছিয়ে রেখেছিল—আমি রওনা হয়ে গেলাম। আমি যখন পৌঁছলাম, লতা তখনও আসেনি····লতা ও আমরা আসতে পারি ভেবে ষ্টেশনে সাইকেল, ও গরুর গাড়ী রাখা আছে। নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশীরা প্রাণপণ করছেন।—আমি যখন গেলাম স্থানীয় ডাক্তার ছিলেন, গত কালই আসানসোল থেকে ডাক্তার এসে দেখে গিয়েছেন। শশীবাবু তখনও অজ্ঞান আচ্ছন্ন।

সকাল বেলা নিয়মিত উঠেছেন, চা খেয়েছেন। বাড়ীর উঠানের ফুলবাগানে একটু ঘুরেছেন। মুরগীর ঘর থেকে ডিম তুলে এনেছেন। —তারপর ধীর পায়ে, কাছের বাগানে লাগানো আলু বেগুন দেখতে গিয়েছেন····সেখানে কাজ করা লোকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারপর আর দূরের ক্ষেতে যাবেন না, ঠিক করে ওখানেই একটু ঘোরা ঘুরি করেন। এই বাগানটা থেকে শশীবাবুর বাড়ী, সাত-আট মিনিটের পথ, আস্তে আস্তে বাড়ীর কাছ অবধি আসার পরেই শরীর কেমন করে ওঠে····ওখানেই একটা গাছ তলায় বসে পড়েন,····কাছের মাঠে কতকগুলো সাঁওতাল ছেলে ছাগল চরাচ্ছিল, তারা ওঁকে বসে দেখতে দেখে এগিয়ে আসে····তাদের মনে হয়, মণীশবাবু অসুস্থ! ছুটে বাড়ীতে যায় একদল। একজন কাছের বাগানে ছুটে যায়····সবাই ছুটে আসে

তখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান হারান নি। কিন্তু বাড়ী যখন আনা হয় তখন তার জ্ঞান নেই। বেলা সাড়ে আটটা মত হবে তখন। সুরবালা দেবী হায় হায় করে ছুটে আসেন। ছুটে আসেন, সরকার সাহেব বাড়ী থেকে····তরফদাররা····সাঁওতালরা কাহার—বাউরী। সবাই এসেছে যেন এঁদের বড় আপন জন। সবাই তাঁকে ঘিরে আছে····সুরবালা দেবীকে সামনে রেখেছেন। শান্ত সমাহিত ঘুমিয়ে আছেন শশীবাবু আস্তে, আস্তে, জীবনের অল্প আভাস····শুধু ক্ষীণ ভাবে চলেছে।

লতার আসার অপেক্ষায় ষ্টেশনে গিয়েছিলাম, লতা এসেছে, সঙ্গে একজন মহিলা। নেপালী মহিলা সহ এই অবস্থায় তাকে একলা পাঠাতে পারেনি তারা। ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে লতা ছুটে এল····বাবা···· কেমন আছেন ?

আমি লতাকে সান্ত্বনা দিই····আছেন····ডাক্তার এখনও ঠিক···· কিছু আর কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে গাড়ীতে ওঠে লতা। অটল ধৈর্য নিয়ে। বাড়ীতে এসে বাবাকে এক নজর দেখে····বড়মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে লতা। সন্ধ্যা থেকে রাত গেল। পাড়া প্রতিবেশীরাই কেউ একটু চা সামান্য খাবার খাবার খাইয়ে যাচ্ছেন, লতাকে বড়মাকে। আমাকেও সামান্য খাইয়ে দিলেন ওরা। সরকারের দুই ছেলেরা শশীবাবুর দেখা শোনা করে চলেছেন। কি বা দেখবার আছে ····ক্ষীণ হতে হতে জীবন প্রবাহ থেমে যাবে। বাবার দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে লতা বসেছিল। রাত ভোর হয়ে গেল। ডাক্তার এলেন।···· দুপুর পার হয়ে অপরাহ্ন হল। শেষ অপরাহ্নে, শেষ নিঃশ্বাস পড়লো শশীবাবুর। বাবার মৃত দেহের ওপর লতা লুটিয়ে পড়লো সুরবালা দেবী অজ্ঞান মত হয়ে গিয়েছেন।

জানি না লেখার সময় কি করে কাটছে বেচারী লেখা, যাদের কাছে মানুষ হয়েছে····একসঙ্গে বড় হয়েছে····তাদের এত বড় দুঃখের সময়ে কাছে থাকতে না পারার দুঃখ তার যে কত বড়, তা আমি বুঝতে পারছি।

সব শেষের পরেও শেষ কাজ থাকে। লতা কেমন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কালই সকালে, মিস্ শ্যামনিং নামে মহিলাটি চলে গিয়েছেন। আমরা সকলে চার্চের পেছনে কবরখানায়। শশীবাবুর কফিন বক্স এখন মাটির তলায় ঢাকা দেওয়া হয়েছে। এই পৃথিবীর ওপর থেকে শশীবাবুর দেহের চিহ্ন যখন আর দেখতে পাওয়া গেল না ধৈর্য্য হারা লতা যেন অধৈর্য্য হয়ে গেল····পাগলের মত অবস্থা কান্নায় ভেঙ্গে যাওয়া গলা—অনুচ্চারিতভাবে কেঁদে উঠলো। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতে আমাকে অবলম্বন করেই ঝাঁপিয়ে এল আমার বুকে। তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ধরে রাখলাম। ডান হাত দিয়ে মুখে চোখে লুটিয়ে পড়া রুক্ষ চুলগুলো সরিয়ে দিলাম। আর সকলের সঙ্গে আস্তে আস্তে তাকে ধরে নিয়ে চল্লাম। চার্চের বারান্দায় ফিরে আমার অনেক পরে মল্লিকবাবুদের মোটরে করে আমরা বাড়ী ফিরে এলাম। লতাকে ধরে :নিয়ে যখন আসছিলাম যদি সত্যি কথা বলি সেই নিদারুণ শোকের মধ্যেও আমার ভাল লাগছিল। লতার দুঃখের মধ্যে নিজের অনুভূতি মিশিয়ে দিয়েছিলাম। তার মধ্যেও তার স্পর্শ, তার দেহের স্পর্শ, আমাকে এক অন্য সুখানুভূতি দিচ্ছিল। এমন কি সে যখন আমার বুকের ওপর তার মাথা রেখেছিল, তখন তার রুক্ষ চুলে ভরা মাথার ওপরে আমার মুখ খানা নামিয়েছিলাম কয়েকবার। এমন কি গাড়ীতে লতাকে আমার পাশে আমার হাতের ঘেরার মধ্যে ঘিরে নিয়ে এলাম। অবশ্য আসার অবসন্ন লতা, লতার মতই নেতিয়ে পড়েছিল। ক্লান্তির ঘুম শান্তি হয়েই তাকে টেনে নিয়েছিল।····বাড়ী আসার পরেও তাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেওয়া হল। মূক হয়ে গিয়েছেন সুরবালা দেবী গলা রুদ্ধ তাঁর। শশী নামটাও আর উচ্চারণ করবার ক্ষমতা নেই। রাত শেষ হল—সকাল হল।

এমনি করেই দুনিয়ার নির্দেশ মত রাত দিন হয়ে চলে চলতে হয় মানুষকেও। উত্তপ্ত শোকও ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকে। এর

পরেও পাঁচদিন হয়ে গিয়েছে। সুরবালা দেবীই সামলে নিয়েছেন যেন একটু। তিনি আমাকে বললেন—লেখার ওই অবস্থা, কি করছে জানি না। সেও তো কম আঘাত পেল না—

হ্যাঁ। দাদা বৌদিরা আছেন—তবে আমাকে এবার।

যেতে তো হবেই বাবা। তবু তুমি ছুটে এসেছিলে তাই লতাকে সামলাতে পারলে।—

পরে ওঁর কাছেই শুনলাম শশীবাবু দুদিন কাগেই ওঁর কাছে লতার বিয়েতে অমত নেই শুনে খুবই খুশী হয়েছিলেন। আগের দিনই মতিলালকে পাঠিয়ে খাম আনিয়ে রেখেছিলেন। সকালে চা খাবার পরে বলেন আজ বড় ক্ষেত বাগানে যাব না। ফিরে এসে শিশিরবাবুর কাছে লতার জন্যে প্রস্তাব করে চিঠি দেব। শিশিরবাবু এমনিই লতাকে খুব ভালবাসেন, আর এ প্রস্তাব সানন্দেই নেবেন। ওই মেয়েটার কি ভাগ্য····

অমি বলি কিন্তু এ প্রস্তাব তো বন্ধ করবার দরকার নেই।

তা নেই, তবে····এখন তো আর লতাকে এখন এসব কিছু বলা যাবে না। আহারে,—মেয়ের কত আশা বাবাকে নিজের বাসায় নিয়ে যাব।····ছেলের মত কাজ করবো আমি।

কি ভাগ্য নিয়ে মেয়েটা এসেছি—জন্মের পরেই মা মারা গেল। ঠিক করা বিয়ে হল না,····আবার বিয়ের কথা হল, তখন এই সর্বনাশের মধ্যে পড়লো।····আমিও আর কত দেখবো····কত সইব—শশী না গিয়ে আমি আমি কেন গেলাম না।

সরকারের বড় মেয়ে ছিলেন, বলেন, যাওয়া-থাকা কি মানুষের নিজের হাতে সুরোদিদি।

আরো দুদিন পরে আমার যাবার দিন এলো। লেখার জন্য বড় ভাবনা হচ্ছিল মনে। যাবার আগে লতার কাছে এলাম। শশীবাবুর ঘরে চুপ করে বসেছিল। আজকাল এখানেই থাকে সারা দিন। ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আবার যেন পিতৃশোক উথলে

উঠলো। এতবড় একজন সহায় হারাবার শোক।

আমি বলি—লতা, আমি তো আছি। ওর হাতখানি ধরি।

কান্নায় আড়ষ্ট গলায়—আছেন, আপনি আছেন, বলে লতা আরো কাছে এসে আবার তার মাথাটা, আমার বুকের ওপর রাখলো, না। আমি আর আগের মত উত্তেজিত হইনি। তাকে পরিপূর্ণ করে জানবার পরে আমি যেন শান্ত হয়েছিলাম। তাকে আমার বলেই জানবার পরের স্থিরতা। তার মাথার উপরে মুখ নামাতেও চাইনি। তার পিঠের ওপরে আমার হাত রেখেই, আমার সমস্ত মন উজাড় করে দিয়েছিলাম।····এদের এ অবস্থায় রেখে, মনে একটা অশান্তি নিয়ে চলে এলাম। যদিও এখানে এমনি কোন ভয় নেই। লোকজন সবাই ভাল। তবু এত দূরে এই নির্জন স্থানে, দুটি মহিলা। একজন বৃদ্ধা, আর একজন যুবতী। এদের পুরুষ গার্জেন বলতে গেলে আমি। বাড়ী এসে দেখি এই সময়ে মানসিক উত্তেজনার মধ্যে বলেই বোধহয় লেখার ডেটের অনেক আগেই পেন সুরু হয়। দুদিন আগেই লেখার একটি ছেলে হয়। আমি আসবো জানিয়েছিলাম বলেই আর খবর দেওয়া হয়নি।

লেখার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে, ও আগে লতার কথাই জানতে চাইলো। লতা কেমন চুপ হয়ে গিয়েছে শুনো লেখাও চুপ করে রইল। আমি বললাম—তুমি একটু সেরে ওঠ, তারপর গিয়ে ওঁদের ব্যবস্থা করো। ইচ্ছে করলে কিছুদিন এখানেও আনতে পার বড়মাকে লতাকে। লেখা খুব খুসী হয়ে রইল, সে যেতে পারেনি কিন্তু এদের দুঃসময়ে তার স্বামী সবকিছু দেখাশোনা করেছে, এটা তার একটা গর্ব। অনেকদিন পরে লেখাকে না দেখার পরে, দেখে যে এত ভাল লাগবে তা বুঝতে পারিনি। আরও বুঝতে পারলাম। লেখা আমার কতখানি।

লেখা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে, কি দেখছো?

কি দেখছি বলতো····

লাল পাহাড়ের সূর্যোদয় ?

সবটা ঠিক হল না····উষার উদয় দেখছিলাম।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে লেখাও স্বচ্ছ হয়ে গেল।

মণীশ নাহারকাটিয়ায় ফিরে এল। খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে। তার প্রাপ্য ফার্লো পাওয়ার জন্যে। এই ছুটি নিয়েই সব কিছু সারবে সে। প্রথমে জামতাড়া তারপর জোড়হাট। যদি শশীনাথবাবুর মেয়েটির বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকে জোড়হাট থেকেই এখানে খবর দেবে····এখান থেকে ওখানে গিয়ে, হ্যাঁ জোড়হাট থেকেই বিবাহ করবে। সে জানে, সে বল্লে, মেয়েকে নিয়ে গিয়ে বিবাহ দিতে বকসী দম্পতি অরাজী হবেন না।····ফার্লো মানে প্রায় তিনমাস ছুটি—তাই সেটা পেতে গেলে একটু অপেক্ষা করতে হল। তা হোক এদিকে একটু দেরী হলেও একেবারে সব কিছু করতে চায়। অর্থাৎ ফিরে যখন আসবে তখন আর সে একা থাকবে না। এসব দিকে তদবীর ইত্যাদি করে ছুটি সাংশান হতেই আরো একটা মাস পার হয়ে গেল। বিবাহেরও একটা প্রস্তুতি থাকে—তবে তা নিয়ে এখন তেমন ভাবনা নেই। একটু বয়স বেশী হলে, যখন কোন ইচ্ছা বিশেষ করে বিবাহের ইচ্ছা হয়, তখন আর দেরী করা অসহ্য হয়ে ওঠে। মণীশেরও তার ব্যতিক্রম হল না।

মণীশ ছুটি পেয়ে প্রথম গেল কলকাতায়, সেখানে নিজের জন্য কিছু জামা স্যুট অর্ডার দিল। বাইরে যেতে হলে····বিশেষ করে, যেখানে একটা বিয়ের ব্যাপার ঘটবার সম্ভাবনা আছে····সেখানে পোষাক সম্বন্ধে সজাগ হওয়াটা, কেবল মেয়েদের একচেটিয়া নয়···· ছেলেদের কিছুটা থাকে।····তারপর কলকাতায় তার ছাত্র জীবনের কাল কেটেছে। অমিশুক হলেও, কিছু কিছু সহপাঠিদের সঙ্গে দেখা-শোনা খোঁজ খবর করবার ইচ্ছাও থাকে। দেখা-শোনা হওয়ার পরে,

কেউ মণীশকে বল্ল, বেশ আছ। কেন আর ও ফাঁদে বন্দী হতে যাচ্ছ? কেউ বল্ল, জীবনের ভাল সময়টাই বৃথাই দিলে। মণীশের বিয়েটা কোথায় হবে, একটাও প্রশ্ন ছিল। মণীশ বোধহয় একটু চালাক হয়েছে আজকাল—বলে, সবে কনে দেখতে যাচ্ছি। দেখি পছন্দ হয় কিনা····

কেন, তোমাদের সমাজে তো আগে দেখা-দেখি····মন বোঝা বুঝি হয়ে যায়, আমাদের মত হাত-পা বেঁধে দুর্গা বলে ঝুলিয়ে দেয় না।

আমি তোমাদের পদ্ধতিটাই পছন্দ করি····

এটাও মন্দ নয়····একেবারে ছাদনাতলায়····সেই কি হেরিলাম নয়ন মেলে। সবাই হেসে ওঠে। বেশ হাসি খুসী মন নিয়েই মণীশ জামতাড়ার গাড়ীতে উঠে বসে। কলকাতাতেও দিন কুড়ি কেটে যায় মণীশের। রাতের গাড়ীতে উঠে বেলা নটা নাগাদ জামতাড়া ষ্টেশনে নেমে····নিজের সুটকেস হোলডল লেফট ল্যাগেজে রাখে প্রথমে।···· ওয়েটিং রুমেই এসে, বেশবাস প্রাথমিক কাজ, সেভিং সেরে ফেলে···· ষ্টেশান মাষ্টারের কাছ থেকে, পোষ্ট অফিস, ডাক বাংলো····ও সরকারি ডাক্তার খানার খবর নেয়। ডাক্তার মানুষ, আগে সরকারী ডাক্তার খবর নেয়। তাছাড়া সহর থেকে দূরে হলেও, হাসপাতালটি ষ্টেশনের কাছেই পড়ে, হেঁটে যেতেও মণীশের অসুবিধা হবে না। ষ্টেশনে যে চা পাওয়া যায়, তাই আর নিজের আনা বিস্কুট খেয়েই ব্রেকফাষ্ট সারলো মণীশ।····জামতাড়া সরকারী হাসপাতালে হাজির হল। খুবই ছোট হাসপাতাল। সঙ্গেই ডাক্তারের কোয়ার্টার।

এখন যিনি ডাক্তার ইনচার্জ, তিনি নতুন এসেছেন। তিনি ঠিক শশীবাবুকে অনুমান করতে পারলেন না, এ ছাড়া শশীবাবু থাকতেন সহর থেকে দূরে, আসতেন না মোটেই, কাজেই খুব প্রাচীন লোক ছাড়া তাঁর নামটাও জানতেন না অনেকে। তবে হসপিটালের কর্মচারীদের দুচার জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই, কেউ কেউ চিনতে পারলেন, বুঝতে পারলেন, তাদেরি একজন। সর্কার সাহেবের যে ছেলেটি

হাসপাতালেই কাজ করে তাকে ডেকে দেয়। জানে সে শশীবাবুর প্রতিবেশী, তারাও কৃশ্চান। ছেলেটি তো মণীশের চেহারা, পোষাক পরিচ্ছদ দেখে অবাক হয়ে গেল।....শশীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে, থতমত খেয়ে গেল....আমতা—আমতা করে বল্ল—আপনি কি শশীবাবুর কেউ হন ?

না—তা ঠিক হইনে, তবে, ওঁর এক বন্ধুর ছেলে....ছোট বেলার বন্ধু—আমার আসবার কথা ছিল।

কথা ছিল....কবে ? আপনি কি জানেন না শশীবাবু আজ চার মাসের ওপর হল মারা গিয়েছেন....

মারা গিয়েছেন....হঠাৎ যেন অবশ হয়ে যায় মণীশ। তার মুখ দিয়ে প্রায় বার হয়ে এসেছিল....তাঁর মেয়েটি কোথায়, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বলে....না আমি জানতাম না। প্রায় আট ন মাস, আমরা কোন খবর জানি না।....এরপর আর কি বলবে বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল ; তারপর চলে আসবে ভাবছে....ছেলেটিই বল্ল—আপনি ওঁর বাড়ীতে যাবেন....দেখা করবেন ওঁদের সঙ্গে—

ওঁদের সঙ্গে—ভাবে মণীশ, তাহলে কি মেয়ে জামইায়ের কথা বলছে ? তাহলে কি ওঁর মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

মণীশকে ভাবতে দেখে, ছেলেটি বলে—শশীবাবুর দিদির সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

শশীবাবুর দিদি আছেন এখানে ?

হ্যাঁ, উনি তো বরাবরই এখানে থাকেন, এখন অবশ্য শশীবাবুর মেয়েও আছেন।

মেয়ে আছেন শুনে আগ্রহী হয়, দেখবে একবার মেয়েটিকে। বিয়ে হয়েছে ভালই, তবে....তাকে দেখতে, মামার বলা সেই ডরোথী মেম....তার জন্যই তার কৌতূহল হয়।....আবার ভাবে এতদিন পরে.... শশীবাবুও নেই, মেয়েটিও বিবাহিত হয়ে গিয়েছে, তবে আর গিয়ে কি করবে ? ভাবতে থাকে সে।

চলুন না, দেখা করে আসবেন। আমাদেরই প্রতিবেশী ওঁরা।

তাই নাকি!

বড় ভাল লোক ওঁরা আপনাকে দেখে খুশীই হবেন। এখান থেকে কিন্তু দূর হবে খানিকটা। আপনি কি হাঁটতে পারবেন? বোধহয় মণীশের চেহারা দেখেই বলে....

মণীশ একটু হেসে বলে—হাঁটা টা ঠিক অভ্যেস নেই....চেষ্টা করতে পারি।

আচ্ছা, আপনি সাইকেল চড়তে পারবেন?

হ্যাঁ তা পারবো....মফঃস্বলে মানুষ, তাছাড়া গাড়ীটা খারাপ থাকলে মাঝে মাঝে ওটা ব্যবহার করতে হয়—কিন্তু এখন যেতে আপনার কোনও অসুবিধা হবে না....

না, তা খুব হবে না....আমি রোজ সাড়ে ৭টায় আসি....সাড়ে বারোটা নাগাদ বাড়ীতে খেতে যাই আবার আড়াইটে আসি....আজ একটু আগে হয়ে যাবো—তার জন্য কিছু হবে না। ডাক্তার সাহেবকে আপনার কথা বলে আসবো। ওখানকার এক সহকর্মীর সাইকেল যোগাড় করে দেয় মণীশকে।

মণীশের একবার ইচ্ছা হল জিজ্ঞাসা করে, শশীবাবুর মেয়ের বিয়ে কবে হল, কোথায় হল, প্রতিবেশী যখন তখন জানতেও পারে। আবার ভাবলো, থাক। অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশ করা হবে।

ছেলেটি এলে মণীশ জিজ্ঞাসা করে, এখানে হোটেল মত কিছু আছে কি,....একরাত্রি থাকার মত....

না, তা ঠিক নেই....আপনাদের মত যারা আসেন তারা বেশীর ভাগ ডাকবাংলোয় ওঠেন।

থাক....যদি সুবিধা হয় আমি আজ রাতেই ফিরে যাব।

দুজনে রওনা হল, শশীবাবুর বাড়ীর কিছুটা আগেই সরকারদের বাড়ী। রাজেন সরকারের হঠাৎ মনে হল....প্রায় দুপুরের সময় দুজন শোকতপ্তা মহিলার বাড়ীতে—এহেন অতিথিকে নিয়ে ওঠা ঠিক

হবে কিনা বা আগে একটু খবর দেওয়া উচিত। ঝোঁকের মাথায় এই সময়ে না আনলেই হত। তা যখন হয়নি আগে নিজেদের বাড়ীতে বসাই। নিজের বাড়ীর সামনে এসে বলে—এটা আমাদের বাড়ী, আপনি আসুন।—আপনি এখানে আমার বাবার সঙ্গে গল্প করুন····আমি ওঁদের একটু খবর দিই। একেবারে দুটি মহিলা থাকেন····তাই একটু খবর দেওয়া।

হ্যাঁ—হ্যাঁ সেটাই খুব ভাল হবে।····তাই করুন।

দুজনে নেমে সরকার বাড়ীতে এলেন—বৃদ্ধ সরকার সাহেব, মণীশের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। ছেলেকেও তিনি এখনি ওবাড়ী যেতে বারণ করলেন।····মণীশের পরিচয় পেয়ে····তাকে এই দুপুরে এখানেই আহার করতে অনুরোধ করলেন। সরকার সাহেব প্রবীণ লোক, এই দুপুরে ভায়ের বন্ধুর ছেলেকে দেখে····হয়তো কান্নাকাটি করবেন····হয়তো তাদের আর খাওয়াই হবে না····কিংবা, দুটি মহিলা, এখন অতিথি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।····সরকার বাড়ী বড় সংসার মণীশ প্রথমে আপত্তি করলেও বৃদ্ধ ব্যক্তির অনুরোধে রাজী হল।····যখন সরকার সাহেব বল্লেন—তুমিই বলছো, তুমি শশীর বন্ধুর ছেলে। আমি শশীর চেয়ে অনেক বড়।

বাড়ীর মেয়েরা অনেক বেশী খবর রাখে····এদের একজন বল্ল, শশীবাবুর কোন বন্ধুর ছেলের সঙ্গে লতার বিয়ের ঠিক ছিল না—

একজন বল্ল, হ্যাঁ লতা বলতো না ডাক্তারের সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

ও সে অনেক ছোটবেলায়····

সরকারের বড় মেয়ে বলেন····আরে পাটনার সমাদ্দারবাবুর ভায়ের সঙ্গে লতার বিয়ের ঠিক হয়েছে। সবাই চুপ করে গেল।

আসলে লতা একটু বাইরে বাইরে মানুষ হয়েছে বলে লেখাপড়া করে বলে—এদের সঙ্গে আলাপ থাকলেও—খুব মেলামেশা ছিল না এমনিতে লতাও একটু অমিশুক।

সুরবালা দেবী ও শশীবাবু····একজন ইংরাজ মহিলার দৌহিত্র বলে,

এঁরা একটু সমীহ করে চলতেন—আর ওঁরাও অবস্থা খারাপ হয়ে গেলেও—একটা যে অবস্থাপন্ন, ও নামী কৃশ্চান সমাজের একজন ছিলেন সেটাও ভুলতে পারেন নি। তবে ব্যবহারিক ভাবে-আদান প্রদান ছিল বন্ধুত্বের পর্য্যায়ে।

বেলা গোটা তিনেকের সময়—সরকার সাহেব নিজেই গেলেন। মণীশের আসবার খবরটা দিতে। লতা শশীবাবুর ঘরেই ছিল···· সরকার জ্যাঠামশাইকে দেখে উঠে এল।—বড়মাকে ডাকবো বল্ল।

হ্যাঁ সুরদিদিকে খবর দাও—আমি বসছি।

সুরবালা দেবী এলেন।

একটি ছেলে এসেছে····বলছে শশীর বন্ধুর ছেলে সে।

শশীর বন্ধুর ছেলে ?—তবে কি····

বড়মার আড়াল থেকে লতাও চুপ করে শোনে।

ছেলেটি নিজে ডাক্তার····আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

লতা দুহাত দিয়ে নিজের বুক চেপে ধরে।

সুরবালা দেবী অধীর আগ্রহে বলেন····তার নাম কি ?

মণীশ সরকার বল্ল—ডাক্তার বিশ্বাসের ভাগ্নে বল্লেই হবে।

সুরবালা দেবীর পাশ থেকে—লতা ছুটে গেল পাশের—দুহাতে বুক চেপে ধরে—বিছানায় লুটিয়ে পড়ে এক উত্তাল কান্নাকে—প্রবল বাধা দিতে চায়।

সুরবালা দেবী চুপ—এতদিন পরে এল ডাক্তার বিশ্বাসের ভাগ্নে। একবার ভাবলেন বলেন—আর এখন এসে দরকার কি ?—কিন্তু সুধীশের ছেলে—সেই সুধীশ দিদি বলতে অজ্ঞান ছিল····না, তাকে না দেখে ফিরিয়ে দিতে পারবেন না····

আপনার ওখানেই উঠেছে ?

না—না সে এখানকার কিছুই জানে না··· বলে সব ঘটনা বললেন। সরকারের বিবেচনায় কৃতজ্ঞ হন সুরবালা দেবী।

সুধীশের বিয়ের সময় তার বৌকে দেখেছিলেন সুরবালা দেবী

কিন্তু ছেলেকে দেখেন নি। দিদিমা চলে যাবার পরে আর যান নি উনি।

সরকার সাহেব চলে গেলেন মণীশকে নিয়ে আসতে। সুরবালা দেবী লতাকে দেখতে এলেন। ততক্ষণে লতা নিজেকে সামলে নিয়েছে। কান্নাকে জোর করে রোধ করেছে। তা দুর্জয় শক্তি পেয়েছে যেন।

তার দিকে একটু দেখে, কাছে এসে দাঁড়ান সুরবালা দেবী। কাঁধে হাত রাখেন।....আবার হাতটা তুলে নেন ....তারপর বলেন—মণীশ যদি কোন প্রস্তাব তোলে....কি বলবো....

ধীর সংযত লতা বলে—চলে যেতে হবে।

আর কোনও প্রশ্ন করেন না, সুরবালা দেবী। মাঝখানের ঘরে একটা চেয়ারে স্থির হয়ে বসে....নিজেকে সামলে রাখতে চেষ্টা করেন। আর কটা মাস আগে এলে....শশী....শশী বড় সুখে যেতে পারতো। মৃত্যুকালে....একটা কথাও বলতে পারেনি। মৃতুকালে মেয়ের চিন্তায় বোধহয় একটা বোবা যন্ত্রণা ভোগ করেছে। কদিন নিশ্চিন্ত ছিল সে, সুধীশের ছেলে পরমেশের ভাগ্নে—কথা ভঙ্গ করবে না।....পায়ের শব্দ পাওয়া গেল....সেই মুহূর্ত্তে সুরবালা দেবীর দুঃখের সাগর উথলে উঠলো।....

মণীশকে পৌঁছে দিলেন সরকার সাহেব। উনি চলে গেলেন। কারণ....এদের কথার মধ্যে নিজেকে কথাটা ঠিক মনে করলেন না। চেয়ার ছেড়ে উঠতেও পারলেন না সুরবালা দেবী। অবাক হয়ে মণীশকে দেখলেন....সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে আস্তে বললেন, বস।

থতমত খেয়ে মণীশ নিজের পরিচয় দিতে যায়....আমি, আমি।

জানি, তুমি সুধীশের ছেলে ; সেও আমার এক ছোট ভাই ছিল।

একথা শুনে, মণীশ নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে....

মণীশ তাঁর পায়ে দিতেই কেমন হয়ে যান, সুরবালা দেবী। যেমন আত্মীয়তাহীন কেবল সৌজন্যসুলভ ব্যবহারটুকু করবেন....সংক্ষিপ্ত

কথায় কথা শেষ করবেন ভেবেছিলেন····সব ভুলে গেলেন।····সুন্দর চেহারার নম্র ভঙ্গিমার আনত ছেলেটিকে দেখে····সব ভুলে গেলেন···· মণীশ উঠে দাঁড়াতেই, তার দু কাঁধের ওপর হাত রেখে····বলে উঠলেন—

সেই তো, তুমি এলে বাবা—আর কটা মাস আগে এলে না কেন? এবাড়ীর এ ঘরে ঢুকবার পর মুহূর্ত্তেই মণীশের কেমন হয়েছিল—বড় দেরী করে ফেলেছে—সে বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে তার। কিন্তু কি বলবার আছে তার! মামা তাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।—বাবার শেষ অনুরোধ····এসবই তো সে অমান্য করেছে। নিজের অপরাধ বোধে অবনত হয়ে থাকে মণীশ।

সুরবালা দেবী, চোখের জল মুছে বলেন—সুধীশের ছেলে তুমি। তুমি আমাদের কত আপনার····ডাক্তার বিশ্বাস তোমার কত প্রশংসা করেছিলেন সেবার এসে।····তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে····

তুমি বসবে?

বসবে? ভাবে মণীশ····কি করবে বসে, কোন কথা এঁদের সঙ্গে বলবে এখন····তাই বলে—না, আমাকে অনেক দূর যেতে হবে····আর কিছুই তো জানি না এখানকার।

চুপ করেই থাকেন সুরবালা দেবী। তিনিও বসতে বলেন না।

তবে আমি যাই····বলে মণীশ।

তুমি কদিন থাকবে এখানে····এখানে কি কোন কাজে এসেছিলে?

কাজ!····না····না····কোন তেমন কাজে আসিনি····আমি কালই চলে যাব ভাবছি।

তুমি ওকি ডাক্তার বিশ্বাসের মত চার্চে যাও না?

না—না আমার তেমন কিছু নেই।

তবে যদি সম্ভব হয়····এখানকার মিশনারী চার্চে একবার হয়ে যেও। এখন স্কুলের ছেলে-মেয়েরা····তরলা স্মৃতি ভাণ্ডারের সাহায্য পেলে বিশেষ উপকৃত হবে····দু একবার আবেদন করা হয়েছিল—

কিন্তু পাওয়া যায়নি····নিয়ম-কানুনও সব বোধহয় এঁরা জানেন না। এখানেও সব অল্প শিক্ষিত····আমার ভাইঝির খুব·····বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন।····বল্লেন না এখানকার এদের সাহায্য করলে ডাক্তার বিশ্বাসের প্রকৃত ইচ্ছাটা পূরণ হবে····

মণীশ বলে, আপনি যখন বলছেন—তখন আমি তা নিশ্চয় করবো, দরকার হলে দু-চারদিন থাকবো, আমার এখন ছুটি আছে। মণীশ আবার তাঁকে প্রণাম করতে গেল।

থাকবাবা, মণীশের হাত ধরে তাকে থামালেন, আর একটু নত হয়ে ওঠা মাথাটা টেনে নিয়ে শিরচুম্বন করলেন।

মণীশ যুবক—মণীশ পুরুষ মণীশ, থর থর করে কেঁপে উঠলো যেন। জীবনে এই প্রথম সুরবালা দেবীর স্নেহমাখা বৃদ্ধ রেখাঙ্কিত মুখের দিকে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে রইল মণীশ। নড়তেই বুঝি পারবে না। তারপর ধীর পায়ে বার হয়ে এল।

তার সঙ্গে বার হয়ে আসেন সুরবালা দেবী। ধীর পায়ে নেমে আসেন বাড়ী গেট অবধি। তাঁর দিকে আর একবার চেয়ে মুখখানা কেমন বিষাদ করে, মণীশ চলতে শুরু করে। আর সেই দিকে দৃষ্টি মেলে সুরবালা দেবীর মনটা এক অসহ্য ব্যথায় ভরে ওঠে। শেষ হয়ে গেল····এতদিনকার একটা আশা শেষ হয়ে গেল।

সুরবালা দেবী ঘরে এলেন, এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজাটা হাতের ঠেলায় খুললেন। খাটের শেষ প্রান্তে বসে আছে লতা। পশ্চিম দিকের অস্তমান দিগন্তের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে এখনও আলো ছড়িয়ে আছে মাঠে প্রান্তরে। আবার লতার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন একটু, তারপর বসে পড়লেন লতার পাশে।

লতা শুনতে চায়নি····ডাক্তার কি বলে গেল। লতা জানতে চায়নি কেন এসেছিলেন মণীশ সরকার, তাঁর ইচ্ছেটা কি।

অনেকক্ষণ বাদে সুরবালা দেবী বলেন,····মনটা বড় খারাপ লাগছে।····

লতা প্রশ্ন করেনি, কেন।

সুধীশের ছেলেকে শুক্‌নো মুখে ফিরিয়ে দিলাম—এক ঘোঁটা জলও দিলাম না, বড় রূঢ় ব্যবহার করা হল ছেলেটির সঙ্গে। আর তো কোনদিনও দেখা হবে না ওর সঙ্গে।

লতা নীরবে উঠে দাঁড়ালো। তারপর সুরবালা দেবীকে জড়িয়ে ধরে বলে, বড়মা····দুঃখ করো না—আমরা অনেক দুঃখ এমনিই পেয়েছি।

অবাক হয়ে সুরবালা দেবী ভাবেন····লতা কত বদলে গিয়েছে। এই ক'মাস হল বাবা গিয়েছে তার আগে ও ছিল সংসার অনভিজ্ঞা ছোট মেয়ে। কলকাতা থেকে সুবীর—লেখা কত অনুরোধ জানিয়েছে, কিছুদিন অন্তত একটা মাস ওখানে গিয়ে থাকতে। লেখার ছেলেটি একটু রুগ্ন মত হয়েছে, তাকে নিয়ে লেখা এসেছিল; দিন দশেক থেকেই ছেলের জ্বর দেখে, তাকে চলে যেতে হয়। লতা কিছুতেই যেতে রাজী হয় নি।····

লতা সত্যিই বদলে গিয়েছে। কালিংপএ আর ফিরে যায় নি সে। সত্তর বছরের বৃদ্ধাকে একলা রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। বাবার বিষয় সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করতে হবে। জামতাড়ার কাছাকাছি কোথাও চাকরী পেলেই ভাল হয়। বড়মাকে নিয়ে থাকবে, ছুটিতে বাড়ী আসবে। এখন এখানকার মল্লিক বাবুদের অবস্থা জমজমাট, নানান ব্যবসা, ষ্টোন চিপসের কারবার, ইঁটকাটা, তাছাড়া নার্শারী করেছেন। তাদের অনেক দিনের ইচ্ছা শশীবাবুর জমিগুলো লীজ বা কেনা, যা কিছু। কিন্তু আগে হলে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যেত। এখন সে এখানকার নামকরা উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করেছে। তিনি বলেছেন, চট করে রাজী হয়ে গেলে দাম পাবে না। মল্লিকবাবুরা খুব আশা করে আছেন।····লতা সুরবালা

দেবীকে নিয়ে চাকরীস্থলে যাবে। কাজেই এসব ঝামেলা মিটিয়ে যাবে। লেখাও বড়মাকে রাখতে পারে। কিন্তু সে যতদূর জানে বড়মার ইচ্ছা নয়, শেষ বয়সে জামাই বাড়ী গিয়ে থাকা। তাঁরও ইচ্ছা নয়, ওঁকে ছেড়ে দিয়ে-স্বার্থপরের মত নিজের চাকরীতে চলে যাওয়া। এমন কি সুবীর বাবুর কাছেও কোন সাহায্য নিতে সে রাজী নয়। বাবার নগদ টাকা কিছুই নেই। কিছু চায়ের শেয়ার আছে মাত্র। তবে জমি থেকে খাওয়া পরা আর বাগান ও চাষের খরচ হয়ে যেত। তবে পরিশ্রম বড় বেশী—এক উপায় হচ্ছে এখানকার সব পাঠ উঠিয়ে দিয়ে পাটনায় একটা ছোট বাড়ী কেনা। আকাশ····পাতাল ভাবছিল লতা। বড়মা এখনও অন্য কথা তোলেন নি····তবে····আর কিছুদিন বাদেই তুলবেন। একলা একা থাকা সত্যিই সম্ভব নয়। শেষ অবলম্বন লেখা। কিন্তু তাও আর হবে না। লেখার সংসারে কোন রকম অশান্তি সে আসতে দেবে না। সুবীর বাবু কি সত্যিই তাকে ভালবাসেন? তাঁর ব্যবহারের রূপটা গভীর স্নেহ কি ভালবাসা তা লতা ঠিক বুঝতে পারে না····তবে কেমন ভয় পায়····দূরে থাকতে চায়। কিন্তু সুবীর বাবুকে আমার ভাল লেগেছে····নিজে যেন দুর্ব্বল হয়ে যাই····তাই লেখার কাছে যাওয়া থাকা আমার হবে না। শেষ উপায়—তাই বিয়ে করা।—বাবা চেয়েছিলেন—অজিত বাবুকে। তাই হোক শেষ পর্য্যন্ত।

লতার এদিনের চিন্তার মধ্যে ডাক্তার মণীশ সরকারের স্থান ছিল না এতটুকু। বাবার মৃত্যুর শোকের গভীরতা থেকে সাংসারিক চিন্তার মধ্যে ফিরে আসার সময় থেকেই—ডাক্তারকে সে মুছে ফেলেছে। তার এই ডাক্তার চিন্তার জন্যই বাবা এ জীবনে কিছুই পেলেন না। দাদা দিল এক আঘাত। সে দিল অন্যভাবে। লেখার বিয়ের পর তার বিয়ে দেবার ইচ্ছা বাবার হয়েছিল····কিন্তু তখন লতা ছিল ডাক্তার স্বপ্নে বিভোর। লেখার আগেও তার বিয়ে হতে পারতো। অন্তত মণীশ সরকার বিলেত চলে যাবার পর এ নিয়ে

বাবা বড়মার সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন কিন্তু তেমন চেষ্টা করেন নি, লতার মনোভাব জেনে লতার জেদে। স্নেহময় মানুষটি চাইতেন না লতা এতটুকু দুঃখ পাক।....থাক, ও। আচ্ছা পড়ছে পড়ুক। সে যদি ডাক্তারের মিথ্যা মোহ নিয়ে না থাকতো তাহলে বাবাও দেখে যেতে পারতেন....স্বামীর পাশে তাঁর মেয়েকে। হয়তো লেখার মত ছেলেমেয়ে। নাতী-নাতনী জামাই নিয়ে জীবনের কিছুদিন সুখেই কাটাতে পারতেন। শেষ নিশ্বাস ফেলবার সময়ে একাকী বয়স্থা অবিবাহিতা মেয়ের চিন্তা নিয়ে যেতেন না। বাবাকে তাঁর এই সুখ থেকে বঞ্চিত করেছে সে নিজে।....আর তার জন্যে দায়ী....এই ডাক্তার। বাবাকে জীবনের, সংসারের সুখ থেকে বঞ্চিত করবার ব্যথা বড় কঠিন হয়ে লতাকে দংশন করতো।....নিজেকে দায়ী করতো মনে মনে। আর পরোক্ষ দায়ী করতো ডাক্তারকে।

কিন্তু লতা....কখনও ভেবে দেখেনি, ডাক্তারের কোথায় দোষ। তাই ডাক্তার যখন সত্যি এলো, তখন লতা নির্মম হয়ে উঠলো তার ওপরে। তাদের সমস্ত সুখের অপহারক হয়ে আজ আবার যেন সে দেখতে এসেছে....দুঃখের ভারটা, অসহায় অবস্থাটা। তাদের অর্থ নেই বটে, কিন্তু আত্মসম্মানটা আছে। লতা তার পরবর্ত্তী কাজ.... কি কি আছে তাই ঠিক করতে থাকে। বাড়ীটা রাখতেই হবে....

ধীরে ধীরে মণীশ ফিরে এল সরকার বাড়ীতে। তারপর রওনা হল....সহরের দিকে। সে রাত্রে তাকে অন্যত্র যেতে দিলেন না সরকারী ডাক্তার। একটা বড় চাকুরে বিলেত ফেরত ডাক্তার। তার সঙ্গে খাতির রাখতে চাওয়া স্বাভাবিক। ষ্টেশন থেকে সুটকেশ হোল্ড অল আনিয়ে নেওয়া হল। পরদিন চা খেয়ে, মণীশ স্থানীয় চার্চে যাওয়া স্থির করলো। যে কয়েক ঘর কৃশ্চান আছেন, তাঁদের খবরাখবর নেবে ঠিক করলো। সুরবালা দেবীর ব্যবহারে সে শ্রদ্ধায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ইচ্ছামত কাজটা করবেই। এখান থেকেই একটা সাইকেল পেল সে। পথের নির্দ্দেশ জেনে নিয়ে সে

রওনা হল। প্রথমে যাবে ডাকবাংলোয়, সেখানে ব্যবস্থা সেরে তবে যাবে অন্য কাজে।....ডাকবাংলোয় সহজে ব্যবস্থা হয়ে গেল। ওখানকার চাকরকে কিছু বকশিষ দিতেই, সে ঘর ইত্যাদি ব্যবস্থা খাওয়া-দাওয়া সব কিছুর ভার নিয়ে নিল। এ দিকটায় নিশ্চিন্ত হল মণীশ। ছোকরা চাকরটা তখুনি মণীশকে চা দিতে চেয়ে চলে গেল। ঝাঁকরা হয়ে ওঠা একটা ঘোড়া নিম গাছের ছায়ায়....বেতের চেয়ার টেবিল দিয়ে গেল ছেলেটা। স্থির হয়ে বসলো মণীশ। থাকার ব্যবস্থা হওয়াতে।

এতক্ষণে যেন আসল কথাটি মনে করতে পারলো মণীশ। শশীবাবুর মেয়েটি বিবাহিত কি অবিবাহিত তা যেন সঠিক বুঝে উঠতে পারেনি সে। মুখ ফুটে ঠিক এই কথাটা জিজ্ঞাসা করতেও পারেনি কাউকে; একবার যেন ভদ্রমহিলা শশীবাবুর দিদি....আমার ভাইঝি....কথাটা বলেছিলেন।....তিনি কিন্তু মণীশ কেন এসেছে তা স্পষ্ট করে জানতেও চাননি।—যদিও এত দেরী করে কেন এলে....তা বলে কেঁদেছিলেন, তবে তার থেকে....মেয়েটির বিয়ে হওয়া বোঝা যায় না। এও হতে পারে—বাবার প্রতি ওঁর যা স্নেহ প্রকাশ পেল তার জন্য....তার ছেলের সঙ্গে....ওঁদের নতুন কোন সম্বন্ধ হল না বলে। এই দুঃখ তাও হতে পারে। মণীশের কাছে একটা ব্যাপার খুব আশ্চর্য্য লাগলো।....এতকাল পরে....এতটুকু চেনা না থাকবার পরেও সুধীশের ছেলেকে এত আপন করে নিলেন ভদ্রমহিলা—কিন্তু এত কালের মধ্যে সেই সুধীশের ছেলেকে কখনও দেখতে চাননি। কখনও কাছে আসতে বলেন নি তো এঁরা! মামার সঙ্গেও তো, এঁদের জানাশোনা ভালই ছিল মনে হল। তবে কি মামা এসব পছন্দ করেন নি? মামার পক্ষে সবই সম্ভব ছিল। একবারের মত, মায়ের সঙ্গেই দেখা করতে দেন নি।—কিন্তু এঁরা নিজেরাও তো একবার যেতে পারতেন। অন্তত—বাগদত্তা বিয়ে ঠিক করা ছেলে মেয়েকে একবার দেখতে দেওয়া—দু পক্ষেরই উচিত ছিল।

চা খাওয়া শেষ করে মণীশ চার্চে গেল। এখানে কয়েক জন

ইংরাজ মিশনারীরা আছেন। কয়েক ঘর কৃশ্চানও আছেন। মিশনারী পরিচালিত ছোট ইস্কুল আছে····একটায় ছেলে মেয়েরা এক সঙ্গে পড়ে।····আর এখানকার স্থানীয় কৃশ্চানদের পরিচালিত একটা মেয়ে ইস্কুল আছে····মাইনর পর্য্যন্ত। এখানকার ক্লারজীম্যান, বীন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে খুব সন্তুষ্ট হল মণীশ।····তাঁর কাছ থেকে পরিচয় পেলো····এখানকার কয়েক ঘর বাসিন্দার। তমোনাথ ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী একটা স্কুল চালান। কিছু মিশনারী এড্ ও স্থানীয় চাঁদা রাজ এস্টেটের সামান্য বার্ষিক চাঁদা ইত্যাদিতে চলে।····এখন তাঁর স্ত্রী, তিনি আরও দু' একজন এখানে টিচারী করেন।····সকলের ইচ্ছা এটাকে আরও বাড়ানো····কিন্তু তাতে খরচ অনেক বেশী। যা ছাত্র ছাত্রী পাওয়া যায় তাদেরই ঠিক মত পড়াবার লোক পাওয়া যায় না। তবে ছেলে পড়ে শুধু ইনফ্যাণ্ট ক্লাশে। মিষ্টার বীন বলেন—আপনি কয়েকটা দিন থাকতে পারতেন যদি····তবে, বেশ ভালো করে আলোচনা করতে পারা যেত। স্কুল প্রতিষ্ঠায়, মণীশের তেমন কিছু আগ্রহ ছিল না····এই জায়গাটা তার যেন ভাল লেগে গিয়েছে। তমোনাথবাবুও অনুরোধ করেন, অন্তত আর দুটো দিন থাকার জন্যে। যাই হোক, থাকতে রাজী হয় মণীশ। কেন জানি ইচ্ছা হয়, সুরবালা দেবীর সঙ্গে আর একবার দেখা করতে। শশীবাবুর মেয়েটিকে নিয়ে আর কিছুই ভাবলো না সে। শশীবাবুর মৃত্যু, সুরবালা দেবী···· তার বাবার কথা, এ সবের মধ্যে অজিতাও হারিয়ে গেল। ডাক বাংলোয় ফিরে খাওয়া-দাওয়া করলো। বিকেল বেলা ছোট সহরটা একটু ঘুরে এল। খুবই ছোট সহর,····ইংরাজী হাই স্কুলটাকে চারপাশে ঘিরে····গড়ে উঠেছে।····

পরের দিন বিকেল চারটার সময় তমোনাথবাবুর বাড়ীতেই তার যাওয়ার কথা ছিল। মণীশ বল্ল—তরলা স্মৃতি ভাণ্ডার থেকে এককালীন মোটা টাকা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই····মাসিক ও বার্ষিক ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা আছে····সে টাকা

ছাত্র-ছাত্রীকে দেওয়া হয় না—তাদের নামে প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়। কতকগুলি মেরিটের ওপর, কতকগুলি গার্জেনের অবস্থার ওপর। অনাথ এবং অনুন্নত জাতির কৃশ্চানদের জন্য কিছু। উচ্চ শিক্ষার জন্য—ছেলে-মেয়েদের জন্য মাত্র একটি করে মাসিক দুশো টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রথমে কিছু দিয়ে—তিন হাজার টাকা দেওয়া হয়। এর মধ্যেও কিছু কিছু নিয়ম আছে—সব সে জানে না। ট্রাষ্টা বোর্ড আছে····তার কর্মকর্ত্তা হচ্ছেন সুবোধ হালদার। তার কাছে প্রাথমিক আবেদন করতে হবে। বছরে একবার করে কাগজেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

মিস্টার ও মিসেস বীন উপস্থিত ছিলেন।····ওঁরা চান একটি স্কুল হয় মেয়েদের, তমোনাথ বাবুও তাই চান, উনি বলেন—এককালীন কিছু টাকা আমরা কিছুটা জোগাড় করতে পারবো,—বাৎসরিক কিছু সাহায্য হলে কাজে নামা যায়। একটা স্কুল চালু হলে এখানে ছাত্রী সংখ্যা কম হবে না ····রেল কর্মচারীরা আছেন, স্থানীয় উকিল আছেন কয়েকজন। হাই স্কুলের মাষ্টারদের ফ্যামিলী আছে····স্থানীয় অন্য ব্যবসাদার বাসিন্দা ও আছেন। আজকাল মেয়েদের স্কুলে দিতে সবাই রাজী। তাছাড়া আমরা স্কুল আরম্ভেই এমন একজনের সাহায্য পাব তিনি অতি সামান্য ফিতেই সে ভার নেবেন। তাঁকে হেডমিস্ট্রেস হিসাবে পাওয়া অতি সৌভাগ্যের কথা হবে।

মিসেস বীন····বলেন—আপনি কি ডরোথীর কথা বলছেন।

হ্যাঁ····তারও খুব ইচ্ছা যদি এখানে একটা স্কুল চালু করা যায় তো সে এখানেই থাকবে।

মিষ্টার বীন—পুয়োর শশীবাবু। বড় ভাল লোক ছিলেন। ডরোথী এখানেই থাকতে চায় ?

—যদি এখানে স্কুল হয়।

স্কুলের একজন মহিলা টীচার অমলা দাস বলেন, কিন্তু আমি তো শুনেছি—ওর বিয়ে স্থির হয়ে গিয়েছে—

মিসেস ঘোষ বললেন—না আমি তো. এর আগের সপ্তাহে সুরবালা দিদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলান—উনি বল্লেন শশীবাবু ঠিক করেছিলেন—কিন্তু লতা এখনও মনস্থির করেনি এ বিষয়ে। এখানে ইস্কুল হয় এটা ওর খুবই ইচ্ছা তাহলে ও বিবাহ করবে না এমন কি তার জন্য ও জমি বিক্রি করে কিছু টাকা দিতেও রাজী আছে।—

ডরোথী কথাটা মণীশ বুঝতে পারে নি। কিন্তু মিসেস ঘোষের কথায় বুঝতে পারলো শশীবাবুর মেয়েটির বিয়ে হয়নি আর সে ইস্কুল নিয়েই জীবন কাটাতে চায়।

আরো কিছু কথা হওয়ার পরে মণীশ বল্ল—এককালীন বা বাৎসরিক কিছু সাহায্য করা যায় কিনা সেকথা ষ্ট্রাষ্টিবোর্ডের সঙ্গে কথা না বলে সে কিছু জানাতে পারছে না। সেদিনকার মত মণীশ চলে এল।

অনর্থক আর জামতাড়া বসে সময় নষ্ট করে কি হবে, তাই ভাবলো মণীশ। তবু একবার ইচ্ছা হল শশীবাবুর মেয়েটিকে দেখবে। একটু জোর করেই দেখবে····অতর্কিতে না হয় হাজির হবে ওদের বাড়ীতে। যে মেয়েটিকে দেখে তার মামা অবাক হয়েছিলেন····বাবা তার সঙ্গে বিবাহের কথা দিয়েছিলেন, তাকে একবার দেখবার বাসনা ওর প্রবল হয়ে উঠলো····আর আর····মেয়েটি যখন এখনও বিবাহিতা নয়। আজ বিকেলের দিকে ওদের বাড়ীতে যাব····যেন যাওয়ার আগে একবার দেখা করতে এসেছে, বলতে এসেছে সুরবালা দেবীকে, সকলের সঙ্গে সে দেখা শোনা করেছে····সব কথা বলেছে। পরদিন সকালের দিকে একটু বেড়াতে গেল। এবার গেল উল্টা দিকে····অর্থাৎ চার্চ ছাড়িয়ে····অন্য গ্রামের দিকে। সাইকেলটা নিয়েই রেখেছিল। ভোর ছ'টায় বার হয়ে····গ্রামের দিকে বেড়িয়ে ফিরতে এল চার্চের দিকে। এদিকটা ভারি সুন্দর। একদিকে কতকগুলি ছেলে মাঠে গরু চরাচ্ছে। সাইকেল থেকে নেমে একটু

খানি হাঁটতে ইচ্ছা হল মণীশের, তাকে হাঁটতে দেখে সাঁওতাল ছেলেগুলো সাহেব সাহেব বলে নমস্কার জানালেন।....তারা ভাবলো, চার্চের কোন নতুন সাহেব বুঝি।

এদিকে সুরবালা দেবী লতার কাছে বলে চলেন....এত ভদ্র ছেলে....একবারও কিন্তু বিয়ের কথা তোলেনি, অথচ ও তো এসেছিল এই জন্যেই....এই শোক অবস্থার মধ্যে চুপ করেই ফিরে গেল।

লতা বলে—এটা যে কোন শিক্ষিত লোক হলেই করতো।—এই সময়, বিয়ের কথা মনে করিয়ে দেওয়া বর্বরতা ছাড়া আর কিছু নয়।

তুই এত বিরূপ হচ্ছিস....কিন্তু ওর দিকটা ভাবতো....বিদ্বান, অর্থবান....কোন্ গুণটা ওর নেই? এতদিন বিয়ে করবে না স্থির ছিল কিন্তু যখনি মত বদল করেছে—তখনি সে এখানে এসেছে....তার বাবার দেওয়া কথা রাখতে।....ওর জন্য মেয়ের অভাব ঘটেছিল এটা তো ভাবা যায় না।

লতা বলে....এখনও হবে না....ফিরে গিয়ে অনেক পছন্দসই মেয়ে পাবেন উনি।

কিন্তু আমরা....আমি কি পাব মনের মত ছেলে....

বাবা অজিতবাবুকে পছন্দই করেছিলেন....

সুরবালা দেবী লতার মুখখানা ভাল করে দেখেন। তাহলে, বিয়েতে অমত হবে না ওর, বুঝলেন এটা।

কিন্তু লতা, শশী, যদি আজ বেঁচে থাকতো....আর মণীশ আসতো সে তাকে এমন করে ফিরিয়ে দিত না। শেষ পর্য্যন্ত সে সুধীশের ছেলেটির কথা ভেবেছে। সমাজ কল্যাণের কাজে বিবাহ পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছে জেনে....ছেলেটিকে সে প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করেছে....কবে থেকে ওকেই নিজের আপন বলে জেনেছে।

লতা জানে····চেহারার জন্যে অজিতবাবুকে বড়মার খুব পছন্দ হয়নি।····একটু চুপ করে লতা বলে····কিন্তু আমি পারবো না বড়মা তুমি তো জান····আমারও স্বপ্ন ছিল তাই। কিন্তু সব কিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছে····আমার বাবাকে আমি কোনও সুখ শান্তি দিতে পারিনি, বড়মা—বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে লতা। কাল ২২শে তারিখ ভেবে আরও কাঁদে।

বাইশে তারিখ, শশীবাবুর মৃত্যুর তারিখ। প্রত্যেক বাইশে তারিখে লতা তাঁর সমাধিতে ফুল দিতে যায়। এখান থেকে অনেক দূর। মল্লিক বাবুরা তাদের গাড়ী বা ট্রাক দিয়ে পৌঁছে দেন। গরুর গাড়ী খানা এখনও আছে, তবে মাইনে করা লোক রাখেনি লতা। খুব প্রয়োজন হলে দিন মজুরীর গাড়োয়ান পাওয়া যায়। একদিন গাড়ী জুড়তে হলে তাই বেশ খরচ হয়। মল্লিকবাবুরা অনেক খোঁজখবর রাখেন। এদিকেই তাদের নার্শারি, ইটভাঁটা। আগের দিন সেজকর্ত্তা লতাকে বলেছিলেন····ওঁদের ট্রাক যাবে ইট দিতে, লতাকে পৌঁছে দিতে পারে, আবার ঐ ট্রাকেই ইট দিয়ে আসবার পথে তাকে তুলে আনবে। তাই সকাল বেলাতেই তৈরী থাকে লতা। বাড়ীতে কাজ করে কাহার মেয়ে টুক্‌নী, তাকে সঙ্গে করে যায় লতা। চার্চের খুব কাছেই····একটা কালভার্টের কাছে লতাকে নামিয়ে দিল ড্রাইভার। লতা আর টুকনী হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে। লতার হাতে ফুল, টুকনীর হাতে একটা থলি। লতার চেয়ে কিছু ছোট হবে টুক্‌নী। হাসিখুসী মেয়ে।····ধীরে ধীরে হাঁটছিল লতা।

রাস্তার ধারে একটা গাছের গায়ে সাইকেল রেখে এদিক দিয়ে এগিয়ে আসছিল মণীশ। একটু নীচে····মাঠে ছেলেগুলো সাহেব সাহেব বলছিল। দুদিক থেকেই দুজন আসছিল····একদিক থেকে মণীশ, অন্যদিক থেকে লতারা। একেবারে সাদা পোষাক পরেছে লতা। প্রায় কাছাকাছি হয়ে, দুজনই দুজনকে দেখতে পেল, পরিষ্কার ভাবে।····লতা খুব একটা নজর করেনি। মনটা ভার ছিল তার।

কালকে বড়মার কথাগুলো মনে বড় আন্দোলন এনেছিল, রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, একটু মুখ নীচু করেই চলছিল সে।

মণীশ দেখেছিল, একেবারে স্পষ্ট ভাবেই দেখেছিল। দেখেছিল, যেন এক অবাঙ্গালী, অনেক দিন ভারতবাসী কোন ইউরোপিয়ান মহিলা। শুভ্র পোষাক····হাতে গোলাপ চন্দ্রমল্লিকা, আর রজনী-গন্ধার ভার। আর সেই মুহূর্ত্তেই তার মনে হয়েছিল, ডরোথী মেম সাহেবের কথাটা, সঙ্গে সঙ্গে যেন চিনে নিতে পেরেছিল····এই সেই মেয়েটি। ইনিই শশীবাবুর মেয়ে। রাস্তায় কোন অপরিচিত মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকা অত্যন্ত অসভ্যতা····তবু মণীশ কয়েকটা মুহূর্ত্ত তাকিয়ে ছিল।

ওদিকের মাঠ থেকে সাঁওতাল ছেলেগুলো····ডরোথী মেম্ ডরোথী মেম্ সাহেব বলে চীৎকার করতে করতে ছুটে একেবারে রাস্তা পর্য্যন্ত এল।····মনে হল একে তারা চেনে। বড় আপনার করে চেনে।

ডরোথী মেম্ কথাটা কানে যেতে····মৃদু পা ফেলে এগিয়ে চলা···· মণীশ একটু থেমে দাঁড়াল।

মেয়েটি ছেলেগুলির নিকে তাকিয়ে হাসলো। হাতের ইশারায় তাদের চলে যেতে বল্ল—ওরা দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে নমস্কার জানিয়ে আবার ডরোথী মেম্ বলতে···বলতে মাঠের মাঝে ছুটে গেল। মণীশ সেখানে দাঁড়িয়ে, এগিয়ে যাওয়া মেয়েটিকে যতক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় স্থির দৃষ্টি দিয়ে দেখলো। যখন মেয়েটিকে আর দেখতে পাওয়া গেল না, তখন নীরব নিথর এক মন নিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে কালভার্টের ওপর বেদীতে বসলো।····কিছু ভাবেনি। কিছু ভাবতে পারেনি। ভাবনা শূন্য মন নিয়ে এ পৃথিবী ছেড়ে এক শূন্য রাজ্যে চলে গিয়েছিল।····অনেকক্ষণ পরে তার মনে হল সাইকেলটার কথা। উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে জোর করে সাড়া দিয়ে চাঙ্গা করে নিল। তারপর সাইকেলের জন্য ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। সাইকেলটি ঠিক স্থানেই ছিল। সাঁওতাল ছেলেগুলো গরু ছেড়ে দিয়ে····

একজায়গায় গোল হয়ে বসেছে। আর বারে বারেই পেছনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে যেন কার অপেক্ষায় রয়েছে, এবার আর সাহেব সাহেব চেঁচালো না····যেন, চেনা লোক দেখছে, তেমনি ভাবে শুধু হাসতে লাগলো। মণীশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছে, আবার চীৎকার শুনলো···· হুই যে····ডরোথী মেম্····ডরোথী মেম্····বলে উল্লাস ধ্বনি। নিজের চলাকে খুব আস্তে····প্রায় থামা-ই করলো মণীশ। দূরত্ব খুব বেশী নয়····ছেলের দল থেকে।····একটু পরেই দূর থেকে ওদের ডরোথী মেম্‌কে দেখা গেল।····আর যখন তাকে একেবারে কাছের মধ্যে গেল, তখন মাঠ থেকে ছুটে রাস্তায় উঠে এসে তার চার পাশে দাঁড়ালো। কালো কালো চেহারার একটুকরো করে ন্যাকড়া পরা ছেলের দল। আট নয় দশ বারো বছরের ছেলের দল····একমুখ সরল হাসি।····

মেয়েটি একটা থলি থেকে কিছু বার করে প্রত্যেককে দিল। ফল বা মিষ্টি হবে····ওদের লাফানো, ও উল্লাসের ব্যস্ততার মধ্যে মণীশ তা ঠিক করতে পারলো না।—তারপর মেয়েটি ওই সাঁওতাল ছেলেদের ····কারও মাথায় চুল নেড়ে দিয়ে, কারও খোলা পিঠে হাত রেখে···· একটু আদর করেই শাসন করবার ছলে····হাত দিয়ে মাঠের দিকে নির্দেশ দিতেই ছেলের দল আবার রাস্তা থেকে মাঠের নামে। আনন্দে হাতে করা জিনিসে কামড় দিতে দিতে। ওদের দিকে হাসতে হাসতে মাথা নাড়া দিতে দিতে এগিয়ে আসে মেয়েটি।

এগিয়ে যেতে হয় মণীশকেও। কালভার্ট ছাড়িয়ে—একটু এগিয়ে যায় মণীশ। পাছে মেয়েটি ভাবে····তাকে দেখবার জন্যেই মণীশ এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছে।····একটু দূরেই একখানা বড় ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে দেখলো। রাস্তা খুব চওড়া নয়····মণীশ সাইকেল নিয়ে ট্রাকের পেছনেই থাকবে ভেবে এগিয়ে এল। তার ধারণা হয়ে ছিল····মেয়েটি বোধ হয় ট্রাকেই যাবে। কারণ ড্রাইভার নেমে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিল।····ক্রমে ক্রমে ওরা দুজন এগিয়ে এল। ওদের দেখে, ড্রাইভার উঠে দাঁড়াল····সম্ভ্রম ভরে দরজা খুলে ধরে থাকল।····

এইবার সাইকেল সহ মণীশকে দেখে একবার তাকাল লতা। তারপর ট্রাকে উঠে বসবার জন্য এগিয়ে গেল। ড্রাইভার প্রথমে টুকনীকে তার পরে লতাকে উঠতে সাহায্য করে····ওদিকে গিয়ে নিজের সিটে ট্রাকটা ছেড়ে দিল। লতা তখনও মুখ ফিরিয়ে মণীশকে দেখছিল।

তখনও কিছু ভাবেনি মণীশ শুধু বিষাদ শূন্য মন নিয়ে হাঁটছিল। তখন ও সাইকেলে উঠে বসে····গতিকে তীব্র করে ফিরে যাওয়ার শক্তিই যেন ছিল না তার। সাইকেল নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটবার পরে রোদের তাত যখন দেহে আগুন ধরিয়ে দিল মাথা ঝিনঝিন করে উঠলো তখন যেন সচেতন হল মণীশ। সাইকেলে উঠে ডাকবাংলোর দিকে এগিয়ে গেল।····ডাক বাংলোয় পৌঁছবার পরেও চুপ করে বসে রইল মণীশ। ছোকরাটা নিজেই চা করে এনে দিল, বাবু—চা! কোন কথা না বলে চায়ের পেয়ালা তুলে নিল। এক চুমুক খাবার পরে মনে হল····তার মুখ একেবারেই শুকিয়ে গিয়েছিল। চা খেয়ে ঘরের মধ্যেই একটু ঘোরা ফেরা করলো। আজ রাত্রেই ফিরে যাবে। সুরবালা দেবীর সঙ্গে দেখা করে কি হবে আর! সুরবালা দেবীর কথাতে···আবার শশীবাবুর মেয়েটির কথা মনে হল।

মেয়েটি স্কুল নিয়ে থাকতে চায়····এখানেই থাকতে চায়, তাই তো চাইবে····না হলে একা-একা কোথায় যাবে? একা—একা, ওঃ আতঙ্কিত হয় মণীশ। সত্যিই বড় কষ্ট একা থাকার। ওই মেয়েটি এত কষ্ট পাবে! এতক্ষণে যেন মনে পড়ে মেয়েটির মুখখানা। এত ক্ষণে যেন মনেকরে, কি দেখেছিল সেই মুখখানাতে,—বলতে পারবে না? সমস্ত এঞ্জেলদের মুখ, ম্যাডোনা মেরীর মুখের পবিত্রতা ভরা, গম্ভীর বিষাদ করুণা আর হাসি। ওই সরল ছেলের দলের সঙ্গে, মণীশের সারা দেহে কাঁটা দিয়ে উঠলো। মেয়েটিকে নিয়ে ওই ছেলের দল যেন এক স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। স্বর্গরাজ্যের সেই দেবী····সেই অমলিন প্রতিমা, সেই ছিল, তার বাবার মনোনীতা····তাঁর প্রতিশ্রুতি দেওয়া পুত্রবধূ। অর্থাৎ মণীশের বউ?····না স্ত্রী····। মাথাটার মধ্যে

দপদপ করে ওঠে। স্বর্গরাজ্য হারিয়ে যাওয়ার পর, কোথায় যাবে মণীশ? কলকাতায় যেতে হবে, একটা দামী স্যুট অর্ডার দেওয়া আছে। না, ওসব থাক, আর দরকার নেই। কোথাও যাবার নেই তার। কলকাতা জোড়হাট নাহারকাটিয়া····কোথাও ফিরে যাবার কথা ভাবতে পারলো না মণীশ। কোথাও যাবার নেই। শুধু সাইকেল ধরে হাঁটতে হাঁটতে দীর্ঘ পথ ধরে যেন অনন্তকাল হাঁটতে হবে শুধু।

লতা ফিরে এল। রাস্তার ধারে একজন অপরিচিতকে দেখে কিছুই ভাবেনি লতা। চেনা জায়গায় কোন অচেনা লোক দেখলে···· যেমন সাধারণ ভাবে দেখে তেমনই দেখেছিল সে। অমন তো কতই আসেন মাঝে মাঝে সরকারী বড় কর্মচারীদের মধ্যে থেকে।····অমন সাইকেল নিয়ে টহল দেন তাঁরা। বাবার সমাধিতে ফুল দিয়ে ঃ সাঁওতাল ছেলের দলকে ফল দিয়ে মনটা বড় ভাল ছিল লতার। লতার মনটা একটু ভাল দেখে, সুরবালা দেবীরও ভাল লাগে। লতাকে একটু খাবার দিয়ে বলেন····

মানুষের মন····কেন যে এমন····কেবলই মনে হচ্ছে, সুধীশের ছেলেটির কথা। বাবার মত হয়নি····কেবল কটা-কটা চুল ছাড়া, আর কিছু পায়নি ছেলেটা। ওর মামার বাড়ীর মত হয়েছে। ওর মা যে কি সুন্দর ছিল। ওর মায়ের কথাটায়····আবার সুধীশের কথাটা মনে আসে, বলেন—ছেলেটির স্বভাব আচরণও ওর বাবার মত। আর কোন দিনই দেখা হবে না। কি জানি চলেই, গিয়েছে হয়তো। পরের দিনই যাবে বলেছিল। হয়তো বললেন, কেন-না সুরবালা দেবী মনে করেছিলেন যাওয়ার আগে ছেলেটি হয়তো আবার আসবে····যা জানবার জন্যে এতদিন বাদে এতদূরে ছুটে এসেছে····তা না জেনেই ফিরে যাবে? প্রথম দিন বলতে সঙ্কোচ হয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু কি বলবেন····যদি সত্যিই আসে আবার····লতার অবস্থা বলে···· কিছু দিন সময় চেয়ে নেবেন?

তাই বলেন—লতা, ছেলেটি যদি আবার আসে?

আমার আর কিছু বলবার নেই বড়মা।

কিন্তু সে জানে তুমি এখানে আছ।—তা ছাড়া—এ বাড়ীতে—শশীর প্রতিনিধি তুমিই। কাজেই এলে তার সঙ্গে দেখা করা কথা বলা তোমার ভদ্রতারই প্রমাণ দেবে।—দেখা করে কথা বলা মানেই বিয়ে করা নয়। আর মনে হয় না সেকথা তোমার কাছে তুলবে। কিন্তু আমি চাই না সে যেন এ ধারণা নিয়ে না যায়, যে শশীবাবুর মেয়েটি তার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করেনি। একটি বয়স্থা শিক্ষিতা মেয়ে এটা ইচ্ছা করেই করেছে ভাববে। তোমার না দেখা করাটা—তার মনে তোমার অভদ্রতা মনে করা কি অন্যায় হবে?

নিজের মনে বড়মার এ যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারে না। একটু হেসে বলে—তুমিও তো কথাটা ভাবছো—যখন এসব ধারণা নিয়েই মিস্টার সরকার ফিরে গেলেন।

তা ঠিক, আমিও সব কিছুই ভাবছি ছেলেটি ফিরে যাবার পরে। বয়স হয়ে আর শশী যাবার পরে, আমারও বুদ্ধি বিকল হয়েছে। না হলে অমন ছেলেটিকে একেবারে শুক্‌নো মুখে ফিরিয়ে দিই। সেদিন, আমারও মন কেমন কঠোর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু চলে যাবার পর ওর কথা যতই ভেবেছি ততই····বড় খারাপ মনে হয়েছে নিজের ব্যবহার। সেও তো একটা বড় আশা নিয়েই ছুটে এসেছিল। শশী নেই এটা জানা ছিল না তার। বোঝ, লতা তুইও একটু ভেবে দেখ ওর কথাটা।

এখন তো ভেবে কোন ফল নেই বড়মা····মন খারাপ করো না। আমরাও হতাশ হয়েছি····তিনিও হতাশ হলেন····এই যা।

এটা যেন একটা প্রতিশোধের মত হল না?····লতা তুই যদি ওকে দেখতিস—তুই ওকে এমনভাবে ফিরিয়ে দিতে পারতিস না।

তা হলে তো দেখা না হয়ে ভালই হয়েছে।

একবার কি রাজেনকে দিয়ে খবর নেব—ও চলে গিয়েছে কিনা?

না—বড়মা।

ডেকে এনে····ফিরিয়ে দেওয়া আরো খারাপ হবে।

সুরবালা দেবী আর কিছু বলেন না—মনে মনে ভাবেন দেখলে তাকে বিমুখ করতে তুমি পারবে না। তিনি জানেন মণীশ সামনে এসে দাঁড়ালে লতা অবার তার স্বপ্নের জগতে ফিরে যাবে····এতদিনের ভাবা ধারণার চেয়েও সুন্দর দীপ্তিমান ছেলেটিকে দেখলে····কখনও বিমুখ করতে পারবে না লতা। কিন্তু ছেলেটি হয়তো ফিরেই গিয়েছে।

এলোমেলো চিন্তা সুরবালা দেবীকে ঘিরে থাকে।

চান করে খাওয়ার শেষে····অল্প একটু ঘুম দিয়ে উঠলো মণীশ। ঘুমের পর একটু সতেজ মনে····আবার একটা ভাবনা তার মনে এল। মেয়েটি জামতাড়ায় স্কুল হলে···· এখানেই থাকতে চায়। এখানে থাকতে পেলেই সুখী হবে মেয়েটি। কিন্তু স্কুল····তরলা স্মৃতি ভাণ্ডার থেকে এমন টাকা দেওয়া যাবে বলে মনে হয় না····কিন্তু তার তো টাকা আছে····সেই টাকা দেওয়া যায় না····সেই টাকা দিয়েই স্কুল করে দেবে মণীশ। মেয়েটিকে সুখী করতে পারলেই যেন মণীশ ধন্য হয়····মেয়েটিকে জামতাড়ায় রাখতে পারলে মণীশ নিশ্চিন্ত হয় যেন। বিবাহ করবে না মেয়েটি।····কেন?—কে জানে স্কুলই কি তার জীবনের ব্রত।····তবু ওই মেয়েটি যা চায় তাই করে দিতে পারলে মণীশ যেন শান্তি পায়। স্কুলের ব্যবস্থাই করে দেবে। প্রত্যেক বছরে বিশ্বাস ফার্মেসীর একটা আয় তার নামে জমা হয়। যদিও সে সঠিক জানে না সেটা কত—তবুও কিছু তো বটেই····আর সুবোধ হালদার তার হিসাবপত্র সব কিছুই তাকে পাঠিয়ে দেন····তারপর মামার দেওয়া টাকাটা এ পর্য্যন্ত আছেই····সবই দিয়ে দেবে····তার জন্য। একলা সে, যা মাইনে পায় তাই যথেষ্ট। নিজেকে একলাই ভাবলো সে।····অজিতা? অজিতার কথা তার মনের জগতের কাছেও নেই আর।····চার্চের পথে দেখা মুখখানা কোন যাদুমন্ত্রে ভুলিয়ে দিয়েছে যেন অজিতাকে। শশীবাবুর বাড়ীতে যাবার পথে যেন তার কথা আর মনে হয়নি মণীশের।

আজই চলে যাবার আগে সুরবালা দেবীর সঙ্গে দেখা করে বলে

যাবে····সে স্কুলের জন্য টাকা দেবে····সেটা কত তা ঠিক এখনও বলতে পারছে না····তবে কুড়ি-পঁচিশ হাজারের কম নয় উনি। যেন তমোনাথবাবুদের জানিয়ে দেন, ও ফিরেই জানাবে। সুরবালা দেবী নিশ্চয় খুসী হবেন····আর ওই মেয়েটি? সে কি জানবে····কেন মণীশ টাকা দিচ্ছে?····

টাকা দেওয়া ছাড়া আর কিছু পারবে না মণীশ। বিশেষ করে ওই মেয়েটির কাছে····বিয়ের কথা? নিজের চাওয়ার দাবী? না, তা সে কিছুতেই পারবে না। তার কাছে কিছুই চাইতে পারবে না মণীশ, ও মুখের কাছে কিছু চাওয়া যায় না; যদি কিছু দেয়, স্বেচ্ছায় দেয়···· বরদানের মত দেয় তাই শুধু নেওয়া যায়।—সেই প্রশান্ত সুন্দর মুখখানি····সকাল বেলার দেখা মুখখানি নিজের মনে এঁকে নিয়েছে সে।

একটু পরে উঠে····যাওয়ার জন্য তৈরী হয় সে····এখান থেকে ষ্টেশনে জিনিস রেখে বা ডাক্তারের কোয়ার্টারে রেখে একবার সুরবালা দেবীর ওখানে হয়ে আজই ইলেভেন্ ডাউনটা ধরে চলে যাওয়া, এই তার চার্ট। এই ছোকরা চাকরটাকে কিছু দিলেই তার সুটকেশ হোল্ডঅল পৌঁছে দেবে।—চটপট তৈরী হল সে, সাড়ে তিনটের মধ্যেই সরকারি হাসপাতালে চলে এল। ওখানকার ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে গেল সুরবালা দেবীর সঙ্গে।····নিজের ভদ্রতা বোধে আগে নামলো সরকার সাহেবের বাড়ী। বৃদ্ধ সরকার মশায় লোক ভাল। তাকে জানালো আজি সে চলে যাচ্ছে।

এখানকার কাজ শেষ হল?

হ্যাঁ হল—আপনাদের বীন সাহেব ও তাঁর মেম সাহেব খুবই ভাল আলাপ হল বুঝি, বেশ বেশ। তোমরাই সমাজের উজ্জ্বল রত্ন। ····তা ও বাড়ীতে যাবে বুঝি····তা, এবার তো একাই যেতে পারবে।

হ্যাঁ তা পারবো····আপনার সঙ্গেও দেখা করে গেলাম।

এইটুকুই তো আমরা, বুড়োরা আশা করি। যাও যাও, ওখানে

দেখা করে এস।....বড় শোক পেলেন, সুরোদিদি আর শশীর মেয়েটি, মেয়ে তো নয় সেও আমাদের এক রত্ন।

মণীশ বার হয়ে এল, সরকার বাড়ী থেকে। যাক, মণীশের ভাগ্য ভাল, সুরবালা দেবী বাইরের বাগানেই ছিলেন, অনেক দিনের না দেখার ফলে আগাছায় বন হয়ে উঠেছে....এবার পরিষ্কার করাতে হবে....এই সব দেখছিলেন, দুপুরে শেষের বিকেল।....লতা বাড়ীর মধ্যেই ছিল।

চোখ তুলেই যেন গেটের সামনেই দেখলেন মণীশকে। আনন্দের হাসিতে তাঁর মুখ ভরে উঠলো। এস-এস বলে এগিয়ে গেলেন। তিনি ঠিক ভেবেছিলেন—ছেলেটি আবার আসবে।

মণীশ গেট ঠেলে ভেতরে এল। নত হয়ে পায়ের ধূলো নিল। তার মুখে হাত ঠেকিয়ে নিজের মুখে রাখলেন সুরবালা দেবী। তার পিঠের ওপর হাত দিয়ে ঢাকা বারান্দায় নিয়ে এসে বসালেন তিনি। ....বস বাবা, আমি আসছি, বলে ভেতরে এলেন তিনি।....আনন্দে গলা ধরে এসেছে তার। কাঁপা কাঁপা গলায় লতা—লতা—বলে ডাক দিলেন।

লতা তখন ভেতরে তার ঘরে ঘুমাচ্ছিল।

লতা—মণীশ এসেছে।....

আমি কি করবো?

অন্তত দেখা করবে....কথা বলবে। তুমি তৈরী হয়ে নাও।

টুক্‌নীকে বল চায়ের জল চড়াতে, আজ আর আমি ওকে অমনি ফেরাতে পারবো না। লতার কাছে এসে তাকে একটু আদর করে বল্লেন....শশী কোন লোককে, কখনও শুধু যেতে দিত না....। লতা তার সম্মানটা, তোমাকেই রাখতে হবে। আমিও তোমাকে জোর করবো না—বড় হয়েছো, লেখা পড়া শিখেছে।....কথা বলতে দোষ নেই এটা তো ঠিক।

সুরবালা দেবী আবার মণীশের কাছে এলেন।

কথা আরম্ভ করলেন।....এখানকার কাজ সারা হল ?

হ্যাঁ হল। মিষ্টার ঘোষ, মিসেস দাস, ওদের সকলের সঙ্গেই দেখা হল....কথা হল। মণীশ ভাবছে....এবার স্কুলের কথাটা তুলবে।

সুরবালা দেবী আরম্ভ করলেন অন্য কথা।....মণীশ,....তুমি যখন এখানে এসেছিলে, তখন একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিলে নিশ্চয়ই।

কথা শুনেই মণীশ বুঝতে পারে উনি কোন্ কথা বলছেন।....একটু চুপ করে থেকে বলে—তা এসেছিলাম।

তা তো হবেই....সে কথা তো আজ নয়, সে বহুদিন আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে....তুমি সমাজ কল্যাণের কাজেই থাকবে শুনেও শশী অপেক্ষা করেছে দিনের পর দিন....যদি তোমার মত বদল হয় যদি সুধীশের ইচ্ছা সে পূর্ণ করতে পারে।....

মণীশ ভাবতে লাগলো....এতদিন কোন সমাজ কল্যাণ সে করেছে, মিথ্যা এক কারণ ধরে বিয়ে না করার সংকল্প নিয়ে, কেবল নিজের সুসময় নয়, এদের অনেক ক্ষতি করেছে সে—হয়তো অপেক্ষা করতে করতেই বিবাহ বিমুখী মন হয়েছে মেয়েটির। পার হওয়া সময়ের জন্য আজ আক্ষেপ হয় মণীশের।

চা আর কিছু বিস্কুট নিয়ে এ ঘরে এল টুকনী। মণীশকে চা ঢেলে দিলেন সুরবালা দেবী। নিজেও নিলেন।

সুরবালা দেবী ঠিকই করেছিলেন। যদি মণীশ আসে,—তবে সে হয়তো লজ্জাবশত সে কথা তুলতে পারবে না—তাই নিজেই তুলবেন। মণীশ চা খাচ্ছিল। সুরবালা দেবী দেখছিলেন....মণীশকে দেখছিলেন, আর শশীবাবুর জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠছিল—একে দেখে যেতে পারলো না শশী....এমন ছেলেকে—লতার পাশে.... একদণ্ডের জন্যে দেখলেও তার কত শান্তি হত।

চা খাওয়ার পরে স্কুলের কথাটা তুলবে ভাবছে, আবার অন্য কথা বলেন সুরবালা দেবী।

মণীশ....অল্প দিন হল, শশী আমাদের ছেড়ে গিয়েছে. বড় হঠাৎ

চলে গিয়েছে—একটা কথাও বলতে পারেনি····এই আঘাতটা····ওর মেয়েকে····আমাদের পাথর করে দিয়েছে। জগতের নিয়মে খেতে হয়····চলতে হয়····কিন্তু····আনন্দের ব্যাপারে সাড়া দেবার মত মন এখনও লতার হয়নি ওকে, তোমার সময় দিতে হবে····

সময়, ভাবে মণীশ····জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সময় নিয়ে অপেক্ষা করতে পারে মণীশ।

তবে····তোমাদের দেখা শোনা হয়ে থাকা দরকার। তাছাড়া···· এখন তোমরা বড়····যদি মনে কর পরস্পরের মনোভাবটাও জেনে নিতে পার····দরকারও সেটা জানার। কতবার শশী বলেছিল—তুমি তখন কত ছোট····তোমাকে এখানে পাঠাতে স্কুলের ছুটিতে এমন কি মাট্রিক পরীক্ষার পর। কিন্তু কি যে তোমার মামার মত না। তাই এত কালের মধ্যে তোমাদের চেনা জানা হল না।

মণীশ উঠবার জন্য ব্যস্ত হল। থাক এখন স্কুল, লিখে জানাবো ভাবলো। সুরবালা দেবী বললেন—তোমাকে আজ এমনি যেতে দেব না, একটু কিছু খেয়ে যেতে হবে····বস মণীশ।

উনি ভেতরে গেলেন····মণীশ ভাবতে লাগলো, ওই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে হবে····কথা বলতে হবে····কি কথা বলবে সে? না—না, কোন কথা বলতে সে পারবে না····কিন্তু দেখা? হ্যাঁ দেখবে। আরও একবার দেখবে। সে····দেখবে·····।

এর মধ্যে টুকনী লতা মিলে লুচি, মোহনভোগ করেছিল, সকালের করা তরকারি ছিল। বাগানের কলা····একটু ক্ষীর ছিল ঘরে। সব দিয়ে সাজিয়ে নিলেন সুরবালা দেবী। লতাকে বল্লেন, তুমি তৈরী হয়ে নাও····

আমি তৈরী বড়মা।

না, কাপড়টা বদলে নাও, চুলটা একটু আঁচড়ে নাও। নিজেদের ছোট করবার দরকার নেই। বাইরের একজন অপরিচিত লোকের সামনে যেতে হলে যেটুকু করতে হয়····সেটুকুই কর। উনি চলে গেলেন।

মণীশকে খেতে দিলেন। কোন কথা না বলে মণীশ খেতে আরম্ভ আরম্ভ করলো। এমন আদর করে যত্ন করে খেতে কেউ কোন দিন তাকে দেয়নি। সে খাচ্ছে, সামনে সুরবালা দেবী বসে আছেন, বড় ভাল লাগছিল তার।....

খাওয়ার শেষ হল....হাত মুখ ধুয়ে মণীশ বসলো। কার্ত্তিকের শেষ বেলা এখন ছোট....অন্ধকার একটু একটু জমে আসছে। সুরবালা দেবী আবার ভেতরে গেলেন।

এই বার—এই বার মেয়েটি আসবে। মণীশ রুমাল বার করে মুখখানা আর একবার মুছে নিল....কেমন ঘাম জমে উঠছে যেন। কিন্তু সুরবালা দেবী একলাই এলেন।

বল্লেন—চল মণীশ....আমার ভাইঝির সঙ্গে দেখা করবে—আলাপ হোক তোমাদের....

উনি মণীশকে নিয়ে....ঢাকা বারান্দার—শেষ দিকে গেলেন, একটা পরদা টানা—পরদা সরিয়ে মণীশকে নিয়ে ঢুকলেন। ওদিকের জানলায় মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে।

লতা। মুখ ফেরানো লতা।....এই যে, আমার ভাই শশীনাথের মেয়ে—ওর নাম....ডরোথী লতিকা রায়। লতা, তুমি তো জান, এ মণীশ—মণীশ সরকার—নমস্কার কর লতা।

লতা দুহাত তুলে নমস্কার করলো....

মণীশ সরকার নমস্কার করতেও পারছে না যেন....কোনমতে হাত জড়ো করলো।

লতা ঠিক মনে করতে পারলো না....একেই সকালে দেখেছিল কিনা। লতা তাই দেখতে লাগলো।

মণীশ একটু অবনত মাথায় রইল।

এক পাশে—দুখামা বেন্তের চেয়ার রাখা আছে।....অন্য পাশে একটা টেবিলে একটা ফটো ফুলের মালা দেওয়া, মণীশ বুঝতে পারলো সেটা কার। সুরবালা দেবী তবু বললেন—এই যে, আমার ভায়ের

ফটো।—বস তোমরা—কথা বল।....আমি আসছি—উনি বার হয়ে গেলেন।

বসতে বললেন—তবু, বসা হল না, কেউ কাউকে বসতে বললো না—দুজনেই দাঁড়িয়ে....মৌন। একজন দেখছে একজন একটু নত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।....মুহূর্ত্ত যেন ঘণ্টা হয়ে যাচ্ছে।

লতা দেখছে, তার স্বপ্নের ডাক্তার, তার এতকালের মনের ডাক্তার....সেই ফটোর পাঁচ বছরের ছেলেটা, বড় হয়ে এত সুন্দর হয়েছে—এত সুন্দর হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়েছে—বড়মা ঠিক বলেছেন....ওকে দেখলে তুই ফিরিয়ে দিতে পারবিনে....ওকে ফেরানো যায় না—ওকে ফেরানো যাবে না....লতা ভাবছে, লতা দেখছে।

কিন্তু মণীশ, পুরুষ, মণীশ পারে না—এমন নির্বাক হয়ে একটি মেয়ের সামনে এমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে। নিজেকে সামলে নিয়ে বিনম্র গলায় মণীশ....কথা বলে ওঠে—

লতার কাছে দাঁড়ানোর সম্মানসূচক দূরত্ব রেখে সে বলে—"মিস্ রায়—আপনার বর্ত্তমান ইচ্ছার কথা আমি শুনেছি। আপনি যদি কোনদিন মত পরিবর্ত্তন করেন জানাবেন....আমি অপেক্ষা করে থাকবো।"

লতা চুপ....কথা বলতে পারছে না লতা। আটকে যাচ্ছে যেন।....

মণীশ কি করবে....নমস্কার করে চলে যাবে? তাই বোধহয় ভাল। চলে যেতে গিয়ে মনে হল....সে যেন কিছু বলতে চায়। দাঁড়িয়ে গেল মণীশ।

লতার কি হল....ঠোঁট দুটো কাঁপছে। এতদিনের বলা, সব চেয়ে প্রিয় কথাটা উচ্চারণ করতে পারছে না কেন, ডাক্তার,....ডাক্তার কথাটা মুখের মধ্যেই....আটকে যাচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তার কথাটা বাদ দিতে হল....মণীশের চোখের ওপর চোখ রেখে....আস্তে অথচ স্পষ্ট গলায়....লতা....বল্ল—আমি মত বদল করেছি।

এ করুণায় ধন্য হয়ে গেল মণীশ....অপলক দৃষ্টি দিয়ে একবার দেখলো—উদার মহিমা ভরা মুখখানি যেন।

তারপর এক নাটকীয় কাণ্ড করে বসলো।....এত কালের গল্পে পড়া—সিনেমায় দেখা....সব নাটকীয় ভঙ্গীমা ঠিক তারই মত, যেন কোন রাণীর সামনেই কোন আশ্রিত দেবীর সামনে কোন ভক্তের মত....একটু সরে গিয়ে নতজানু হয়ে বাঁ হাত দিয়ে ধরা—ডান হাত-খানা লতার সামনে মেলে ধরলো।

লতা যেন সেই মুহূর্ত্তে তার স্বপ্নের ডাক্তারকে ফিরে পেল।....ধীরে ধীরে নিজের হাতখানা....তার ডাক্তারের হাতের ওপর রাখলো।....

লেখা চিঠি পেল, বড়মার কাছ থেকে—এতদিন পরে লতার ডাক্তার এসেছে। মণাশ প্রস্তাব করলে লতা তা গ্রহণ করেছে। শশীর আত্মা শান্তি পাবে।

আনন্দে পুরো চিঠিটাও পড়তে পারেনি লেখা, ছুটে এসেছে। বেলা তখন সাড়ে আটটা! বাজার থেকে ফিরছি।....

লতার ডাক্তার এসেছে....লতা তাকে গ্রহণ করেছে।

ডাক্তার এসেছে....আমি বোধহয় কথাটা উচ্চারণ করতে পারিনি ঠিকমত....বুঝতে চেষ্টা করছিলাম।

বড়মার চিঠি এসেছে—দেখ, দেখ—বলতে বলতে সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে লেখা তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমার মুখে কি দেখেছিল লেখা? আকাশ ঢেকে যাওয়া মেঘ? না, আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিনের বেদনা?....জানি না। লেখা আমার দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকলো।....ক্রমশ ওর মুখে এক বিষণ্ণ সমবেদনার ছায়া ভেসে উঠলো। আমি উঠে এসে....লেখার মুখখানা নিজের দুহাত দিয়ে তুলে ধরলাম।—আসন্ন শীতের জড়তা কাটিয়ে....সকালের আলোটা....তখন সবে প্রখর হচ্ছে।

———

সম্ভবামি ?

শ্রীজিতেশ চন্দ্র গুপ্ত

কোথায় সত্য মুক্তি কোথায়—কোথা ন্যায় কোথা রয়েছে ধর্ম্ম।
মানুষ চলেছে আপন স্বার্থে—করিছে আপন স্বার্থে কর্ম্ম ॥
কোথা মহত্ত্ব—পরহিতার্থ—ত্যাগ ও নিষ্ঠা সরগ সুধা।
লক্ষ-প্রাণের রুধিরে চাহিছে—আপন প্রাণের মিটাতে ক্ষুধা ॥
ভোগের নেশায় স্বার্থে অন্ধ—অপরের কথা কে ভাবে আর।
নিজের ভোগের অঙ্ক বাড়াতে—সৃজিছে ধ্বংস অত্যাচার ॥
দানব আজিকে জগত ছেয়েছে—বিবেক স্বর্গ করেছে জয়।
ভীত সাধুজন স্মরিছে তোমারে—ভাবে কবে হবে অভ্যুদয় ॥
এখনও কি তব হয়নি সময়—সন্তান তব মরিছে ভুগে।
তুমি না বলেছ ভক্তেরে তব—"সম্ভবামি যুগে যুগে" ॥

যুগ হতে কোন যুগান্তরেতে—বর্ত্তমানের সর্ব্বনাশা।
পৃথ্বীরে লয়ে হাসিছে খেলিছে—মিটাতে আপন রুধির তৃষা ॥
মধ্য গগন সূর্য্য দীপ্ত—জগত তবুও অন্ধকার।
মৃত্যুরে করে পাথেয় মানব—সহিতেছে শত অত্যাচার ॥
দুঃশাসনের লাঞ্ছনা সয়ে—দ্রৌপদী তবুও নিরুত্তর।
ভীমসেন আজ নত মস্তকে—কোথা গাণ্ডিবী ধনুর্দ্ধর ॥
শকুনির আজ কূটচালে দেখো—সব রাজনীতি কলুষময়।
স্নেহ-মায়া ছাড়ি ভায়ের বক্ষে—হিংসা রয়েছে অকুতোভয়ে ॥
এখনও কি তব হয়নি সময়—আসিতে মুছাতে সাধুর গ্লানি।
তুমি না বলেছ দুষ্কৃতি নাশিতে—যুগ হতে যুগে "সম্ভবামি" ॥

সপ্ত শুভ্র অশ্ব-চালিত—কোথা রথ কোথা সারথী তার।
কোথায় পার্থ গাণ্ডিব তব—নাশিতে শতেক অত্যাচার ॥
"মা-ভৈঃ—মা-ভৈঃ" কে বলিবে আজ—কে আজ বাজাবে পাঞ্চজন্য।
কার অমৃতবাণী শুনে আজ—জগত আপনি মানিবে ধন্য ॥
চক্রব্যূহেরনাগ-পাশ আজি—কোন্ অভি-শিশু করিবে ছেদ।
দানব-কারারে ভাঙিয়া শোষিতে—মুক্তিবে কোন ধনুর্বেদ ॥
"ক্লৈব্যং মাস্ম-গম" বলি আজ—কার উদ্ধত কণ্ঠ কবে।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে যত ক্লীবতা—তা' হতে মুক্তি পেতেই হবে ॥
কত আশা লয়ে চারিদিকে দেখি—বারেক শুনিতে পাব না নাকি।
বলিবে আবার "যুগে যুগে আমি—এসেছি আবার" জগতে ডাকি ॥

নিয়মিত পড়ুন

জীবনে সুখ-শান্তি আনন্দের পথ দেখাচ্ছে

সুখীমন

মাসিকপত্র

৫ম বর্ষ চলছে। প্রতিসংখ্যা ৫০ পয়সা মাত্র।

সম্পাদক ঃ ডঃ অসীম বর্ধন

*

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্

[পরিবেশক ঃ বুক সারভিস প্রাইভেট লিমিটেড]

তাদের রঙ সবুজ···তাদের আটটা শুঁড়···তারা পৃথিবীতে এসেছিল গ্রহ দখল করতে····যুদ্ধ তারা করল না···অস্ত্রপ্রয়োগ করল না···বেছে নিল পৃথিবীর বরফ স্তূপকে···

পৃথিবীবাসী তোমরা শোনো

ভর্তৃহরি মিত্র

রাত বারোটায় যারা রেডিও শুনতে শুনতে সুইচ বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল তারা হঠাৎ ঐ অমানুষিক শব্দ শুনে চমকে উঠল।

তারা মাঝরাতে রেডিওর ঐ ভয়ংকর ডাক শুনে লাফিয়ে উঠল বিছানা থেকে। যেন একটা ভয়ংকর সর্বনাশ ঘটতে চলেছে—যেন সবাই নাম-না-জানা একটা অদ্ভুত বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। স্ত্রী তাকায় স্বামীর দিকে, ছেলে তাকায় মায়ের দিকে। ভয়ে আঁৎকে ওঠে সকলেই। দেশের প্রধানমন্ত্রী কি মারা গেছেন? বিদেশীরা কি আক্রমণ করেছে দেশকে? রাশি রাশি কামান ট্যাঙ্ক মিগ বিমান কি ছুটে আসছে?

বাইরে এল সবাই। কিন্তু রেডিওর ভয়ংকর শব্দ হঠাৎ থেমে গেল। না, কোথাও কেউ নেই। সারা আকাশে নক্ষত্রেরা জ্বলছে। নিথর আকাশে একটা প্লেন শব্দ করে এরোড্রমে উড়ে গেল। কোথাও কোন বিপদের চিহ্ন যেন নেই।

রেডিওতে সেই ভয়ংকর ডাক কেন থেমে গেল, কেউ বুঝতে পারল না। কে কি বলতে চায় এত রাত্রে? স্তব্ধই বা হল কেন?

কিছুক্ষণ পরে আবার শোনা গেল—সেই বুক কাঁপানো ভয়ংকর স্বর—"পৃথিবীর মানুষ, শোনো তোমরা শোন। আমার হাতে সময় নেই—আমাকে এরা বন্দী করে রেখে দিয়েছে—মহাকাশ থেকে কারা যেন হিমালয়ে এসেছে—অদ্ভুত ধরণের জীব, আশ্চর্য আকৃতি তাদের—সবুজ অবয়ব, মাথা তাদের কালো, নীল হলুদ রংএর চোখ, নাক কান, কিছু দেখা যায় না—সারা দেহ বেগুনী হলুদ আর সবুজ রংএর পোষাকে ঢাকা তাদের আসল রূপ দেখা যাচ্ছে না—মনে হয় যেন মুখোস পরে এসেছে পৃথিবীর আবহাওয়া সহ্য করার জন্যে; এদের চারটে হাতের মত আর চারটে প্যায়ের মত শক্ত শুঁড় আছে।

"পৃথিবীর মানুষ, তোমরা অনেকেই আমাকে চেন না; আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ দীপঙ্কর সেন—আমি হিমালয় তত্ত্ববিদ ভূতত্ত্ববিদ। আমি হিমালয়ে তিনজন সঙ্গী নিয়ে এসেছিলুম বরফ পরীক্ষা করতে।

"একদিন রাতে শুয়ে আছি তাঁবুর মধ্যে, হঠাৎ কাদের অস্পষ্ট শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। এই হিমশীতল হিমালয় পাহাড়ের কনকনে শীতে হঠাৎ আমার চোখে ভাসল হাজার হাজার আতসবাজীর মত নীল হলুদ সবুজ বেগুনী রংএর অদ্ভুত আলো।

"কোথাও জনমানব নেই, এত আলো কেমন করে এল? কারা এল এখানে—তবে কি বিদেশী শত্রু? কালো চশমা পরে নিলুম, পাহাড়ের বরফে সূর্যের রোদ লেগে যে আলো বিচ্ছুরিত হয় সেই আলো থেকে চোখ ঢাকার জন্যে বিশেষ চশমা এনেছিলুম আমি, সেটা পরে নিলুম।

বাইরে এলুম, কিছু বোঝা গেল না। টর্চের মত বড় বড় আলোর স্তম্ভ বানিয়েছে কারা যেন, আর সেগুলোকে পাহারা দিচ্ছে ভয়ংকর ধরণের কালো গম্বুজওলা ট্যাঙ্ক রকেট। অদ্ভুত ধরণের জীবগুলোকে দেখে আমি ভয়ে কেঁপে উঠলুম।

"পৃথিবীর মানুষ, এরা কারা আমি জানি না। আমি ভয় পেয়ে গেলুম। আমার তিন বন্ধু তাড়াতাড়ি খালি চোখে এসেছিল বাইরে, তারা ঐ আলোয় অন্ধ হয়ে গেল। ওদের তিনজনকে হাত ধরাধরি করতে বললুম। তারপর আমি ওদের একজনের হাত ধরে তাঁবু ফেলে ছুটতে আরম্ভ করলুম খাড়াই বেয়ে নিচের দিকে উৎরাইএ। একটা গিরিপথের পাশ দিয়ে ছুটতে গিয়ে পা ফসকে গেল ওদের, তিনজনেই গিরিখাত বেয়ে অতলে তলিয়ে গেল।

"দুঃখ করার সময় নেই। পিছনে কারা যেন আসছে। আমি দাঁড়ালুম না। আমি ছুটছি প্রাণপণে। সেই অমানবিক জীবগুলো ছুটে আসছে পিছে, টের পেয়েছে তারা, রক্ষা নেই আমার। ছুটছি ছুটছি। হঠাৎ একটা শুঁড় এসে আমার বুককে জড়িয়ে গতি বন্ধ করে দিল। একটা শুঁড় এসে আমার পা দুটো চেপে ধরল ঃ একটা শুঁড় এসে আমার হাত দুটো চেপে ধরল ঃ একটা শুঁড় আমার মুখের উপর হাত বুললো। তারপর আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

"কোথায় আমি যাচ্ছি টের পেলুম না।

"তারপর এক সময় আমার জ্ঞান ফিরল। আমি চোখ চেয়ে দেখলুম—আমি একটা অদ্ভুত কালো রংএর গম্বুজের ভিতরে আছি। কেউ নেই। আমি আস্তে করে উঠলুম, পালাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। গম্বুজটা কি দিয়ে তৈরী বুঝতে পারলুম না। লোহা নয়, ইস্পাত নয়—আমাদের জানা কোন প্ল্যাষ্টিক নয়—অন্য কোন ধাতুও নয়, বা প্ল্যাষ্টিক হবে যা পৃথিবীর মানুষের জানা নেই।

"হঠাৎ একটা ছিদ্র দিয়ে আমার চোখে যা পড়ল তা ভয়ংকর। উঃ ভগবান—তুমি কোথয়ে হে পৃথিবীর মানুষ—আমি যে কী ভয়ংকর দৃশ্য সেদিন দেখেছিলুম তা তোমরা ভাবতে পারবে না।

"ঐ জীবগুলো—ঐ ভয়ংকর মহাকাশের জীবগুলো সেই রংবেরঙের আলো দিয়ে বরফ গলাতে সুরু করে দিয়েছে। পৃথিবীর মানুষ—আমি ওদের আভাস ইঙ্গিত দেখে বুঝতে পারছি—ওরা পৃথিবীর সব পাহাড়ের বরফ গলিয়ে দেবে—সমস্ত উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর বরফ গলিয়ে দেবে—

"তারপর—তারপর, পৃথিবীর মানুষ, বুঝতে পারছ নিশ্চয় কী ভয়ংকর দিন আসছে। সমুদ্রের জল ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠবে, ক্রমশঃ আরো ওপরে—আরো ওপরে, সমস্ত পৃথিবী তারপর তলিয়ে যাবে জলের তলায়।

"আমার সময় নেই—ওরা টের পেয়েছে যে আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে, সেই জীবগুলো ফিরে আসছে কালো গহ্বর থেকে। আমি জানি আমাকে আবার ওরা অজ্ঞান করে রেখে দেবে, মুক্তি দেবে না। পৃথিবীর মানুষ, আমার কাছে যে লুকানো ট্রানজিস্টর ট্রান্সমিটার ছিল—ওরা তা কেড়ে নিচ্ছে। বিদায় বিদায়—পৃথিবীর মানুষ।"

রেডিও বন্ধ হয়ে গেল।

আর যারা শুনছিল, ঐ ডাকে তারা আর্তনাদ করে উঠল। উপায় নেই। কেউ ভাবল গুজব—গল্প বা নাটক হচ্ছে রেডিওতে। কেউ ভয় পেল। অধিকাংশই ভয় পেল—তারা ডেকে তুলল অন্য ঘুমন্ত মানুষদের।

অসহায় পৃথিবীর মানুষ।

পরের দিন থেকে নদীগুলোর জল বাড়তে লাগল। জল বাড়ছে—আউটরামঘাট ডুবে গেল, ময়দান ডুবে গেল, কলকাতার একতলা বাড়ীগুলো সব ডুবে গেল।

গ্লেসিয়ার গলছে। পৃথিবী জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। পালিয়ে মানুষ যাবে কোথায়? সবাই ডুবে যাচ্ছে। পৃথিবী জলের তলায় ডুবে যাচ্ছে; লণ্ডন, টোকিও, প্যারিস, মস্কো, কলকাতা, পিকিং, মেলবোর্ণ সব ডুবে গেল।

শুধু জল আর জল। পৃথিবী তার আদিম অবস্থায় ফিরে গেল।

কবিতা এবং আমি

পংকজ বন্দ্যোপাধ্যায়

নরম ঘাসের বুকে হেঁটে যেতে যেতে
কভু ফিরে তাকাবো না হঠাৎ কখনো,
আমার মাটির গন্ধে খুঁজে নেবো আমার সান্ত্বনা ;
বনতুলুসির কাছে উদার উন্মুক্ত ঐ প্রান্তরের বুকে
খুঁজে নেবো আমার আস্তানা—
এবং শান্তির মাঝে আমার কবিতা।
রক্তাভ কাঁকুরে পথে বাঁশমাচাটির ধারে
রেখে যাব আমার স্বাক্ষর—
'গাছটির স্নিগ্ধছায়ে নদীটির ধারে,'
কাশবনে লিখে যাব আমার কবিতা।
ডাহুক ডাকবে দূরে, নভোনীলে চাতকের ধ্বনি—
আমার অন্তরে মনে ডাক দেবে অজানা ভাষায়।
আমার তুলির আঁকে ছন্দ অলংকার,
হয় তো হবে না সুষ্ঠু ভাবের বিস্তার—
তবু লিখে যাব দুটি কান্নার আখরে
একটি প্রত্যয় : কবিতা এবং আমি
জগতের—এই আঙিনাতে
আজ অনাহূত ভাবে ধরে নিতে চায় বুঝি
প্রকৃতির এই সুরটুকু।
সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে, রাত্রির অবলেপে জগত ঘুমোলে
হয়তো ফিরতে পারি তোমাদের কাছে
আবার ঘাসের বুকে চাঁদের আলোয়
মাটির নতুন গন্ধে ফুলের বাগানে—
কাটিয়ে দিতেও পারি পুরোপুরি রাত।
আমার জীবনে রাত অভিশাপ এবং যন্ত্রণা—
আমার কবিতা রাত্রে ব্যথার কাজলে লেখা হয়॥

ভিখারী

শ্রীঅবনী রঞ্জন ঘোষ

হৃদয় লয়েছে তার ভিক্ষার ঝুলি, ভিক্ষায় চলেছে আমার ভিখারী ভাই।
মুক্ত যষ্ঠিখানি করেছে চিত্তে ভর, আপন মাঝে, আপনা বলিতে কেই নাই।
উদাস পরাণে, ছুটেছে কাহার পানে, অভয় বাণী আসিছে ভেসে ক্ষণে ক্ষণে।
চন্দন টীকা জ্বেলেছে দীপ্ত দীপশিখা, কুসুম কোরক ফুটেছে বনে বনে।

হৃদয় লয়েছে তার ভিক্ষার ঝুলি, ভিক্ষায় চলেছে আমার ভিখারী ভাই।
মুখে নাহি বোলি, সকলি এসেছে ফেলি, কোথায় চলেছে? আমি
তারে সুধাই।
বলিতে বলিতে সম্মুখে চলে ধীরি ধীরি, কেনরে পিছুপানে নাহি চায় ফিরি।
চলেছি সেথায়, যদি কিছু পাই, ঝোলার বাঁধন খুলি আনিব ঝুলি ভরি।

সবার কাছে, ভিক্ষা সে নাহি মাগে,
আকুল হিয়া, যারে চায় যেথা জাগে।
সে দোরে দোরে নাহি মাগে অনুরাগে,
কোন সুদূরে ঢেউ খেলিছে ভাগে ভাগে।
হৃদয় লয়েছে তার ভিক্ষার ঝুলি,
ভিক্ষায় চলেছে আমার ভিখারী ভাই।
চলেছে সে আকুলি বিকুলি, সব ভুলি।
ওরে, কেমনে আমি তাহারে ফিরাই।

———

দুটি বা তিনটি সন্তানই যথেষ্ট

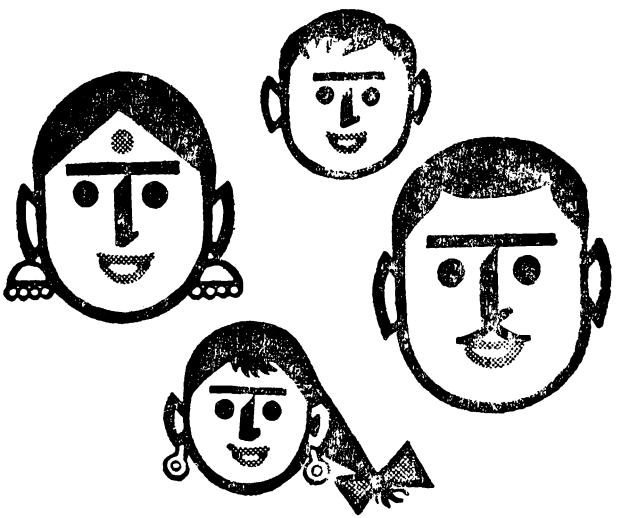

পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলির পরিচায়ক **লাল ত্রিকোণ**

davp 68/278

আরো ভালো,
কারণ চুল চটচটে হয় না

ক্যালকেমিকোর
ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল
ক্যান্থারল

(রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্ক)

এই আধুনিক হেয়ার টনিক
এখন থেকে
আকর্ষণীয়
নতুন কার্টনে পাবেন !

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

CCK 4766

For

* PAPERS
* BOARDS
* PLASTICS
  (Complimentary & Household)
* NYLON SOCKS

Please Contact :

PARAS VYAPAR SANGATHAN (P) LTD.

133, Biplabi Rasbehari Basu Road,

CALCUTTA-1.

Phone No. : 22-0101

Regd. No. C-118 : Aschorjo : Vol. 7 : Special Anniversary Number 1969
Rs. 2·00

লাইব্রেরী সাজাতে সুন্দর বই

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
মামাবাবু ফিরেছেন ৩'০০ (২য় সংস্করন)

বিধায়ক ভট্টাচার্যের
অমরেশ চন্দ্রাহত হলো ২'৫০

ডঃ অসীম বর্ধনের
বাঁচতে সবাই চায় (২য় সং) ৩'৭৫, কেটে যাবে মেঘ ২'৫০, পড়তে লাগে ভালো ১'৫০ শিক্ষাচর্চায় মনোবিজ্ঞান ৮'০০

অদ্রীশ বর্ধনের
শার্লক হোমস্ ফিরে এলেন (২য় সং) ১০'০০ সমুদ্র শয়তান ৪'০০, হপ্তাপাঁচেক বেলুন চেপে ২'০০, ডঃ অক্সের এক্সপেরিমেন্ট ২'০০ উন্মাদ বৈজ্ঞানিক ৩'৫০, রোবার হলেন আকাশ রাজা ১'৭৫, রূপোর টাকা ৩'০০, মোমের হাত ৪'০০, কাচের জানালা ৩'৭৫, গোলক ধাঁধায় ফাদার ঘনশ্যাম ৪'০০ রহস্য সন্ধানী ফাদার ঘনশ্যাম ৪'০০

আদিত্য ভট্টাচার্যের
ঢেউভাঙ্গা মুক্তা ৬'৭৫, রোমাঞ্চকর নতুন পৃথিবী ১'৭৫, রামধনু-রঙ মানিক ২'০০

শিশির সিংহের
রিগেলা গ্রহের হানাদার ৩'০০

বরেন ঘোষালের
লিখিনু যে লিপিখানি ২'৫০

মনোরঞ্জন দে'র
গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ ৮০ পঃ, অন্ধ যে দেশে সকলেই ১'৭৫, ভূগর্ভে টার্জন ৩'০০

সুখেন্দু সরকারের
দুটি গোলাপ একটি কুঁড়ি ৫'২৫, রোদ ৩'০০, মেঘ কন্যা ২'০০

ডাঃ শ্রীধর সেনাপতির
নিশ্চিন্তপুরের কোকিল ৩'০০
জৈমিনির পূর্বপক্ষ ৪'০০

উৎপল হোম রায়ের শিশুতীর্থের পথ

ডেল কার্নেগীর প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ

ডঃ রমেশ দাসের শিশু মন ৫'০০

প্রদীপ মিত্রের মানুষ জন্তুর

গৌরীশংকর দে'র
পৃথিবীতে শিশুযুগ আসছে ১'৭৫

তারক মিত্রের
পড়ায় কত মজা (১ম) ১'২৫,

দীপঙ্কর পাঠকের
সুস্মিতার সাহস ছিল ৬

সংলাপীর তুষারপথে

গুরনেক সিংয়ের প্রলয়কেতুর নিদ্রাভঙ্গ

উপেন মান্নার কালো রশ্মি ২'৫০

বুক সারভিস প্রাইভেট লিমিটেড

৫৫-১, কলেজ স্ট্রীট, তেতলা, কলকাতা ১২ : টেলিফোন : ৩৪-২৩০৯